প্রথম প্রকাশ :
ডিসেম্বর, ১৯৬০

প্রকাশক : সুধাংশুশেখর দে, দে'জ পাবলিশিং, ৩১/১ বি মহাত্মা গান্ধি রোড, কলকাতা ৯। মুদ্রক : নিশিকান্ত হাটই, তুষার প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, ২৬ বিধান সরণী, কলকাতা ৬।

ভূমিকা

এই বইয়ের কবিতাগুলি যাঁর রচনা, তিনি বিশ শতকের একজন শ্রেষ্ঠ বাঙালি, তাঁর মতো নানাগুণসমন্বিত পুরুষ রবীন্দ্রনাথের পরে আমি অন্য কাউকে দেখিনি। বহুকাল ধ'রে তাঁকে প্রত্যক্ষ দেখেছিলুম ব'লে, তাঁর মৃত্যুর পর থেকে একটি প্রশ্ন মাঝে-মাঝে আমার মনে জাগছে: যাকে আমরা প্রতিভা বলি, সে-বস্তুটি কী? তা কি বুদ্ধিরই কোনো উচ্চতর স্তর, না কি বুদ্ধির সীমাতিক্রান্ত কোনো বিশেষ ক্ষমতা, যার প্রয়োগের ক্ষেত্র এক ও অনন্য? ইংরেজি 'genius' শব্দে অলৌকিকের যে-আভাস আছে, সেটা স্বীকার্য হ'লে প্রতিভাকে এক ধরনের আবেশ বলতে হয়, আর সংস্কৃত 'প্রতিভা' শব্দের আক্ষরিক অর্থ অনুসারে তা হ'য়ে ওঠে বুদ্ধির দীপ্তি, মেধার নামান্তর। যদি প্রতিভাকে অলৌকিক ব'লে মানি, তাহ'লে বলতে হয় যে সহজাত বিশেষ একটি শক্তির প্রভাবেই উত্তম কবিতা রচনা সম্ভব, রচয়িতা অন্যান্য বিষয়ে হীনবুদ্ধি হ'তে পারেন এবং হ'লে কিছু এসে যায় না, উপরন্তু ঐ বিশেষ ক্ষমতাটি শুধু দৈবক্রমে সহজাতভাবেই প্রাপণীয়। পক্ষান্তরে, প্রতিভাকে উন্নত বুদ্ধি ব'লে ভাবলে কবি হ'য়ে ওঠেন এমন এক ব্যক্তি যাঁর ধীশক্তি কোনো-কোনো ব্যক্তিগত বা ঐতিহাসিক কারণে কাব্য-রচনায় নিয়োজিত হয়েছিলো, কিন্তু সেই কারণসমূহ ভিন্ন হ'লে যিনি বণিক বা বিজ্ঞানী বা কূটনীতিজ্ঞরূপে বিখ্যাত হ'তে পারতেন। এই দুই বিকল্পের মধ্যে কোনটা গ্রহণীয়?

বলা বাহুল্য, এই প্রশ্ন আমরা শুধু উত্থাপন করতে পারি, এর উত্তর দেয়া সকলেরই সাধ্যাতীত। কেননা ইতিহাস থেকে দুই পক্ষেই বহু সাক্ষী দাঁড় করানো যায়, তাঁরা, অনেকে আবার স্ববিরোধে দোলায়মান। বহুমুখী গ্যেটে ও রবীন্দ্রনাথের 'বিরুদ্ধে' আছেন একান্ত হ্যেল্ডার্লিন ও জীবনানন্দ, মনীষী শেলি ও কোলরিজের পাশে উন্মাদ ব্লেক ও অশিক্ষিত কীটস, উৎসাহী বোদলেয়ারের পরে শীতল ও নিরঞ্জন মালার্মে। জগতের কবিদের মধ্যে এত বিভিন্ন ও বিরোধী ধরনের চরিত্র দেখা যায়, এত বিচিত্র প্রকার কৌতূহলে বা অনীহায় তাঁরা আক্রান্ত, এত বিভিন্ন-ভাবে তাঁরা কর্মিষ্ঠ ও নিষ্ক্রিয়, এবং উৎসুক ও উদাসীন ছিলেন, যে ঠিক কোন লক্ষণটির প্রভাবে তাঁরা সকলেই অমোঘভাবে কবি হয়েছিলেন, তা আবিষ্কার করার আশা শেষ পর্যন্ত ছেড়ে দিতে হয়। এবং কবিত্বের সেই সামান্য লক্ষণ—যদি বা কিছু থাকে—তা আমার বর্তমান নিবন্ধের বিষয়ও নয়; এখানে আমি

বলতে চাচ্ছি যে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত এমন একজন কবি যাঁর প্রতিভার প্রাচুর্যের কথা ভাবলে প্রায় অবাকই লাগে যে কবিতা লেখার মতো একটি নিরীহ, আসীন, ও সামাজিক অর্থে নিষ্ফল কর্মে তিনি গভীরতম নিষ্ঠায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন।

কেননা সুধীন্দ্রনাথ ছিলেন বহুভাষাবিদ্ পণ্ডিত ও মনস্বী, তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণী বুদ্ধির অধিকারী, তথ্যে ও তত্ত্বে আসক্ত, দর্শনে ও সংলগ্ন শাস্ত্রসমূহে বিদ্বান ; তাঁর পঠনের পরিধি ছিলো বিরাট, ও বোধের ক্ষিপ্রতা ছিলো অসামান্য। সেই সঙ্গে যাকে বলে কাণ্ডজ্ঞান, সাংসারিক ও সামাজিক সুবুদ্ধি, তাও পূর্ণমাত্রায় ছিলো তাঁর, কোনো কর্তব্যে অবহেলা করতেন না, গার্হস্থ্য ধর্মপালনে অনিন্দনীয় ছিলেন, ছিলেন আলাপদক্ষ, রসিক, প্রখর ব্যক্তিত্বশালী, আচরণের পুঙ্খানুপুঙ্খে সচেতন, এবং সর্ববিষয়ে উৎসুক ও মনোযোগী। এই বর্ণনা থেকে বোঝা যাবে যে, একটু চেষ্টা করলেই, বাংলা সাহিত্যের চাইতে আপাতবৃহত্তর কোনো ব্যাপারে নায়ক হ'তে পারতেন তিনি ; আমার এক তরুণ বন্ধুর সঙ্গে এ-বিষয় আমি সম্পূর্ণ একমত যে সুধীন্দ্রনাথ রাজনৈতিক হ'লে অনিবার্যত নেতৃপদ পেতেন, বা আইনজীবী হ'লে সেই পেশার উচ্চতম শিখরে পৌঁছতে তাঁর দেরি হ'তো না ; তাঁকে অনায়াসে কল্পনা করা যেতো রাজমন্ত্রী বা রাষ্ট্রদূতরূপে, তত্ত্বচিন্তায় নিবিষ্ট হ'লে নতুন কোনো দর্শনের প্রতিষ্ঠা করতে পারতেন না তাও নয়। অথচ এর কোনোটাই তিনি করলেন না, কবিতা লিখলেন। পিতার কাছে আইনশিক্ষা আরম্ভ ক'রে শেষ করলেন না ; এম. এ. পড়া আরম্ভ ক'রেই ছেড়ে দিলেন ; সুভাষচন্দ্র বসুর 'ফরওঅর্ড' পত্রিকার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হ'য়েও রাজনৈতিক কর্মের দিকে প্রবর্তনা পেলেন না; বীমাপ্রতিষ্ঠানে কর্মজীবন আরম্ভ ক'রেও লক্ষ্মীর বাসস্থানটিকে পরিহার করলেন। এ কি এক তরুণ ধনীপুত্রের খেয়ালমাত্র, না কি এর পিছনে কোনো প্রচ্ছন্ন উদ্যম কাজ ক'রেযাচ্ছে? কেউ-কেউ বলেছেন যে তিনি যেমন তাঁর পিতার 'বৈদান্তিক আতিশয্যে' উত্যক্ত হ'য়ে 'অনেকান্ত জড়বাদে'র আশ্রয় নিয়েছিলেন, তেমনি তাঁর দেশহিতৈষী কর্মবীর পিতাকে থিয়সফিতে আত্মবিলোপ করতে দেখে সমাজসেবায় তাঁর আস্থা ভেঙে যায়। এই যুক্তিকে আর-একটু প্রসারিত ক'রে হয়তো বলা যায় যে দেশ, কাল ও পরিবারের আপতিক সন্নিপাতের ফলে জনকর্মে উৎসাহ হারিয়ে, তিনি বেছে নিলেন সেই একটি কাজ, যা শব্দময় হ'য়েও নীরব, এবং সর্বজনের প্রতি উদ্দিষ্ট হ'লেও নিতান্ত ব্যক্তিগত। কিন্তু সত্যি কি তা-ই ? না কি তাঁর নাড়িতেই কবিতা ছিলো, দেহের তন্তুতে ছিলো বাক্ ও ছন্দের প্রতি আকর্ষণ, তাই অন্য কোনো পথে যাবার তাঁর উপায় ছিলো না, অন্যান্য এবং

অধিকতর প্রভাবশালী বৃত্তির দিকে স্পষ্ট সম্ভাবনা নিয়েও তাই তাঁকে কবি হ'তে হ'লো? তিনি কি অন্তবিধ কীর্তির আহ্বান উপেক্ষা ক'রে কবিতা লিখতে বসেছিলেন, না কি মন্ত্রমুগ্ধ কান নিয়ে অন্য কোনো আহ্বান তিনি শুনতেই পাননি? মূল্যবান জেনেও কোনো-কিছু ত্যাগ করেছিলেন, না কি বর্জন করেছিলেন শুধু সেই সব, যা তাঁর কাছে অকিঞ্চিৎকর, বরণ করেছিলেন শুধু তা-ই, যেখানে তাঁর সার্থকতা নিহিত?

এ-কথার উত্তরে আমি বলতে বাধ্য যে জগতের অন্যান্য উত্তম কবিদের মতো সুধীন্দ্রনাথও ছিলেন—স্বভাবকবি নন, স্বাভাবিক কবি। তা যদি না-হ'তো, তাহ'লে তাঁর মতো মেধাবী ব্যক্তি কবিতা-নামক বায়বীয় ব্যাপার নিয়ে প্রৌঢ়-বয়স পর্যন্ত প্রাণপাত পরিশ্রম করতেন না। তাঁর সামনে, রবীন্দ্রনাথের মতো, সুযোগ ছিলো অপর্যাপ্ত, ব্যক্তিত্বে ছিলো অন্য নানা গুণপনা; সে-সবের সদ্ব্যবহারও তিনি করেছিলেন। কিন্তু আমি যাঁদের স্বাভাবিক কবি বলছি—আর তাঁরা ছাড়া সকলেই অকবি—তাঁরা লোকমানসে নিতান্ত কবিরূপেই প্রতিভাত হ'য়ে থাকেন, তাঁদের ক্ষমতার অন্যান্য বিকিরণ শেষ পর্যন্ত সেই একই অগ্নিতে লীন হ'য়ে যায়। গ্যেটেকে জগতের লোক কবি ছাড়া অন্য কিছু ব'লে ভাবে কি? জমিদার, ধর্মগুরু, শিক্ষাব্রতী, দেশপ্রেমিক, গ্রামসেবক, বিশ্বপ্রেমিক—রবীন্দ্রনাথ তো কত কিছুই ছিলেন, কিন্তু তাঁর একটিমাত্র মৌলিক পরিচয়ের মধ্যে অন্য সব গৃহীত হ'য়ে গেলো। তেমনি, সুধীন্দ্রনাথের অন্য যে-সব চরিত্রলক্ষণ উল্লেখ করেছি, বা করিনি—তাঁর অধীত জ্ঞান, মনীষিতা, আলাপনৈপুণ্য, অসামান্য প্রফুল্লতা ও সামাজিক বৈদগ্ধ্য, সম্পাদক ও গোষ্ঠীনায়ক হিশেবে স্মরণীয় কৃতিত্ব তাঁর—এই সবই তাঁর কবিত্বের অনুষঙ্গ, তাঁর কবিতার পক্ষে অনুকূল বা বিরোধী ধাতু হিশেবে প্রয়োজনীয়; যদি তিনি কবি না-হ'তেন, তাহ'লে তাঁর জীবন ও ব্যক্তিত্ব এ-রকম হ'তো না, এবং যদি ভিন্ন ধরনের কবি হ'তেন তাহ'লে তাঁর জীবন ও ব্যক্তিত্ব ভিন্ন ধরনের হ'তো।

শ্রীমতী রাজেশ্বরী দত্তের সৌজন্যক্রমে সুধীন্দ্রনাথের অনেকগুলি পাণ্ডুলিপি-পুস্তক দেখার সুযোগ আমার হয়েছে। ছাপার অক্ষরে তাঁর যে-সব কবিতার সঙ্গে আমরা পরিচিত, সেগুলির আদি ও পরবর্তী লেখন সবই রক্ষিত আছে, তাছাড়া আছে দুটি প্রাথমিক খাতা, যাতে তাঁর কাব্যরচনার সূত্রপাত হয়েছিলো। সর্বপ্রথম খাতাটির তারিখ বঙ্গাব্দ ১৩২৯, অর্থাৎ খৃষ্টাব্দ ১৯২২, সুধীন্দ্রনাথের বয়স তখন একুশ। নামপত্রে লেখা: 'শ্রীশ্রীদুর্গামাতা সহায়। শ্রীসুধীন্দ্র নাথ দত্ত।

১৩৯ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা।' (মূলের বানান উদ্ধৃত হ'লো।) ভিতরের পাতাগুলোতে আছে কম্প্র হাতে মেলানো পদ্য, ছয় বা আট পংক্তি থেকে দু-তিন পৃষ্ঠা পর্যন্ত ব্যাপ্তি তাদের, তাতে বানান অস্থির ও ছন্দ ভঙ্গুর; বাংলা ভাষা ও বাংলা ছন্দ—এই দুই অনমনীয় উপাদানের সঙ্গে সংগ্রামের চিহ্ন সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। হস্তলিপিও কাঁচা, এবং সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের, অক্ষরগুলি কোণবহুল ও বিশ্লিষ্ট, তাতে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব একেবারেই নেই, এবং আমাদের পক্ষে তা সুধীন্দ্রনাথের ব'লে ধারণা করা সহজ নয়। এটা কেমন ক'রে সম্ভব হ'লো যে সুধীন্দ্রনাথ, একুশ বছর বয়সে, যখন রবীন্দ্রনাথের 'বলাকা' পর্যন্ত ও সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের প্রায় সমগ্র কাব্য বেরিয়ে গেছে, তখন ঐ রকম কাঁচা লেখা লিখেছিলেন?

এর উত্তরে আমি এই তথ্যটি উপস্থিত করবো যে সুধীন্দ্রনাথের প্রথম যৌবনে বাংলা ভাষা তাঁর অন্তরঙ্গ ছিলো না। তাঁর বাল্যশিক্ষা ঘটেছিলো কাশীতে; আনি বেসাণ্ট কর্তৃক স্থাপিত সেই বিদ্যালয়ে তিনি সংস্কৃত ও ইংরেজি ভালো-ভাবে শিখেছিলেন, কিন্তু বাংলা চর্চার তেমন সুযোগ পাননি। শুনেছি, কৈশোরে কলকাতায় ফিরে মাঝে-মাঝে মাতার সঙ্গে হিন্দিতে কথা বলতেন। মাতৃভাষাকে স্বাধিকারে আনতে তাঁর যে কিছু বেশি সময় লেগেছিলো তাতে অবাক হবার কিছু নেই; যা লক্ষণীয়—এবং বর্তমান ও ভাবীকালের তরুণ লেখকদের পক্ষে শিক্ষণীয়—তা এই যে মাতৃভাষাকে স্ববশে আনবার জন্য, ও নিজের কবিত্ব-শক্তিকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য, দিনে-দিনে অনলসভাবে অনবরত তিনি 'উদ্যমের ব্যথা' সহ্য করেছিলেন। তাঁর খাতাগুলিতে দেখা যায়, বাংলা ভাষার কবিতার পংক্তিকে ইংরেজি ধরনে বিশ্লেষ ক'রে তিনি বাংলা ছন্দের প্রকৃতি বুঝে নিচ্ছেন, কোথাও দেখা দিচ্ছে পঠিতব্য পুস্তকের তালিকা, কোথাও পর-পর কতগুলো মিল লিখে রাখছেন। এরই পরিণতিস্বরূপ পরবর্তীকালে আমরা দেখতে পাই, 'পথ' নামক কবিতার আদি লেখনের প্রতিটি পংক্তি উচ্ছেদ ক'রে তারই ফাঁকে-ফাঁকে এক-একটি নতুন পংক্তি রচনা করছেন; দেখতে পাই 'সংবর্তে'র ঊর্ণিত্ব, 'যযাতি'র অতুলনীয় কলাকৌশল।

আমার বিশ্বাস, সুধীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ প'ড়ে আমি যা বুঝিনি, তাঁর পাণ্ডুলিপি-পুস্তকের সঙ্গে চাক্ষুষ পরিচয়ের ফলে তাঁর সেই গোপন কথাটি আমি ধরতে পেরেছি। বুঝতে পেরেছি, কেন জীবনের শেষ পর্যায়ে তাঁর একাত্মবোধ ঘটেছিলো—ধরা যাক তাঁরই মতো বেদনাবর্ণিল পোল ভেরলেনের সঙ্গে নয়—স্বভাবে যিনি

তাঁর একেবারে বিপরীত, সেই নিরঞ্জন মালার্মের সঙ্গে। সুধীন্দ্রনাথ কবিতা লিখতে আরম্ভ করেছিলেন তাঁর স্বভাবেরই প্রণোদনায়, কিন্তু তাঁর সামনে একটি প্রাথমিক বিঘ্ন ছিলো ব'লে, এবং অন্য অনেক কবির তুলনায় যৌবনেই তাঁর আত্মচেতনা অধিক জাগ্রত ছিলো ব'লে, তিনি প্রথম থেকেই বুঝেছিলেন — যা আমার উপলব্ধি করতে অন্তত কুড়ি বছরের সাহিত্যচর্চার প্রয়োজন হয়েছিলো — যে কবিতা লেখা ব্যাপারটা আসলে জড়ের সঙ্গে চৈতন্যের সংগ্রাম, ভাবনার সঙ্গে ভাষার, ও ভাষার সঙ্গে ছন্দ, মিল, ধ্বনিমাধুর্যের এক বিরামহীন মল্লযুদ্ধ। তাঁর প্রবৃত্তি তাঁকে চালিত করলে কবিতার পথে — সে-পর্যন্ত নিজের উপর তাঁর হাত ছিলো না, কিন্তু তার-পরেই বুদ্ধি বললে, 'পরিশ্রমী হও।' এবং বুদ্ধির আদেশ শিরোধার্য ক'রে অতি ধীরে সাহিত্যের পথে তিনি অগ্রসর হলেন, অতি সুচিন্তিতভাবে, গভীরতম শ্রদ্ধা ও বিনয়ের সঙ্গে। তাঁর প্রথম খাতায় অঙ্কিত সেই মর্মস্পর্শী 'শ্রীশ্রীদুর্গামাতা সহায়' — তাঁর রক্ষণশীল হিন্দু বাঙালি পরিবারের সেই স্বাক্ষরটুকু — এতেও বোঝা যায় কী-রকম নিষ্ঠা নিয়ে, আত্মসমর্পণের নম্রতা নিয়ে, তিনি কাব্যরচনা আরম্ভ করেছিলেন। এই পর্যায়ের রচনার মধ্যে অনেক ছোটোগল্প বা উপন্যাসেরও খশড়া পাওয়া যায়, তার কোনো-কোনোটি সমাপ্ত ও ঔৎসুক্যজনক। সাত বছরের অনুশীলনের ফলে পৌঁছলেন 'তন্বী' পর্যন্ত, যে-পুস্তক, তার বিবিধ আকর্ষণ সত্ত্বেও, তাঁর পরবর্তী কবিতাসমূহের তুলনায় আজকের দিনে কৈশোরক রচনা ব'লে প্রতিভাত হয়।

১৯২৯-এ প্রথমবার তিনি দেশান্তরে গেলেন, প্রায় সংবৎসরকাল প্রবাসে কাটলো, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে জাপানে ও আমেরিকায়, তারপর একাকী য়োরোপে। এই সময়টি তাঁর কবিজীবনের ক্রান্তিকাল; এই সময়েই, তিনি যাকে অভিজ্ঞতা বলতেন, তা তাঁর কবিতার মধ্যে প্রথম প্রবেশ করে। সঙ্গে খাতাপত্র নিয়েছিলেন, জাপানের জাহাজে আরম্ভ করলেন একটা ভ্রমণবৃত্তান্ত, পেনসিলে ও কালিতে বিবিধ গদ্য-পদ্য রচনা, দেখে মনে হয় রোজই কিছু-না-কিছু লিখছেন। আমরা সাগ্রহে লক্ষ করি, কেমন ক'রে, সেই প্রথম খাতার পর থেকে, ক্রমশ তাঁর ভাষা বদলাচ্ছে, ভাব বদলাচ্ছে, দেখা দিচ্ছে ভাবুকতা ও সংহতি, সুন্দরভাবে রূপান্তরিত হচ্ছে হস্তাক্ষর। তারপর রোমাঞ্চিত হ'য়ে আবিষ্কার করি আমাদের বহুপরিচিত কতিপয় কবিতা — 'অর্কেস্ট্রা'র পর্যায়ভুক্ত — কোনোটির রচনাস্থল আমেরিকা থেকে য়োরোপগামী তরণী, কোনোটির বা রাইনের তীরবর্তী কোনো নগর। ইতিমধ্যে কিছু-একটা ঘ'টে গেছে; ভূলোক হয়েছে আরো বাস্তব, দ্যুলোক উজ্জ্বলতর; জেমস জয়স যাকে 'এপিফ্যানি' বলেছিলেন আর রবীন্দ্রনাথ, 'স্বপ্নভঙ্গ',

তেমনি কোনো উদ্দীপনের প্রসাদ তিনি লাভ করেছেন ; প্রকৃতি ও সুধীন্দ্রনাথ দত্তের সহযোগে ও চক্রান্তে বাংলা ভাষায় আবির্ভূত হয়েছেন এক নতুন বাক্‌সিদ্ধ পুরুষ।

তিনি কি বুঝেছিলেন যে তাঁর সাতবৎসরব্যাপী পরিশ্রম এবারে পুরস্কৃত হয়েছে? বোঝেননি তা তো হ'তে পারে না, কেননা তাঁর নিরন্তর সাধনা ছিলো আত্মোপলব্ধি। আর সেইজন্যেই, তৃপ্তির তিলতম অবকাশ নিজেকে না-দিয়ে, তিনি আরো ব্যাপক ভাবে প্রস্তুতির আয়োজন করলেন ; প্রকাশ করলেন 'পরিচয়', পাঠ করলেন যা-কিছু পাঠযোগ্য, বৈঠক জমালেন শুক্রবারে, বন্ধু বেছে নিলেন সাহিত্যিক ও মনীষীদের মধ্যে, লিখলেন পুস্তক-সমালোচনা, প্রবন্ধ, ও ছদ্মনামে ছোটোগল্প, তিনটি য়োরোপীয় ভাষা থেকে কবিতা ও গদ্য অনুবাদ করলেন। আর তাঁর নিজের কবিতা? এই সবই তো তাঁর কবিতারই ইন্ধন, এই সমস্ত-কিছুর প্রভাব ও অভিঘাত, উদ্বৃত্ত ও অনুষঙ্গ, তাদের যোগ ও বিয়োগের অঙ্কে সর্বশেষ যে-ফলটুকু দাঁড়ায়, তাঁর কবিতা তো তা-ই। তাঁর 'পরিচয়' পত্রিকা তাঁর কবিতার পাঠক সৃষ্টি করেছে, কবিতার শ্রীবৃদ্ধি করেছে তাঁর উদ্ভাবিত শব্দসমূহ, দার্শনিক প্রবন্ধসমূহ স্থাপন করেছে সমকালীন জগতের সঙ্গে তাঁর কবিতার সম্বন্ধ, সাহিত্যিক প্রবন্ধসমূহ বুঝিয়ে দিয়েছে তাঁর কবিতার আদর্শ কী এবং সিদ্ধি কোনখানে, এবং অনুবাদগুচ্ছ বর্ধিত করেছে স্বাধীন রচনার উপর তাঁর কর্তৃত্ব। সবই কবিতার জন্য। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত সম্বন্ধে ন্যূনতম কথা এই বলা যায় যে তাঁর মতো বিরাট প্রস্তুতি নিয়ে আর কেউ বাংলা ভাষায় কবিতা লিখতে অগ্রসর হননি ; আর অন্য একটি কথা—উচ্চতম কিনা জানি না—যা আমরা বলতে বাধ্য, তা এই যে এক অবোধ্য, নির্বোধ ও দুঃশাসন বিশ্বের বুকে মানুষের মন কেমন ক'রে অঙ্কিত ক'রে দেয় তার ইচ্ছাশক্তিকে, স্থাপন করে শব্দের প্রভাবে এমন এক শৃঙ্খলা ও সার্থকতা, যা একাধারে ক্ষণকালীন ও শাশ্বত—এই লোমহর্ষক প্রক্রিয়াটিকে সুধীন্দ্রনাথের কবিজীবনে আমরা প্রত্যক্ষ করি। কোনো-কোনো কবি প্রক্রিয়াটিকে গোপনে রেখে যান, কিন্তু সুধীন্দ্রনাথ তাঁর সংগ্রামের চিহ্ন বীরের মতো অঙ্গে ধারণ করেছেন। জয়ী হ'য়েও তিনি এ-কথা ভোলেননি যে শান্তি দেবতারই ভোগ্য, মানুষের জীবনকে অর্থ দেয় শুধু প্রচেষ্টা। আর এইজন্যেই প্রৌঢ়বয়সে তিনি বলেছিলেন যে 'মালার্মের কাব্যাদর্শ তাঁর অন্বিষ্ট' ; এইজন্যেই প্রেরণার বিরুদ্ধে তাঁর অভিযান এমন পৌনঃপুনিক। তাঁর কবিতা কোনো দিক থেকেই মালার্মের মতো নয়—তা নয় ব'লে আমি অন্তত খেদ করি না ; ভুল হবে তাঁকে 'সিম্বলিস্ট' ব'লে

ভাবলে ; তাঁর সঙ্গে মালার্মের একমাত্র সাদৃশ্য দৈববর্জনের সংকল্পে, স্বায়ত্তশাসনের উৎকাঙ্ক্ষায়। কিন্তু মানুষের পক্ষে দৈববর্জন কি সম্ভব ? অন্তত পক্ষে সুধীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে আমি নিশ্চয়ই বলবো যে তাঁর প্রতিজ্ঞাবদ্ধ অধ্যবসায়ের শক্তিও দৈবের দান, সেই প্রথম কাঁচা হাতের খাতা থেকে 'সংবর্ত' ও 'দশমী'তে তাঁর উত্তরণ পর্যন্ত যে-গতিবেগ কাজ ক'রে গেছে, তারই অন্য নাম 'প্রেরণা'। আত্মোপলব্ধির এক স্বচ্ছ মুহূর্তেই তিনি নিজের বিষয়ে লিখেছিলেন : 'আমি অন্ধকারে বদ্ধমূল, আলোর দিকে উঠছি।' বলা বাহুল্য, এই উক্তির প্রথমার্ধ সব কবির বিষয়েই প্রয়োজ্য, কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধ সত্য শুধু তাঁদের বিষয়ে, যাঁদের মনের প্রয়াসপ্রসূত উদ্বর্তন তাঁদের আয়ুর সঙ্গেই পা মিলিয়ে চলতে থাকে। আমাদের এই দেশ ও কালে অনেক কবির মধ্যপথে অবরোধ ও অনেক প্রতিশ্রুতির তুচ্ছ পরিণাম দেখার পরে, সুধীন্দ্রনাথের এই বিরতিহীন পরিণতি আমাদের বিস্ময় ও শ্রদ্ধার বস্তু হ'য়ে রইলো।

য়োরোপ থেকে প্রত্যাবর্তনের সঙ্গে-সঙ্গে সুধীন্দ্রনাথের সবচেয়ে সৃষ্টিশীল পর্যায় আরম্ভ হ'লো, তার অপর সীমা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সূত্রপাত। ১৯৩০ থেকে ১৯৪০ : এই দশ বৎসর তাঁর অধিকাংশ প্রধান রচনার জন্মকাল : প্রায় সমগ্র 'অর্কেস্ট্রা', 'ক্রন্দসী' ও 'উত্তরফাল্গুনী', প্রায় সমগ্র 'সংবর্ত', সমগ্র কাব্য ও গদ্য অনুবাদ, 'স্বগত' ও 'কুলায় ও কালপুরুষে'র প্রবন্ধাবলি—সব এই একটিমাত্র দশকের মধ্যে তিনি সমাপ্ত করেন। 'পরিচয়ে'র সবচেয়ে প্রোজ্জ্বল পর্যায়, ১৯৩১-১৯৩৬—তাও এই অধ্যায়ের অন্তর্ভূত। এই পাঁচ বৎসরের মধ্যে এমনও দিন গেছে যখন তিনি একই দিনে সাতটি শেক্সপীয়র-সনেট অনুবাদ করেছেন, একই দিনে রচনা করেছেন কবিতা ও গদ্য, কোনো লেখা শেষ করামাত্র আর-একটিতে হাত দিয়েছেন। এক প্রবল আবেগ তাঁকে অধিকার করেছিলো এই সময়ে, এক স্মৃতি তাঁকে আবিষ্ট ক'রে রেখেছিলো, কোনো-এক অপূরণীয় ক্ষতির পরিপূরণ-স্বরূপ অনবরত ভাষাশিল্প রচনা ক'রে যাচ্ছিলেন : জগতে ভগবান যদি না থাকেন, প্রেম ও ক্ষমা যদি অলীক হয়, তাহ'লেও মানুষ তার অমর আকাঙ্ক্ষার উচ্চারণ ক'রেই জগৎকে অর্থ দিতে পারে। এই আবেগের পরম ঘোষণা ১৯৪০-এ লেখা 'সংবর্ত' কবিতা ; ঐ কবিতাটি রচনা করার পর তিনি যেন মুক্তিলাভ করলেন, কবিতার দ্বারা পীড়িত অবস্থা তাঁর কেটে গেলো।

মুক্তি ? না। মায়াবিনী কবিতার দেখা একবার যে পেয়েছে, সে কি আর মুক্ত হ'তে পারে ? রচনার পরিমাণ হ্রাস পেলেও, আরাধ্যা সেই দেবীই থাকেন।

জীবনের শেষ দুই দশকে সুধীন্দ্রনাথ কবিতা বেশি রচনা করেননি, কিন্তু অনবরত নতুন ক'রে রচনা করেছেন নিজেকে, এবং সেটিও কবিকৃত্যের একটি প্রধান অঙ্গ। পুরোনো রচনার তৃপ্তিহীন পরিবর্তন ও পরিমার্জনা তাঁর – যা বন্ধুমহলে মাঝে-মাঝে সরোষ প্রতিবাদ জাগালেও অনেক স্মরণীয় পংক্তি প্রসব করেছে; তাঁর নতুন সংস্করণের ভূমিকা; 'দশমী'র কবিতাগুচ্ছ; এবং তাঁর আলাপ-আলোচনা: এই সব-কিছুর মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে এমন একজন মানুষ, জগতের সঙ্গে যাঁর ব্যবহার বহুমুখী হ'লেও যাঁর ধ্যানের বিষয় বাণীমাধুরী। কবিতার প্রকরণগত আলোচনায় দেখেছি তাঁর অফুরন্ত উৎসাহ; 'আজি' ও 'আজই' শব্দের উচ্চারণগত পার্থক্য তাঁকে ভাবিয়েছে; বানান ও ব্যাকরণ বিষয়ে তাঁকে আমরা অভিধানের মতো ব্যবহার করেছি – আমার সমবয়সী বাঙালি লেখকদের মধ্যে তিনিই একমাত্র, যিনি উত্তরজীবনে বাংলা ও বাংলায় ব্যবহারযোগ্য প্রতিটি সংস্কৃত শব্দের নির্ভুল বানান জানতেন, এবং শব্দতত্ত্ব ও ছন্দশাস্ত্র বিষয়ে যাঁর ধারণায় ছিলো জ্ঞানাশ্রিত স্পষ্টতা। এই শব্দের প্রেমিক শব্দকে প্রতিটি সম্ভবপর উপায়ে উপার্জন করেছিলেন; জীবনব্যাপী সেই সংসর্গ ও অনুচিন্তনের ফলেই সম্ভব হয়েছিলো 'দ্বিধা-মলিদা' বা 'গুরু-অগুরু'র মতো বিস্ময়কর অথচ সম্পূর্ণ স্বাভাবিক অন্ত্যানুপ্রাস। সাহিত্যের তত্ত্ব বিষয়ে অনেকেই কথা বলতে পারেন ও ব'লে থাকেন, কিন্তু কতগুলো অস্পষ্ট ও অনিচ্ছুক ভাবনা-বেদনাকে ছন্দ ও ভাষার নিগড়ে বাঁধতে হ'লে যে-সব সমস্যা প্রত্যক্ষ হ'য়ে ওঠে, তা নিয়ে আলোচনা হ'তে পারে শুধু এক কবির সঙ্গে অন্য কবির: এবং এই রকম আলোচনার পক্ষে সুধীন্দ্রনাথের শূন্য স্থান পূরণ করার কেউ নেই ব'লে, আজ আরো স্পষ্ট বুঝতে পারি যে 'কবি' শব্দের প্রতিটি অর্থ সুধীন্দ্রনাথের রচনা ও জীবনের মধ্যে মূর্ত হয়েছিলো।

তাঁর বিষয়ে অনেকেই ব'লে থাকেন যে তিনি বাংলা কবিতায় 'ধ্রুপদী রীতির প্রবর্তক'। এই কথার প্রতিবাদ ক'রে আমি এই মুহূর্তেই বলতে চাই যে সুধীন্দ্রনাথ মর্মে-মর্মে রোমান্টিক কবি, এবং একজন শ্রেষ্ঠ রোমান্টিক। এর প্রমাণস্বরূপ আমি দুটিমাত্র বিষয় উল্লেখ করবো: প্রথমত, তাঁর প্রেমের কবিতায় আবেগের তীব্রতা, বাসনা ও বেদনার অলজ্জিত ও ব্যক্তিগত চীৎকার – যার তুলনা আবহমান বাংলা সাহিত্যে আমরা খুঁজে পাবো না, না বৈষ্ণব কবিতায়, না রবীন্দ্রনাথে, না তাঁর সমকালীন কোনো কবিতে। দ্বিতীয়ত, ভগবানের অভাবে তাঁর যন্ত্রণাবোধ – এটিও একটি খাঁটি রোমান্টিক লক্ষণ। তিনি ভগবানের অভাব কবিতা দিয়ে মেটাতে চাননি, জনগণ বা ইতিহাস দিয়েও না: তাই, তিনি নিজেকে জড়বাদী

ব'লে থাকলেও, তাঁর কবিতা আমাদের ব'লে দেয় যে তাঁর তৃষ্ণা ছিলো সেই সনাতন অমৃতেরই জন্য। তিনি ছিলেন না যাকে বলে 'মিনারবাসী', স্বকালের জগৎ ও জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে লিপ্ত হ'য়ে আছে তাঁর কবিতা; কিন্তু যেহেতু তাঁর স্বকালে ভগবান মৃত, তাই কোনো মিথ্যা দেবতাকেও তিনি গ্রহণ করেননি; যারা প্রফুল্ল মনে 'সমস্বর নামসংকীর্তনে' যোগ দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়, তাদের বীভৎসতার পাশে নিজের স্বর্গের কল্পনাটিও রেখে গেছেন। যা মর্ত্যভূমিতে সম্ভব নয় তা যাঁর গভীরতম আকুতি, তাঁকে কী ক'রে জড়বাদী বলা যায়?

আর-একটি কথা বহু বছর ধ'রে শুনে আসছি: সুধীন্দ্রনাথের কবিতা দুর্বোধ্য। এ-বিষয়ে একটি পুরোনো লেখায় যা বলেছি, এখানে তার পুনরুক্তি করা ভিন্ন উপায় দেখি না। সুধীন্দ্রনাথের কবিতা দুর্বোধ্য নয়, দুরূহ; এবং সেই দুরূহতা অতিক্রম করা অল্পমাত্র আয়াসসাপেক্ষ। অনেক নতুন শব্দ, বা বাংলায় অচলিত সংস্কৃত শব্দ তিনি ব্যবহার করেছেন: তাঁর কবিতার অনুধাবনে এই হ'লো একমাত্র বিঘ্ন। বলা বাহুল্য, অভিধানের সাহায্য নিলে এই বিঘ্নের পরাভবে বিলম্ব হয় না। এবং অভিধান দেখার পরিশ্রমটুকু বহুগুণে পুরস্কৃত হয়, যখন আমরা পুলকিত হ'য়ে আবিষ্কার করি যে আমাদের অজানা শব্দ-সমূহের প্রয়োগ একেবারে নির্ভুল ও যথাযথ হয়েছে, পরিবর্তে অন্য কোনো শব্দ সেখানে ভাবাই যায় না। সুধীন্দ্রনাথের কবিতার গঠন এমন যুক্তিনিষ্ঠ, এমন সুমিত তাঁর বাক্যবিন্যাস, পংক্তিসমূহের পারম্পর্য এমন নির্বিকার, এবং শব্দ-প্রয়োগ এমন যথার্থ, যে মাঝে-মাঝে দুরূহ শব্দ ব্যবহার না-করলে তিনি হয়তো প্রাঞ্জলতার উদাহরণ ব'লেই গণ্য হতেন। কিন্তু মাঝে-মাঝে দুরূহ শব্দ ব্যবহার না-করলে, তাঁর কবিতা হ'তো না অমন সুমিত ও যুক্তিসহ, অমন ঘন ও সুশৃঙ্খল—অর্থাৎ, তাঁর চরিত্রই প্রকাশ পেতো না। আর এই দুরূহতা নিয়ে আপত্তি—পঁচিশ বছর আগেকার তুলনায় তা এখন অনেক মৃদু হওয়া উচিত, কেননা ইতিমধ্যে তাঁর প্রবর্তিত বহু শব্দ লেখক- ও পাঠকসমাজে প্রচলিত হ'য়ে গেছে; অল্পবয়সীরা হয়তো জানেনও না যে 'অন্বিষ্ট', 'অভিধা', 'ঐতিহ্য', 'প্রমা', 'প্রতিভাস', 'অবৈকল্য', 'ব্যক্তিস্বরূপ', 'বহিরাশ্রয়', 'কলাকৈবল্য' প্রভৃতি শব্দ ও শব্দবন্ধ—যা তাঁরা হয়তো কিছুটা যথেচ্ছভাবেই ব্যবহার করছেন—এগুলোর প্রথম ব্যবহার হয় সুধীন্দ্রনাথের কবিতায় ও প্রবন্ধে, এমনকি 'ক্লাসিকাল' অর্থে 'ধ্রুপদী' শব্দটিও তাঁরই উদ্ভাবনা। এই ধরনের শব্দসমবায়ের সাহায্যে তিনি যুগল সিদ্ধিলাভ করেছেন: একটিও ইংরেজি শব্দ ব্যবহার না-ক'রে, বা অগত্যা

চিন্তাকে তরল না-ক'রে, লিখতে পেরেছেন জটিল ও তাত্ত্বিক বিষয়ে প্রবন্ধ, এবং তাঁর কবিতাকে দিয়েছেন এমন এক শ্রবণসুভগ সংহতি ও গাম্ভীর্য, যাকে বাংলা ভাষায় অপূর্ব বললে বেশি বলা হয় না। এবং এই সব শব্দ-রচনার দ্বারা, বাংলা ভাষার সম্পদ ও সম্ভাবনাকে তিনি কতদূর বাড়িয়ে দিয়েছেন, তা হয়তো না-বললেও চলে। আধুনিক বাংলার ও আধুনিক যুগের একজন শ্রেষ্ঠ কবির এই কাব্যসংগ্রহ যাঁরা প্রথমবার পড়বেন, তাঁরা আমার ঈর্ষাভাজন, আর যাঁরা চেনা কবিতার সঙ্গে নিবিড়তর সম্বন্ধস্থাপনের জন্য এগিয়ে আসবেন, আমি নিজেকে তাঁদেরই সতীর্থ ব'লে মনে করি, কেননা আমি জানি যে আমার অবশিষ্ট আয়ুষ্কালে স্বল্প যে-ক'টি গ্রন্থ আমার নিত্যসঙ্গী হবে, এটি তারই অন্যতম।

এই গ্রন্থের ব্যবস্থাপনা বিষয়ে দু-একটি কথা বলা দরকার। 'অর্কেস্ট্রা' থেকে 'দশমী' পর্যন্ত কালানুক্রমে সাজিয়ে, 'তন্বী'কে স্থান দেয়া হ'লো 'দশমী'র পরে। কেননা, আমার বিশ্বাস, সুধীন্দ্রনাথ বেঁচে থাকলে আদ্যন্ত পরিশোধন না-ক'রে 'তন্বী'র পুনঃপ্রকাশে রাজি হতেন না ; এবং বর্তমান অবস্থায়, ঐতিহাসিক অর্থে সুধীন্দ্রনাথের প্রথম পুস্তক ব'লে, এর বিষয়ে আগ্রহান্বিত হবেন তাঁরাই, যাঁরা লেখকের পরবর্তী রচনাসমূহের সঙ্গে পরিচিত। তাই 'তন্বী'কে এই গ্রন্থের প্রথমে স্থান দিতে আমার বিবেকে বাধলো ; মনে হ'লো, অন্যান্য রচনা প'ড়ে আসার পরে 'তন্বী'তে পৌঁছনো পাঠকের পক্ষে অধিক সংগত হবে। পরিশিষ্ট অংশে স্থান পেলো দুটি অপ্রকাশিত কবিতা ('পুরস্কার' ও 'অমৃত'), তাঁর সর্বশেষ সমাপ্ত অনুবাদ-কবিতা, হান্স এগন হোল্টহুজেন-এর 'মৃত্যুর সময়', ও 'বার্ন্ট্ নর্টন'-এর প্রথম অনুচ্ছেদের দুটি অনুবাদ ; – এই ক-টি পঙক্তি সুধীন্দ্রনাথের সর্বশেষ রচনা। মৃত্যুর আগে সুধীন্দ্রনাথ 'অর্কেস্ট্রা' ও 'ক্রন্দসী'র নূতন সংস্করণ প্রস্তুত করছিলেন, ছাপা পৃষ্ঠার শাদা অংশে কিছু-কিছু সংশোধন ও পরিবর্তন রচিত হয়েছিলো। সেই সব নূতন লেখন এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট ক'রে 'পরিশিষ্টে' প্রাক্তন পাঠ উদ্ধৃত করা হ'লো। সংশোধনকালে সুধীন্দ্রনাথ বানানে যে-সব পরিবর্তন করেছিলেন, আধুনিক পাঠকের অভ্যাসের সঙ্গে সংগতি রেখে সেগুলিও এই গ্রন্থে যথাসম্ভব গ্রহণ করা হয়েছে।

ডিসেম্বর, ১৯৬০
কলকাতা

বুদ্ধদেব বসু

প্রায় ছয় বৎসর অমুদ্রিত থাকার পর 'সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কাব্যসংগ্রহ'-এর বর্তমান সংস্করণ প্রকাশিত হ'লো। গ্রন্থটির মুদ্রণ শুরু হয়েছিলো কবিপত্নী রাজেশ্বরী দত্তের মৃত্যুর অল্পদিন আগে। এ-সংস্করণ তিনি প্রকাশিত দেখে যেতে পারলেন না, এ-দুঃখ বইটির অনুষঙ্গে আমাদের মনে গ্রথিত হ'য়ে রইলো।

পূর্বতন সংস্করণের পাঠ অবিকৃত রেখে এই সংগ্রহে সংযোজিত হয়েছে পূর্ণাঙ্গ পাঠভেদ, কবিতার নাম ও প্রথম পংক্তির সূচি, বিভিন্ন সংস্করণের প্রচ্ছদচিত্র এবং সুধীন্দ্রনাথের লেখা 'অর্কেস্ট্রা' ও 'ক্রন্দসী'র বিজ্ঞাপন।

কবিভ্রাতা শ্রী হরীন্দ্রনাথ দত্ত ও শ্রী শৌরীন্দ্রনাথ দত্ত-এর সহযোগিতায় বহু কবিতার রচনাকাল উদ্ধার ক'রে দিয়েছেন শ্রী স্বপন মজুমদার। সংযোজন অংশ তাঁরই সংকলন। প্রকাশনার অন্যান্য বহুবিধ ব্যাপারে আনুকূল্য করেছেন শ্রী জগন্নাথ ভট্টাচার্য। সংশ্লিষ্ট সকলকে সকৃতজ্ঞ নমস্কার জানাই।

প্রকাশক

সূচিপত্র

ক্রন্দসী

উত্তরফাল্গুনী

সংবর্ত

প্রতিধ্বনি

দ শ মী

ত ন্বী

সুধীন্দ্রনাথ দত্তের
কাব্যসংগ্রহ

অর্কেস্ট্রা

ভূমিকা

পিতৃদেব ছিলেন নিশ্চিন্ত বৈদান্তিক ; এবং আকৈশোর অদ্বৈতের অনির্বচনীয় আতিশয্যে উত্ত্যক্ত হয়ে, আমি যদিও অল্প বয়সেই অনেকান্ত জড়বাদের আশ্রয় নিয়েছিলুম, তবু বিচারবুদ্ধির স্বাতন্ত্র্য আজও আমার অধিকারে এসেছে কিনা সন্দেহ। এখন ভাবতে আশ্চর্য লাগে যে একদা আমার কলমও চলত অবাধে ; এবং বোধহয় সেই জন্যে, প্রেরণাতে অলৌকিকের আভাস আছে ব'লে, সাহিত্য-সৃষ্টির উক্ত উপকরণ আমি সাধ্যপক্ষে মানতে চাইনি, তার বদলে আঁকড়ে ধরেছিলুম অভিজ্ঞতাকে। অবশ্য বর্তমানে, লেখনীর পক্ষাঘাত সত্ত্বেও, স্বপ্নচারী পথিককে যেমন, অনুপ্রাণিত কবিকে আমি তেমনই ডরাই ; এবং কালের বৈগুণ্যে ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষের মূল্য বাড়ছে বই কমছে না। কিন্তু ক্রোচে-র নন্দনতত্ত্বে আধ্যাত্মিক অভিনিবেশ থাক বা না থাক, উক্তি ও উপলব্ধির যে-অভেদে তিনি বিশ্বাসী, তার সঙ্গে বস্তুনিষ্ঠার বিবাদ আর আমার চোখে পড়ে না ; এবং যত দিন যাচ্ছে, তত বুঝছি যে অনুরূপ অন্তর্দৃষ্টি ব্যতীত, শুধু কাব্যরচনা কেন, স্বায়ত্তশাসনও দুষ্কর।

শারীরবৃত্তে ক্ষুধা অন্ত্রের প্রসার-সংকোচ-মাত্র ; এবং এ-কথা দেহাত্ম-বাদীরও স্বীকার্য যে উক্ত প্রক্রিয়া গবেষকের বোধগম্য বটে, কিন্তু বুভুক্ষার ব্যক্তিগত অনুভব একেবারে আলাদা জাতের। উপরন্তু একজন জড়বাদী বৈজ্ঞানিকই দেখিয়েছেন যে শিক্ষার গুণে বেদনার স্বভাবসিদ্ধ প্রবর্তনা বদলানো আদৌ শক্ত নয়, বরঞ্চ সমাজভুক্ত মানুষের পক্ষে তার অন্যথাই অভাবনীয় ; এবং সেই জন্যে ক্ষুধার মতো মৌল অভিজ্ঞতা সুদ্ধ সংস্কার-সংক্রমিত। অবশ্য অনেক দার্শনিক ও অধিকাংশ মনোবিজ্ঞানীর মতে সামান্যের উপলব্ধি অসম্ভব ; এবং সংস্কার যদিও গোষ্ঠীগত, তবু অনুভূত সংস্কার স্পষ্টতই প্রাতিস্বিক। তবে এখানে অস্বীকার কূট তর্ক তুলে লাভ নেই : সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ-ব্যতিরেকেও ধরা পড়ে যে স্থূল ভাষায় আমরা যাকে অভিজ্ঞতা বলি, তাতে বেদনার বৈশিষ্ট্য আর ভাবনার সাধারণ্য প্রায় সমান অনুপাতে বিদ্যমান ; এবং উক্তি ও উপলব্ধি যখন অবিচ্ছেদ্য, তখন অন্তত অভিজ্ঞতাপ্রধান লেখা পড়লে, বোঝা উচিত তার কতটুকু রচয়িতার নিজস্ব আর কতখানি গতানুগতিক।

দুর্ভাগ্যবশত উল্লিখিত সিদ্ধান্তে পৌঁছাবার অনেক আগেই 'অর্কেস্ট্রা' রচিত ও প্রকাশিত; এবং তখন, পরবর্তী কবিতাগুলোয় অভিজ্ঞতা প্রেরণার স্থান নিয়েছে ব'লে, বেশ খানিকটা গর্ববোধকরেছিলুম। কিন্তু অভিজ্ঞতাও প্রেরণার মতো উপাত্তমাত্র; এবং শিল্প সচেতন রূপকারের অভূতপূর্ব সৃষ্টি। অর্থাৎ শিল্পসামগ্রীর উপাদান যদিও সনাতন ও সার্বজনীন সংসারেই আহরণীয়, তবু যে-অসামান্য বিন্যাসে সেই চিরপরিচিত উপকরণসমূহ আমাদের বিস্ময় জাগায়, তার উৎপত্তি শিল্পীর একাগ্র সংকল্পে; এবং এই দিক থেকে শিল্পবস্তু আমার মতে ব্যক্তির সঙ্গে তুলনীয়। কারণ দার্শনিক পরিভাষায় যার নাম বিশেষ, সে-বস্তুও আসলে হয়তো অসংখ্যাত সাধারণের অনন্য সমষ্টি; এবং তাই যেমন মানুষে মানুষে আদান-প্রদান সম্ভব, তেমনই এক ইন্দ্রিয়ের উপলব্ধি অপর ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গ্রাহ্য। অন্ততপক্ষে নিপট নৈয়ায়িক ছাড়া আর সকলেই মানবেন যে ব্যক্তিগত অনুভূতির পাঙক্তেয় অভিব্যক্তি বিপ্রলাপ নয়; এবং সাহিত্যে ওই অঘটনসংঘটন মূলত বেদনা ও ভাষার সামঞ্জস্য-সাপেক্ষ।

বলা বাহুল্য উক্ত সমীকরণ একা প্রতিভার কর্ম নয়, অক্লান্ত পরিশ্রম ও নিরন্তর প্রযত্নের পুরস্কার; এবং যাঁরা ভাবতে অভ্যস্ত যে কাব্য প্রেরণা বা অভিজ্ঞতার লীলাভূমি, তাঁদের বিচারে কলাকৌশল স্বাচ্ছন্দ্যের জন্মশত্রু। এমনকি রবীন্দ্রনাথের মতো সাধক পুরুষও অনুরূপ বিশ্বাস ছাড়তে পারেননি; এবং এক দিন 'উড়ে চ'লে গেছে'—এই অপরিচ্ছন্ন ক্রিয়ার 'উড্ডীন'-বিশেষণে রূপান্তরের চেষ্টায় আমাকে সারা সন্ধ্যা কাটাতে দেখে, তিনি খুশী হয়েছিলেন বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সাবধান ক'রেও দিয়েছিলেন যে যদি ওই ভাবে, অত আস্তে আস্তে লিখি, তবে আমার কলম অচিরে একেবারে থেমে যাবে। উপরন্তু 'অর্কেস্ট্রা'-র বিষয়বস্তু তাঁর সুরুচিতে বাধলেও, এ-বইয়ে তিনি যেহেতু লেখকের অকপট অভিজ্ঞতা খুঁজে পেয়েছিলেন, তাই এর প্রকাশে তাঁর অসম্মতি ছিল না; এবং বই বেরোনোর পরে তাঁর মত বদলে থাক বা না থাক, মনে আছে পাণ্ডুলিপি প'ড়ে 'অর্কেস্ট্রা'-র পূর্ববর্তী আমার প্রায় সকল কবিতা তাঁর কাছে কৃত্রিম লেগেছিল।

অবশ্য তখনও জানতুম যে ওই মন্তব্যে স্নেহের ভাগ বিবেচনার চেয়ে বেশী; এবং আজ সমালোচনার অংশে আত্মপ্রসাদের কণাও মেলে না, বুঝি যে তাতে কাব্যজিজ্ঞাসার অভাবই সুপ্রকট। কারণ যে-কবিতা অভিজ্ঞতার নিজস্বে সমৃদ্ধ, তার অভিব্যক্তি স্বতই স্বকীয়; এবং 'অর্কেস্ট্রা'-র রবীন্দ্রনাথের

একাধিক পঙ্‌ক্তি তো, জ্ঞানে বা অজ্ঞানে, এসে গেছেই, এমনকি সাধু ও প্রাকৃতের মধ্যবর্তী যে-সাঙ্কা ভাষায় সে-কালের অধিকাংশ বাংলা কবিতা লেখা হত, তাই এ-গ্রন্থের বাহন। তাছাড়া অন্ত্যানুপ্রাসের চাহিদায়, তথা ছন্দোরক্ষার প্রয়োজনে, শব্দের বিকৃতি, পাদপূরণের জন্যে ক্রিয়াপদের গ্রাম্য রূপ অথবা বর্ণ-সংকোচ ও -বৃদ্ধি, হওয়া ও করা ধাতুর পৌনঃপুন্য, সম্বোধনের অনাবশ্যক বাহুল্য ইত্যাদি বাংলা পদ্যের সুপ্রচলিত যথেচ্ছাচার 'অর্কেস্ট্রা'-র সর্বত্র ছড়িয়ে ছিল; এবং এর নায়িকা যদিও বিংশ শতাব্দীরই তরুণী, তবু তার অঙ্গে যেমন নূপুরাদি প্রাচীন ভূষণের প্রাদুর্ভাব, তেমনই তার সঙ্গে আলাপে ও আচরণে সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রের প্রভাব প্রায়ই সুস্পষ্ট।

এলিয়ট্ কবিকে ঘটক আখ্যা দিয়েছেন; এবং আমিও মনে করি যে ব্যক্তিগত মনীষায় জাতীয় মানস ফুটিয়ে তোলাই কবিজীবনের পরম সার্থকতা। কিন্তু আপন কালের স্বধর্ম ভুললেই, সে-সমন্বয় সহজ হয় না, যিনি উক্ত সংগমের দিকে এগোতে চান, নিজের অভিজ্ঞতাকে, তথা জাতিগত চৈতন্যকে, প্রতীক-রূপে দেখাতে তিনি বাধ্য; এবং ওই দিব্য দৃষ্টি যাঁর অধিকারে, তাঁর কাছে আমার প্রিয়া আর কালিদাসের কান্তা এক বটে, তবু সে-অভেদের ভিত্তি ব্যতিহার ছদ্মবেশে নয়, প্রেমানুভূতির নৈর্ব্যক্তিক স্বরূপে। পক্ষান্তরে 'অর্কেস্ট্রা'-র অভিজ্ঞতা নিষ্কষের ধার ধারে না; তার পুঙ্খানুপুঙ্খও যাতে স্মৃতিপটে চিরমুদ্রিত থাকে, সেই জন্যে তার চতুর্দিকে মনের এই অবিরাম পরিক্রমা; এবং তার প্রতি লেখকের মমতা আত্যন্তিক ব'লেই, সে-তিলোত্তমার স্বতন্ত্র সত্তা সে-দিন ধরা পড়েনি। অর্থাৎ 'অর্কেস্ট্রা'-য় উক্তি ও উপলব্ধির সাযুজ্য অনুপস্থিত; এবং তাই, তীব্র ও সংক্ষিপ্ত আবেগের প্রণোদনা সত্ত্বেও, এ-বইয়ের মুক্ত ছন্দ প্রায়ই শিথিল।

আমার বিশ্বাস যে তদানীন্তন কাব্যাদর্শে মারাত্মক ভুল না থাকলে, 'অর্কেস্ট্রা'-য় এত ত্রুটি জমতে পারত না; এবং এ-কথা নিশ্চয় বলতে পারি যে রচনাকালেও অনেক দোষই আমাকে পীড়া দিয়েছিল। কিন্তু সকল রোগের প্রতিকার তখন আমার সাধ্যে কুলায়নি; এবং কোনও কোনও কবিতায় ভাবের অগতি ও ছন্দের অসংগতি দেখেও, সংস্কারের চেষ্টা করিনি, পাছে আপাতস্বচ্ছন্দ অভিজ্ঞতার অপঘাত ঘটে, সেই জনশ্রুত ভয়ে। আজ যদিও জানি না ইতিমধ্যে লিপিচাতুর্যে সত্যই এগিয়েছি কিনা, তথাচ আমার বিচারবুদ্ধি সন্নিকর্ষের ফলে আর ব্যাহত নেই; এবং সেই জন্যে বিনা সংশোধনে 'অর্কেস্ট্রা'-র পুনর্মুদ্রণ আমার বিবেকে বাধল। তবে সর্বত্র, এমনকি যেখানে

সমস্ত উলটে-পালটে গেছে সেখানেও, প্রয়াস পেয়েছি যাতে বর্তমান পরিবর্তন, তখন যে-ক্ষমতাটুকু ছিল, তাকে ছাড়িয়ে না যায়; এবং সংগতির তাগিদে মাঝে মাঝে চিত্রকল্প আগা-গোড়া বদলেছি বটে, তবু জানত কোথাও অর্থ-গৌরব বাড়াতে চাইনি।

অনেকের ধারণা—এবং তাঁদের মধ্যে লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিকের অভাব নেই—প্রকাশিত রচনা যেহেতু লেখকের অধিকারবহির্ভূত, তাই তার রূপান্তর অনুচিত, এমনকি অবশ্যদণ্ডনীয়; এবং য়েট্‌স্‌ প্রভৃতি একাধিক মহাকবির মত যদিচ একেবারে বিপরীত, তবু আমি প্রথম পক্ষের সমর্থনে এই পর্যন্ত মানতে প্রস্তুত যে অতীত বৈকল্যের অস্বীকার, শুধু অপলাপের নয়, স্বাবমাননারও চূড়ান্ত। কারণ ব্যক্তিস্বরূপ পরিণতিসাপেক্ষ: উত্তরাধিকারসূত্রে আমরা পাই চারিত্র্য; এবং সেই বংশানুক্রমিক ঝোঁক যত দিন সংকল্পিত উদ্দেশ্যের দিকে এগোতে থাকে, তত দিনই আমরা সৃষ্টিক্ষম। অন্তত তাই হেগেল্‌-এর সিদ্ধান্ত; এবং সেই নির্দেশের অনুসারে হর্বর্ট্‌ রীড্‌ দেখিয়েছেন যে স্বয়ং ওয়র্ড্‌স্‌ওয়র্থ্‌-ও পরিণামী ব্যক্তিস্বরূপে আস্থা হারিয়েই, বাগ্‌দেবীর ত্যাজ্যপুত্র হয়েছিলেন। সুতরাং অ্যারিস্টটলীয় ভগবানের মতো আপন পরিপূর্ণতার ধ্যানে ডুবে গেলে, কবিপ্রতিভার সর্বনাশ অনিবার্য; এবং উপনিষদে পরমাত্মার অন্যতম উপাধি কবি বোধহয় এই জন্যে যে জন্মান্তরীণ অভিব্যক্তিবাদ হিন্দু বিশ্ববীক্ষার মূল সূত্র।

কিন্তু কপট বিনয়ীর আত্মলাঘব আর অনুব্যবসায়ীর আত্মশুদ্ধি অন্বয়-ব্যতিরেকী সম্বন্ধে সংযুক্ত; এবং 'অর্কেস্ট্রা'-র স্খলন-পতন-ত্রুটি আজ আমার কাছে যতই লজ্জাকর ঠেকুক না কেন, তদন্তর্গত কবিতাবলীর পুনর্মুদ্রণে বাধা দিলে, যেমন অমূলক আত্মমর্যাদাই প্রকাশ পেত, এগুলোর সংস্কার-সাধনে বিরত থাকলে, তেমনই সূচিত হত রূপকারী বিবেকের অভাব, তথা পাঠকের প্রতি অবজ্ঞা। কেননা আমরা বই ছাপাই পাঠকেরই প্রত্যাশায়; এবং আমাদের লেখায় চেষ্টার অভাব মার্জনা করতে তিনি মোটেই বাধ্য নন। পক্ষান্তরে 'অর্কেস্ট্রা'-কে আমার বর্তমান রচনার পর্যায়ে তুলতে আমি অসম্মত; এবং আমার বিশ্বাস এই বিকলাঙ্গ কাব্যসংগ্রহ ঐতিহাসিক মূল্যে একেবারে বঞ্চিত নয়। আগেই বলেছি যে বৈবিক উদ্ধৃতি এ-গ্রন্থের অনেক জায়গা জুড়ে আছে; এবং যেখানে সে-ঋণ ইচ্ছাকৃত, হয়তো সেখানেই আমার বক্তব্য বিশেষত অতিরাবীন্দ্রিক। তাছাড়া বাংলা কবিতার পদলালিত্য এ-গ্রন্থে

প্রত্যাখ্যাত; এবং এতে রোমান্টিক্ সৌন্দর্যবোধের ব্যবহার বিরূপ বিশ্বের পৃষ্ঠপোষক হিসাবে।

বুঝি বা সেই জন্যে যে-সংগতি পাশ্চাত্ত্য সিম্ফনিক্ সংগীতের প্রধান লক্ষ্য, তার ইঙ্গিতও 'অর্কেস্ট্রা'-র প্রথম সমালোচকেরা নাম কবিতায় খুঁজে পাননি; এবং তাঁদের মন্তব্যে যদিচ সাংগীতিক সামঞ্জস্যের সঙ্গে মানসিক নির্বন্ধের পার্থক্য বোঝার চেষ্টা পর্যন্ত দেখি না, তবু আজ আমি মুক্ত কণ্ঠে মানি যে, সার্থক কবিতা যে-অমায়িক অভিজ্ঞার অমোঘ অভিব্যক্তি, তার আভাস সুদ্ধ পরবর্তী রচনাগুলোর একটাতেও নেই। কিন্তু 'অর্কেস্ট্রা'-অভিধেয় বহুরূপী লেখাটা, বাক্যের অসহযোগ সত্ত্বেও, কায়-মনের সপ্তপদী; এবং তার সাত কাণ্ড যেমন গতিমূলক পরাকাষ্ঠার সোপানপরম্পরা, তেমনই প্রত্যেক পর্ব আবার ত্রিবিধ উপলব্ধির তাৎকালিক সমন্বয়। অর্থাৎ প্রতি ভাগে ঘুরে ঘুরে এসেছে রঙ্গালয়ের অভ্যন্তরীণ দৃশ্য, শ্রাব্য ঐকতানের অতিশ্রুতি ব্যঞ্জনা, আর শ্রোতৃবিশেষের সমবায়ী ভাবানুষঙ্গ; এবং সমগ্র কবিতার ত্রিবেণীতে এক দিনের সাত প্রহরব্যাপী অভিজ্ঞতাই কৈবল্যপ্রার্থী নয়, তাতে—সম্ভবত গ্রন্থের অন্যত্রও—বহিঃপ্রকৃতি ও অন্তরাত্মার, তথা লোকায়ত ও লোকোত্তরের, অবৈকল্যও অন্তত উহ্য আছে।

উল্লিখিত সংগতির দ্বিরুক্তীয় ক্ষেত্রে সন্যসন্ধানীর বিহার প্রশস্ত কিনা, সে-প্রশ্নের উত্তর 'অর্কেস্ট্রা'-র লেখক হিসাবে আমার দেয় নয়; এবং আজ আমার পক্ষে শিশুশিক্ষার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ অনাবশ্যক বটে, কিন্তু এখনও কবি ও প্রবক্তার পঙ্ক্তিভোজন আমার জাতিবিচারে বাধে। সে যাই হোক, আমি ভাবতে পারি না যে প্রাণযাত্রার পথনির্দেশে আমার লেখা বা কাব্যাদর্শ আর্ষ প্রয়োগের উপযুক্ত; এবং এ-কথাও বোধহয় ঠিক যে, গুরুগম্ভীর তত্ত্বে বঞ্চিত ব'লেই, 'অর্কেস্ট্রা' স্বাভাবিক। পক্ষান্তরে রিল্কে-র মতে অল্প বয়সের কবিতামাত্রেই শূন্যগর্ভ; এবং সুদীর্ঘ জীবনের সমস্তটা তাৎপর্য ও মাধুর্যের ধ্যানে কাটালে, তবে হয়তো অন্তিমে দশটা সার্থক পদ কলমের মুখে জোটে; আর তত দিন শুধু মনে রাখা যথেষ্ট নয়, ভোলা দরকার, যাতে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত স্মৃতির পরিণতি ঘটে ধমনীর রক্তে, চোখের চাওয়ায়, এমনকি আপতিক অঙ্গভঙ্গীতে—অর্থাৎ আমাদের অনামিক একান্তে, ক্রোচে-প্রদর্শিত উক্তি ও উপলব্ধির অদ্বৈতে।

ওই কথাটাকেই ঘুরিয়ে বলা যায় যে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আর কাব্যগত

অভিজ্ঞতা এক নয়, প্রথম যেখানে সারা, সেখানেই দ্বিতীয়ের শুরু ; এবং যে-পর্যন্ত কবিতারচনা না ফুরায়, সে-পর্যন্ত শেষোক্তের বিকাশ তো চলে বটেই, উপরন্তু কাব্যবিশেষের সমাধানেও, তার উদ্ভ্রণ অনেক সময়ে থামে না। ফলত গ্যেটে-প্রমুখ কবিদের অভিজ্ঞতা আমরণ বাড়তে থাকে, আর সঙ্গে সঙ্গে বদলায় অতীত অভিজ্ঞতার অর্থ ; এবং আমি যদিও সে-গোষ্ঠীর মানুষ নই, তবু তাঁরাই যেহেতু আমার ঈর্ষার পাত্র, তাই বোধহয় আমার লেখা আজ অবধি স্থায়িত্ব পায়নি। ইতিমধ্যে, রবীন্দ্রনাথের ভবিষ্যদ্বাণী সফল ক'রে, আমার লেখনী প্রায় অচল হয়েছে ; এবং সে-জন্যে মাঝে মাঝে যেমন আত্মধিক্কার জাগে, তেমনই এ-সত্ত্বেও কেবলই ফিরে আসি যে তাঁর আর আমার ধর্ম আকাশ-পাতালের মতো পৃথক্। তিনি সূর্য, উদয়াস্ত নির্বিকার : আমি অন্ধকারে বদ্ধমূল, আলোর দিকে উঠছি ; সদ্গতির আগেই হয়তো তমসায় আবার তলাব।

কখনও যদি লেখবার মতো কথা মানসে জমে, তবে তার উচ্চারণ-পদ্ধতিও আপনি যোগাবে ; এবং তত দিন আমি বাক্সংবরণ করলে, আর যার ক্ষতি হোক, বঙ্গসাহিত্য রসাতলে যাবে না। কারণ এ-দেশে স্বভাব-কবির অভাব নেই : এবং, কথা ভাষা কোন্ ছার, লিখিত গদ্যের সঙ্গেও নাড়ির সম্পর্ক কাটিয়ে, আমাদের পদ্য অদ্যাবধি নিজেকে অবাধ রেখেছে। উপরন্তু ভারতচন্দ্র, মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ ইত্যাদির উদ্যমে গীত বাংলা কবিতার অপটু ছন্দঃপ্রকরণে যে-সুব্যবস্থা এসেছিল, তাও, তথা ব্যাকরণ, বর্তমান কবিপ্রগতির অন্তরায় ; এবং আমি যেহেতু উচ্ছ্বসিত আত্মপ্রকাশের বয়স পেরিয়েছি, তাই স্বরচিত নিয়মের অঙ্গীকারেই আমার মুক্তি। পক্ষান্তরে অসমাপ্ত স্বায়ত্তশাসনের অন্যতম বিড়ম্বনা বৈফল্যবোধ ; এবং সদ্দিলগ্নের প্রতীক্ষায় বেলা ফুরাতে দেখে, অহংকার যেই অতীতে তাকায়, অমনই বেরিয়ে পড়ে পুরাতন রচনাবলীর সংস্কারসাধ্য দোষ। সে-সকল ত্রুটির কিছুও শোধরাতে পারছি কিনা, তা অবশ্য পাঠকেরই বিচার্য ; কিন্তু আমার দিকে চেষ্টার কার্পণ্য নেই।

১ আগস্ট ১৯৫০

সত্যেন্দ্রনাথ বসুর

করকমলে —

হৈমন্তী

বৈদেহী বিচিত্রা আজি সংকুচিত শিশিরসন্ধ্যায়
প্রচারিল আচম্বিতে অধরার অহেতু আকূতি :
অস্তগামী সবিতার মেঘমুক্ত মাঙ্গলিক দ্যুতি
অনিত্যের দায়ভাগ রেখে গেল রজনীগন্ধায় ॥

ধূমায়িত রিক্ত মাঠ, গিরিতট হেমন্তলোহিত,
তরুণতরুণীশূন্য বনবীথি চ্যুত পত্রে ঢাকা,
শৈবালিত স্তব্ধ হ্রদ, নিশাক্রান্ত বিষণ্ণ বলাকা
ম্লান চেতনারে মোর অকস্মাৎ করেছে মোহিত ॥

নীরব, নশ্বর যারা, অবজ্ঞেয়, অকিঞ্চন যত,
রুচির মায়ায় যেন বিকশিত তাদের মহিমা ;
আমার সংকীর্ণ আত্মা, লঙ্ঘি আজ দর্শনের সীমা,
ছুটেছে দক্ষিণাপথে যাযাবর বিহঙ্গের মতো ॥

সহসা বিস্ময়মৌন উচ্চকণ্ঠ বিতর্ক, বিচার,
প্রাণের প্রত্যেক ছিদ্রে পরিপূর্ণ বাঁশরীর স্বর :
জানি মুগ্ধ মুহূর্তের অবশেষ নৈরাশে নিষ্ঠুর ;
তবু জীবনের জয় ভাষা মাগে অধরে আমার ॥

যারা ছিল এক দিন ; কথা দিয়ে, চ'লে গেছে যারা ;
যাদের আগমবার্তা মিছে ব'লে বুঝেছি নিশ্চয় ;
স্বয়ম্ভূ সংগীতে আজ তাদের চপল পরিচয়
আকস্মিক দুরাশায় থেকে থেকে করিবে ইশারা ॥

ফুটিবে গীতায় মোর দুঃস্থ হাসি, সুখের ক্রন্দন,
দৈনিক দীনতা-দুষ্ট বাঁচিবার উল্লাস কেবল,
নিমেষের আত্মবোধ, নিমেষের অধৈর্য অবল,
অখণ্ড নির্বাণ-ভরা রমণীর তড়িৎ চুম্বন ॥

মোদের ক্ষণিক প্রেম স্থান পাবে ক্ষণিকের পাত্রে,
স্থান পাবে, হে ক্ষণিকা, শ্লথনীবি যৌবন তোমার :
বক্ষের যুগল স্বর্গে ক্ষণতরে দিলে অধিকার ;
আজি আর ফিরিব না শাশ্বতের নিষ্ফল সন্ধানে ।

১ অক্টোবর ১৯২৯

চপলা

জনমে জনমে, মরণে মরণে,
মনে হয় যেন তোমারে চিনি ।
ও-শরমার্ত অরূপ আনন
দেখেছি কোথায়, হে বিদেশিনী ?
নীল নবঘন, চঞ্চল আঁখি
যে-তড়িৎময়ী কালবৈশাখী
থেকে থেকে আজ হানিছে আমার
তাপনিরিক্ত চিত্তাকাশে,
ফুরায়েছিল কি বিগত জীবন
ও-মদমত্ত সর্বনাশে ?

শত ফাল্গুন তোমার অভাবে
বিফল হয়েছে, অপরিচিতা ;
সার্থক যোগে মূর্ত হতাশ
কানে কানে মোরে ডেকেছে — মিতা ,
শিথিল নীবিতে প্রগল্ভ পাখি
বারে বারে কেন থেমেছে না জানি ;
শূন্যগর্ভ বহ্নির মতো
উল্লাসে মোর অশেষ ক্ষুধা ,
বিরহ বিরাজে দলিত বাসরে ;
মরণাসক্ত ফেনিল সুধা ।

চকিতে চমকি তুপ্ত হৃদয়
উত্তল, অকায় আবির্ভাবে,
ভরিলে চরম ক্ষতির দীনতা
বারে বারে মোর পরম লাভে ;
অকারণে আঁখি ভারাতুর করি,
অক্ষম লোর সাঁঝে দিলে ভরি ;
শীর্ণ স্মৃতির চ্যুত পল্লব
মুখরি অলখ চরণপাতে,
মুহু মুহু মোর বিজন মানসে
এসেছিলে তুমি বিনিদ রাতে ॥

ঘাটে, বাটে, মাঠে ঘটেছে মোদের
আধোপরিচয় নিত্যনব :
দেখেছি বিকচ দাড়িম্ববনে
প্রচুরপরাগ প্রসাদ তব ;
তোমারই কেশের প্রতিচ্ছায়ায়
গোধূলির মেঘ সোনা হয়ে যায়
পাকা দ্রাক্ষার অরাল লতায়
তোমারই তনুর মদিরা ভরা ;
পথপার্শ্বের অপরাজিতা, সে
তোমারই দৃষ্টি লক্ষ্যহরা ॥

ঈর্ষা তোমার হেনেছে ঝঞ্ঝা
বর্ভসবিবশ কুটীরে মম ;
কাটলে ফাটলে কষায় নয়ন
ভ্রূকুটি করেছে ক্রটিরে মম ।
ডেকেছ আমারে উদ্ধত প্রেমে,
দেখেছি লগ্ন গত, পথে নেমে ;
বাদলশেষের ঝিল্লির স্বনে
বাজায়ে নূপুর অধীর স্বরে,

করি অবিরত উপেক্ষাহত,
চ'লে গেছ তুমি অগম দূরে।

চির জনমের প্রবঞ্চনার
ক্ষালনে আজি কি, ছলনাময়ী,
চিত্তসঞ্চিত অমৃত বিতরি,
করিবে আমারে মরণজয়ী ?
অথবা আবার খামখা খেয়ালে
অন্ধেরে ঘিরে মমতার জালে,
ক্ষুদ্রপূজার ষোড়শোপচার
রচাবে কেবলই শূন্য পীঠে ?
অমর হাসির বজ্রদাহনে
জ্বালাবে লোলুপ মর্ত্যকীটে ?

৮ অগস্ট ১৯২৯

অপচয়

প্রেয়সী, আছে কি মনে সে-প্রথম বাসর রজনী
ফেনিল মদিরা-মত্ত জনতার উদ্দাম উল্লাস,
বাঁশির বর্বর কান্না, মৃদঙ্গের আদিম উচ্ছ্বাস,
অন্তরের অন্ধকারে অনঙ্গের লঘু পদধ্বনি ?

আছে কি স্মরণে, সখী, উৎসবের উগ্র উন্মাদনা,
করদ্বয়ে পরিপ্লুতি, চারি চক্ষে প্রগল্‌ভ বিস্ময়,
শূন্য পথে দুটি যাত্রী, সহসা লজ্জার পরাজয়,
প্রতিজ্ঞার বহুলতা, আশ্লেষের মুগ্ধ প্রবর্তনা ?

সে-তপ্ত চৈতন্ত, হায়, বৃথা তর্কে আজি দিশাহারা,
বন্ধ্য স্পর্শে পরিণত স্বপ্নগ্রন্থ সে-গাঢ় চুম্বন ;
ভ্রাম্যমাণ আলেয়ারে ভেবেছিল বুঝি ধ্রুবতারা,
অকূল পাথারে তাই মগ্নতরী আমার যৌবন ॥

মরে না দুরাশা তবু ; মনে হয় এ-নিঃস্ব জগতে
এতখানি অপচয় ঘটাবে না বিধি কোনও মতে ॥

১৬ সেপ্টেম্বর ১৯১৯

কস্মৈ দেবায়

হায়, গর্বান্বিতা,
দানবিক আত্মারে যে-অনির্বাণ রাবণের চিতা,
ভস্মান্ত না ক'রে, দহে হৃদয়সৈকতে,
ভাবো তুমি জন্মে জন্মে, পুনরুক্ত শপথে শপথে,
যোগাও ইন্ধন তার লাগি ?
ভাবো আমি জাগি
অনাশ্বস্ত দিনমান, উৎকণ্ঠিত নিশা
শুনিবারে তব পদধ্বনি ?
প্রত্যাসন্ন নূপুরের মুগ্ধ আগমনী
আমার উদ্বেল মর্মে ভ'রে দেয় স্বর্গবিজিগীষা ?
কঙ্কণের প্রস্থিত নিক্বণে
মুমূর্ষার প্ররোচনা অসংবদ্ধ প্রাণের গহনে ?

ভালোবাসি তোমারে নিশ্চয় ;
দাম্ভিক হৃদয়
তোমার চরণচিহ্ন আজীবন বহিবে গৌরবে ;
মনে রবে বিকারে, বিক্ষোভে,

১৫

এক দিন দিয়েছিলে জ্বালি
প্রেতসঞ্চরিত ধ্বংসে উৎসবের অচির দীপালী ;
মোর ভালে
একদা যে এঁকেছিলে ইন্দ্রত্বের টিকা,
সংক্ষিপ্ত সুকৃতি-শেষে, স্বর্গ হতে বিদায়ের কালে
মনে রবে সে-কথা, ক্ষণিকা ॥

জানি তবু
তোমার উদীর্ণ আবির্ভাবে
মোর শূন্য পরিপূর্ণ হয় নাই কভু ;
অবলুপ্ত অতল অভাবে,
তোমার অজস্র দান
বরঞ্চ গিয়েছে রেখে নেতির প্রমাণ।
নিভৃত নিশীথে
নীরব আকাঙ্ক্ষা-ভরে এসেছিলে বাসরশয্যায় ;
ত্রস্ত অলজ্জায়
চেয়েছিলে অযাচিত উপহার দিতে
অনুপম কৌমার্য তোমার।
অজাতসংস্কার,
মদমত্ত, আরণ্যিক আমার যৌবন
প্রাক্তন তিমিরে করে অহরহ যার অন্বেষণ,
তুমি সে-স্বৈরিণী নও, হে দাক্ষিণ্যময়ী ॥

অমৃতের উদাত্ত মাভৈ
নির্বিদ আহ্বানে যার প্রতিধ্বনি তোলে অবিরত,
সে আসে না, নব অনুরাগিণীর মতো,
নম্র নেত্রে, রক্ত মুখে, সন্তর্পণে সংবরি কিঙ্কিণী।
নিঃশঙ্কিনী,
জনারণ্য উন্মথি, সে চলে,
আস্ফালি উদ্ধত অসি, নির্জিতের মুণ্ডমালা গলে,

নির্মল নম্রতাখানি বর্মসম পরি।
বেষ্টনীর কুটিল কৌতুক
ছারখার করি,
স্থিরলক্ষ্য নয়নের নিবদ্ধ কার্মুক
বর্ষে নিরন্তর
মর্মঘাতী উপেক্ষার অগ্নিময় শর।
সে আসে না, ভিক্ষুকের প্রায়,
উচ্ছিষ্ট প্রেমের কণা আহরিতে অধম ক্ষুধায়;
সে আসে না স্তব্ধ অন্ধকারে,
সামান্য চোরের মতো, অজানার গুপ্ত অভিসারে।
বিজয়ীর বেশে
সশস্ত্র ভাণ্ডারে পশি, আপনার দক্ষিণা কাড়ে সে॥

তারই তরে
উৎসুক প্রত্যাশা মোর দিকে দিগন্তরে
নেহারে অস্থির মরীচিকা।
এক বার হয়েছিল মনে
তব শিষ্ট প্রণয়ের গভীর গোপনে
সৃজনপ্রলয়ময়ী, অনিশ্চয় আগ্নেয়াদ্রিশিখা
অন্তঃশীলা রয়েছে বুঝি বা।
সমুন্নত গ্রীবা
তাই অবনত করি, ও-মুখের পানে
চাহিলাম ব্যাকুল নয়ানে॥

কিন্তু, হায়,
অতিমর্ত্য উন্মাদনা অচিরাৎ পলাল কোথায়?
তরুশিরে আন্দোলন তুলি,
ভুবনে স্তব্ধতা হানি, চ'লে যায় যথা, পথ ভুলি,
দূর দিয়ে মত্ত প্রভঞ্জন,
তেমনই এল না লগ্নে, আসি-আসি ব'লেও, মাতন।

অকস্মাৎ
তোমার সর্বাঙ্গে নামে আর্ত পক্ষাঘাত,
স্তব্ধ বাক্যে ক্লীবের নিপুণ প্রত্যাখ্যান ;
নির্বাপিত চক্ষে জাগে সংসারীর ভীরু কাণ্ডজ্ঞান।
ঊর্ধ্ববাহু আজ রিক্তাকাশে
যৌবনযজ্ঞাগ্নি মোর যে-অনাম দেবতার আশে,
জানি সে-অচেনা
কোনও দিন আমার হবে না ;
তবুও নিশ্চয়
আমার উদ্যত অর্ঘ্য, প্রেয়সী, তোমার তরে নয়॥

১১ সেপ্টেম্বর ১৯২৯

পণ্ডশ্রম

অভ্যস্ত লজ্জার ছল, আচারের ব্যর্থ ব্যবধান
ভৈরব রভসে হানি, যে-প্রেরণা ফুরাল নিমেষে,
সীমাশূন্য অনন্তের ঘূর্ণামান, ক্ষুব্ধ নিরুদ্দেশে
আবার কখনও, প্রিয়ে, পাওয়া যাবে কি তার সন্ধান ?

সেই যে পাটল চাওয়া, সাঙ্গ লগ্নে বিস্ফারি নয়ান,
নির্বাক কাকুতিটুকু পণ্ডশ্রম অন্তিম আশ্লেষে,
অসম্পূর্ণ পরিচয় অসমাপ্ত দিবসের শেষে,
সে-সবের জন্য, জানি, স্মৃতির অমৃতে নেই স্থান॥

পুনর্মিলনের আশা ? সে কেবল প্রেমার্ত কল্পনা ;
সপ্তসিন্ধুপরপারে, অদর্শনে আমার বসতি ;
দুর্বল বুভুক্ষু দেহ ; প্রতিশ্রুতি দয়ার্দ্র বঞ্চনা ;
বসন্ত বার্ষিক পান্থ ; ফাল্গুনী সুলভ হেথা, সতী॥

আমার বিদেশী নাম বাধে তব অবাধ্য জিহ্বায় ;
বৃথা ও-স্মারক চিহ্ন, চিরতরে নিতেছি বিদায় ॥

৩০ জুন ১৯২৯

মূর্তিপূজা

মিলনার্ত বসন্তপ্রদোষে,
তোমার চরণতলে, নবাঙ্কুর তৃণাসনে ব'সে,
পুলকি পাইন্-বন অসম্ভব পণে,
বলিব না, "তুচ্ছ মানি ইন্দ্রের বৈভবও,
অন্তরের অন্তঃপুরে তব
পরিত্যক্ত স্থানটুকু দাও যদি মোরে ॥"

উৎকণ্ঠিত বিদায়ের উন্মন লগনে,
ছড়ায়ে শিথিল হস্তে, ক্ষণে ক্ষণে, পুষ্পিত প্রান্তরে
উন্মূলিত ক্রোকাসের দল,
চক্ষে বৃথা জল,
আমি কহিব না কভু, "জীবনসঙ্গিনী,
বিরহাশঙ্কায় তব নরকেরে আজ আমি চিনি,
প্রলয়ের পাই পূর্বাভাস।
হতবুদ্ধি পিপাসায় আমার আকাশ
অতঃপর শূন্য চক্রবালে
ত্রুবত্যয় মরুকুঞ্জ নিরখিবে দুর্মর খেয়ালে ॥"

কত বার, কত মধুমাসে,
কখনও প্রকৃত দুঃখে, কখনও বা কৃত্রিম হতাশে,
কভু অতিরঞ্জিত কথায়,
ফুটায়েছি তপ্ত রাগ পরম্পর প্রেয়সীর কানে
মধুপগুঞ্জনমত্ত মাধবীবিতানে।

জাগাতে চাহি না পুনরায়
সে-নাট্যের অভিনয়ে মুগ্ধ মরীচিকা
নীলাভ ধূসর চোখে তব ॥

বিদায়ের লগ্নে আজ নিঃসংকোচে কব,
"হে মোর ক্ষণিকা,
তোমার অরূপ স্মৃতি, সে নহে শাশ্বত ।
আগন্তুক শ্রাবণের বৈদ্যুতিক উল্লাসের মতো,
তীব্র প্রবর্তনা তব সাঙ্গ হোক সান্দ্র অন্ধকারে ;
অবেদ্য বিস্ময় তারে
ক'রে দিক অনির্বচনীয় ॥"

ইচ্ছা হলে আমারে ভুলিও,
ইচ্ছা হলে দিও
নিঃসঙ্গ সন্ধ্যায় তব মুহূর্তের নিষ্ক্রিয় মমতা ।
আর যদি পারো, তবে মনে রেখো এইটুকু কথা—
অপণ্য দ্রব্যের ভারে যবে মোর তরী
নিঃস্রোত জীবনপঙ্কে হয়েছিল নিতান্ত নিশ্চল,
তুমি কৃপা করি,
এনেছিলে আজন্মের সকল সম্বল
সে-জঞ্জাল কিনে নিয়ে যেতে ;
নিষ্কাম সংকেতে
তুমিই দেখায়েছিলে নিরুদ্দেশে আশ্রয়ের তীর
শান্তিস্নিবিড় ॥

সপ্তসিন্ধুপরপারে মর্মরিত নারিকেলবনে,
ফাল্গুনের আড়ম্বরশূন্য জাগরণে,
যেই চিরন্তনী
একদা জাগায়েছিল অলক্ষিত নূপুরের ধ্বনি
আমার শোণিতে ;
প্রমোদের বিহ্বল নিশীথে

যার নিমন্ত্রণলিপি কণ্ঠাশ্লেষে এনেছে ব্যবধি ;
বারংবার যে-নির্বাক, অমূর্ত দরদী,
দারুণ দুর্যোগ ভেদি, দুরাশার জলদর্চিশিখা
মেঘরন্ধ্রে দেখায়েছে মোরে ;
মোর জন্ম-জন্মান্তের সেই অনামিকা
ফেলেছে তোমার নীল নয়নের আয়ত সায়রে
আপনার প্রতিবিম্ব চপল খেলায় ॥

আজিকার অকপট গোধূলিবেলায়,
আমাদের জীবনের ঊষর সংগমে,
নমিলাম, প্রিয়তমে,
নমিলাম গর্বনত শিরে
কোমল হৃদয়ে তব অচিনের পদচিহ্নটিরে ॥

৮ মে ১৯২৯

মহাসত্য

অসম্ভব, প্রিয়তমে, অসম্ভব শাশ্বত স্মরণ ;
অসংগত চির প্রেম ; সংবরণ অসাধ্য, অন্যায় ;
বন্ধদ্বার অন্ধকারে প্রেতের সন্তপ্ত সঞ্চরণ
সাঙ্গ করে ভাগীরথী অকস্মাৎ বসন্তবন্যায় ॥

সে-মিলন অনবদ্য, এ-বিরহ অনির্বচনীয়
ধ্বংসসার স্বপ্নস্তূপে অচিরাৎ হারাবে স্বরূপ ;
আশা আজি প্রবঞ্চনা ; দিব না স্মারক অঙ্গুরীয় ;
ব্যবধি ব্যাপক জেনে অঙ্গীকার নির্বোধ বিদ্রূপ ॥

তবু রবে অন্তঃশীল স্বপ্রতিষ্ঠ চৈতন্যের তলে
হিতবুদ্ধিহন্তারক ক্ষণিকের এ-আত্মবিস্মৃতি ;

তোমারই বিমূর্ত প্রশ্ন জীবনের নিশীথ বিরলে
প্রমাণিবে মূল্যহীন আজন্মের সঞ্চিত সুকৃতি ॥

মৃত্যুর পাথেয় দিতে কানাকড়ি মিলিবে না যবে,
রূপান্ধ যুবার ভ্রান্তি সেই দিন মহাসত্য হবে ॥

১৩ আগস্ট ১৯২৯

পুনর্জন্ম

নিশীথের নির্জন আঁধারে
বারে বারে
শুনিলাম বিপাশার আদিম আহ্বান।
আতঙ্কে উৎকণ্ঠি মোর প্রাণ,
গৌরী কাপালিকা
দাঁড়াল সম্মুখে আসি, নরমেধ প্রলয়ের শিখা
প্রতিভাত করি তার রৌপ্য স্তনতটে।
মুখে রটে
নিবিদের মন্ত্র উচাটন,
তরল মাতনে ভরা ঘূর্ণ্যমান নীলিম নয়ন
হানে শিষ্ট সভ্যতার কঠিন সংহতি;
উদ্দাম প্রগতি
স্পষ্টতর বিমুখ কুন্তলে;
দলিত সুন্দর, শান্ত শিব পদতলে;
থর থরে মুকুরিত সৃজনের প্রথম ভাস্কর;
তার ইষ্ট দেবতাও পুরাণ বর্বর,
যার তৃষ্ণা মিটাবার তরে
যুগে যুগান্তরে
সন্ধানে সে তপ্তরক্ত বলি ॥

মোর কণ্ঠনলী
বদ্ধ যেন অগোচর যূপে ;
মৃত্যুর প্রবেশপথ প্রতি রোমকূপে,
হৃদয়ের মহাশূন্য কম্পমান নির্বাণের শীতে ;
নিখিল নাস্তিতে
মৌনের বিশ্রম্ভালাপ পশউয়ী বিভীষিকা-সনে ;
অসীম গগনে
উধাও নক্ষত্রপুঞ্জ মুমূর্ষুর সংক্রাম এড়ায়।
শোনা যায়,
অনন্তের সীমান্তরে ব'সে,
উন্মন আলসে
নিঙাড়ে আয়ুর সার ত্রিকালের স্বামী ;
নিমীলিত নেত্রে দেখি আমি
মহাকালহস্তচ্যুত, অপ্রচুর অন্তিম নিমেষ
ক্ষণে ক্ষণে হয় নিরুদ্দেশ
প্রতিধ্বনিপরিপূর্ণ বিস্মৃতির অতল পাতালে ॥

হেন কালে
অমৃতের প্রতিশ্রুতি নিয়ে,
তুমি এলে অনাহূত প্রেতস্তব্ধ গৃহে,
চির মোহ-ময়,
তুচ্ছ, প্রয়োজনহীন বাক্য-কতিপয়
চুম্বনের অবকাশে মৃদু স্বরে উচ্চারণ করি,
দিলে ভরি
নিরিক্ত অন্তরে মোর আকাঙ্ক্ষার সহজ বিস্ময়।
অসংগত সেই অঙ্গীকার,
বুঝো নাই, অনভিজ্ঞা, হয়তো বা অভিপ্রায় তার ;
সম্ভবত দেখো নাই ভাবি
মিটিবে না সর্বস্বান্ত যৌবনের দাবি
ক্ষণিকের আত্মবলিদানে।

তবু আচম্বিতে তব অগাধ নয়ানে
তটের শাসন ঘুচে, রুদ্রমূর্তি বিপাশার জল
ভুলে গেল প্রভু হিংসা, হল সুনির্মল ;
তব ক্ষুদ্র প্রেমের উপরে
নিশ্চিন্তে নির্ভর পেল অনশ্বর মুহূর্তের তরে
তুলাসাম্যহৃত বিশ্ব প্রলয়ের পথে ॥

যে-দিন জগতে
আমার আপন ব'লে নাহি ছিল কেহ ;
পথপ্রান্তে পরিহরি আমার অমূল্য বরদেহ
আগন্তুক মরণের দক্ষিণা-স্বরূপে,
সহযাত্রী সবে চুপে চুপে
আত্মরক্ষা করেছিল দৃষ্টির আড়ালে,
সে-দিন, সাবিত্রীসম, পাশে এসে, একেলা দাঁড়ালে
নিঃশঙ্কিনী
তুমি, বিদেশিনী।
সে-সেবার নেই প্রতিদান ;
প্রতিশ্রুত একনিষ্ঠা তার অপমান ॥

শুধু যবে অন্তিম নিশীথে
চারিভিতে
ফিরিবে বীভৎস নৃত্যে আজন্মের নিষ্ফলতা যত,
দ্বারের বাহিরে
ঝঞ্ঝার গর্জন-মত্ত অখণ্ড তিমিরে
বৈতরণী পুনর্বার ডাকিবে আমারে অবিরত,
সে-দিন তোমার নাম নিঃশব্দে উচ্চারি,
লব কাড়ি
মৃত্যুর বিজয় হতে তুষ্টির প্রসাদ।

সীমাশূন্য শূন্যতার মাঝে
সে-দিন শুনিব পুন ক্ষীণ স্বরে বাজে
আজিকার মূল্যহীন কয়টি কথার অনুনাদ ॥

১২ অক্টোবর ১৯২৯

ভবিতব্য

শিপ্রার অপর তটে নেমে আসে সুদীর্ঘ রজনী ;
শীর্ণ তরুবীথিকারে আত্মসাৎ করে অন্ধকার ;
বিদায়, বিদায়, তবে চিরতরে বিদায়, সজনী ;
সমাপ্ত সুকৃতি আজি, স্বর্গচ্যুতি আসন্ন আমার ॥

কী ব'লে, অদৃশ্য হব ? রেখে যাব কোন্ প্রতিশ্রুতি ?
মাগিব কী স্মৃতিচিহ্ন ? বিনিময় করিব কী আশা ?
অন্তরের অন্তরীক্ষে গুমরিছে মর্ত্যের আকৃতি—
বিনাশ, নৈরাশ, অশ্রু, নিষ্ফলতা, কর্তব্য, পিপাসা ॥

সে-পথেরই যাত্রী তুমি, শত পান্থ গেছে বিস্মরণে,
প্রাগ্রসর পদরেখা যার 'পরে আঁকি অবিরত ;
তুমিও ঘুচালে শ্রান্তি ধ্বংসশেষ এ-চিত্তভবনে,
জ্বালি ধূমাঙ্কিত দীপ নিশাক্রান্ত উদ্বাস্তুর মতো ॥

তুমিও উধাও হবে, সঙ্গে ল'য়ে অন্তিম সান্ত্বনা—
স্মৃতির সমষ্টিখানি অবিচ্ছিন্ন, অনির্বচনীয় ;
যাবে স্তূপীকৃত করি মূল্যহীন ভগ্ন আবর্জনা
পরিত্যক্ত হৃদয়ের কোণে কোণে আঁধারে তুমিও ॥

ভেবো না, ভেবো না, সখী ; স্বপ্নদুঃস্থ দীর্ঘ রাত্রি-শেষে
বসন্ত অন্তরে তব আরম্ভিবে পুন চতুরালি ;

নবীন ফাল্গুনী আসি হানা দিবে রুদ্ধ হৃদয়দেশে ;
ফলিবে মানসক্ষেত্রে বর্ষে বর্ষে সোনার চৈতালী ॥

ক্ষণিক ইন্দ্রত্ব লভি অনায়াস তপস্যার ফলে,
তোমার উরসস্বর্গে বিরাজিবে বহু মর্ত্যচর ;
যে-হস্ত নিবদ্ধ এবে মোর ভুজে প্রাণপণ বলে,
রচিবে বরণমালা বারংবার সে-নিষ্কম্প্র কর ॥

আজিকে আমার চিত্তে পুঞ্জিত যে-উদ্বিগ্ন বিষাদ,
ভবিতব্যভারাতুর, স্তব্ধ, মূক মেঘের সমান,
কালবৈশাখীর ঝড়ে টুটিবে সে-সংহতির বাঁধ ;
চপলা দরশ দিবে ; মুক্ত হবে অবরুদ্ধ দান ॥

তোমারে ভুলিব আমি, তুমি মোরে ভুলিবে নিশ্চয় ;
মদনের চিতানলে অনঙ্গের হবে আবির্ভাব ;
হরিবে অসংখ্য অলি যৌবনের অমৃতসঞ্চয় ;
সর্বস্বান্ত মর্মে শুধু প'ড়ে রবে অবেদ্য অভাব ॥

১ ডিসেম্বর ১৯২৯

বিকলতা

শেফালী অঙ্গুলি তব গণ্ডে মম বিচরে কৌতুকে ;
সুশীতল মুক্তিস্নানে নিমন্ত্রণ করে নিষ্পলক,
অকূল, পিঙ্গল আঁখি ; অসংবৃত, কপিশ অলক
চুম্বন বিথারি যায় লঘু স্পর্শে আমার চিবুকে ;

কম্প্র কুসুমাস্ত্র যেন, অধরের অঙ্কিত কার্মুকে
বিরল গুঞ্জনধ্বনি টংকারিছে, মথি কল্পলোক ;

বিলাসবিহ্বল দেহে উপেক্ষিত লজ্জায় ঝলক,
যূথীগন্ধসনে মিশে, রোমাঞ্চ বিস্তারে মোর বুকে ॥

কক্ষের সংযত সজ্জা, হেমন্তের পক্ক পত্র-সম,
আস্বচ্ছ বসন তব, দরদের বলি শুভ্র ভালে,
ভিন্ন ভিন্ন অবয়ব মনে আছে ; শুধু নিরুপম
অখণ্ড আননখানি সীমাশূন্য শূন্যে যে লুকালে ॥

তাই আজি তব স্মৃতি, মগ্নতরী জঞ্জালের মতো,
সহে না আশার ভার, করে, হায়, বিদ্রূপে বিব্রত ॥

১৪ জুন ১৯২৯

অনুষঙ্গ

তোমারে যে কেন বাসি ভালো,
সে-সত্য জানার আগে মিলনের মুহূর্ত ফুরাল,
শুরু হল দীর্ঘায়িত বিচ্ছেদের রাতি।
হায়, স্বপ্নসাথী,
শুধায়ো না। সে-প্রথম প্রণয়কাহিনী।
সে-দিন বিশেষ ক'রে একমাত্র তোমারে চাহিনি
সর্বনষ্ট মর্ত্যে বা ত্রিদিবে।
সে-দিন নিরুদ্ধ হিয়া জানিত না কারে সমর্পিবে
বিশৃঙ্খল যৌবনের দুর্বহ সঞ্চয়।
সে-দান তো স্মরণীয় নয়,
সে যে উপেক্ষার দান দৈবাগত দিনে ॥

শুধু জানি
তব পরিগ্রহণের বাণী

অবেক্ত মর্মরধ্বনি ভরেছিল বিজন বিপিনে ;
অকৃপণ করে
বিধাতা ছড়ায়েছিল স্পর্শমণি অম্বরে অম্বরে ;
ক্ষণে ক্ষণে
নিশীথ পবনে
অজানা পুষ্পের গন্ধ লেগেছিল অনির্বচনীয় ;
দৃষ্টি অতীন্দ্রিয়
দেখেছিল আঁধারের প্রভাস্বর পটে
অধরার চিত্রল লিখন ;
উৎকর্ণ চৈতন্য মম শুনেছিল সপ্তাশ্ব শকটে
সৃষ্টিধর করে সঞ্চরণ,
নব জীবনের বীজ ব্যোমের পরিধি-'পরে বুনি ॥

আরও জানি, হে মোর ফাল্গুনী,
তুমি হেথা নাই ব'লে,
কিরাতের রুদ্র ক্ষুধা বাধা আর পায় না ভূতলে
নন্দনের প্রতিশ্রুতি মম
ফণিমনসায় ঘেরা উপহাস্য মরুমায়া-সম।
তুমি সঙ্গে নাই,
বিপন্ন যাত্রীরে আজ ভগবান পাসরিল তাই ॥

ভুলি নাই তুমি তুচ্ছ কত।
তবু তুমি এসেছিলে আদিম অণুর মতো
সৃষ্টির সানন্দ নৃত্যে আমার অসীম শূন্যতায়।
তাই মোর যৌবনের রাখিপূর্ণিমায়
ক্ষুদ্রতম অভাব তোমার
ফিরায়ে এনেছে আজি জন্ম-জন্মকার
নির্বিকল্প প্রলয়ের ক্ষতি ;
আচম্বিতে
ঘুচে গেছে ব্রহ্মাণ্ডের প্রকাণ্ড ছবিতে
স্বৈরবৃত্ত রেখার সংগতি ॥

জানি না একদা কেন ভালোবেসেছিলাম তোমারে।
শুধু জানি শিখালে মদির অন্ধকারে
অমৃত মর্ত্যেরই দান, স্বল্পপ্রাণ প্রমোদের কণা
আহরি, জন্মান্ধ করে ভূমাবিরচনা।
জানি, আরও জানি
তোমার ক্ষণিক প্রেমই অস্তিমের অব্যয় পারানি ;
উপরন্তু ধরা,
তোমার উপমা ব'লে, মোর চক্ষে এখনও সুন্দরা ॥

১৪ এপ্রিল ১৯৩০

মহাশ্বেতা

মনে হয়েছিল বুঝি উদ্‌ভ্রান্ত হৃদয়
অনুভব করিবে না কভু আর সহজ বিস্ময় ;
বিয়োগের অমিত অভাবে
সুন্দরের আবির্ভাব কেবলই হারাবে ॥

তাই যবে বসন্তের উচ্ছৃঙ্খল দিনে,
গতায়ু বরষে,
সহসা উঠিল জেগে নিম্বের বিপিনে
বিহ্বল চন্দনগন্ধ মলয়ের কবোষ্ণ পরশে ;
ধৈর্যহীন অপব্যয়ে বৃথা পুষ্পাঞ্জলি
বসুন্ধরা নিজেরে অর্পিল ;
বভ্রু অলি
তালে বেঁধে দিল
সৃষ্টির স্বয়ম্ভূ সামগান ;
উৎকণ্ঠিত প্রজাপতি করিল সন্ধান
অন্তর্বরা প্রোষিতারে, বিরহীর চিত্রলিপি ল'য়ে ;

কে পঞ্চাশ রজনীর কনক বলয়ে
উদ্বাহসিন্দুরবিন্দু গোধূলিলগনে ;
সে-দিনের দক্ষযজ্ঞে, সার্বভৌম মিলনপার্বণে
পড়িল না তাই মোর ডাক ॥

পুনর্বার এসেছে বৈশাখ ;
গেছে মুছি
প্রতীচীর পাণ্ডু গণ্ডে জীবনের শেষ রক্ত রুচি।
আজি তবে কেন
বাজায় মোহনবেণু শীর্ণ কণ্ঠে কালের রাখাল ?
অতিক্রান্ত সন্ধিলগ্ন, ভ্রষ্টপাল
কামধেনু যেন,
পৃথিবীর অন্য প্রান্ত থেকে ঊর্ধ্বশ্বাসে
স্মরণের গোষ্ঠে ফিরে আসে ॥

এক দিন
পুলকি অপরিচিত নদীর পুলিন
তাপতাম্র এমনই নিদাঘে,
যে-অপূর্ব জপমন্ত্র কানে মোর নিবিড় সোহাগে
দিয়েছিল সুন্দরের দূতী,
ভ'রে ওঠে বর্তমান নৈঃসঙ্গ্যের শ্রুতি
সে-প্রণাদ অনুলাপে ;
বক্ষে কাঁপে
কী এক বচনাতীত, তীব্র সংবেদন ;
সপ্তসিন্ধুপরপারে বিচঞ্চল নারিকেলবন
মৃদুল মর্মরে,
সহসা সম্পূর্ণ করে
অসমাপ্ত পরিচয় তার ॥

বারংবার
নির্নিমেষ নেত্রে চেয়ে দেখি,
সমস্ত ভুবন জুড়ে, আবার এলে কি,
ক্ষণিকা পরমা ?
প্রতিবেশী পত্রে, পুষ্পে নেহারি যে তোমারই উপমা,
সে-দিনের ভুলে-যাওয়া তুচ্ছ দানগুলি
ভারাক্রান্ত করি তুলে তপোরিক্ত বৈশাখের ঝুলি।
ঘুচে যায় ভয় ;
জানি, জানি বিধাতা নির্দয়
কোনও দিন পারিবে না অর্গলিতে সে-স্বর্গের দ্বার,
ইন্দ্রত্বের ধ্রুব অধিকার
তোমার প্রেমের স্মৃতি রচিয়াছে মোর লাগি যেথা,
অয়ি মহাশ্বেতা ॥

২১ এপ্রিল ১৯৩০

সঞ্চয়

আজি পড়ে মনে
মুখর নদীর তটে, মর্মরিত দেওদারবনে,
কোনও এক নিদাঘের জনশূন্য দিনে
সদ্যস্নাত দেহ রাখি তৃণে,
বলেছিলে অকপটে, হে লীলাসঙ্গিনী,
আপনার অতীত কাহিনী।
উপেক্ষি মিনতি,
হানি মোর চুম্বনে বিরতি,
বলেছিলে সে-নিকুঞ্জে কী মহার্ঘ দান
পেয়েছে তোমার কাছে মোর পূর্বে কত ভাগ্যবান ॥

তার পরে বিশ্বস্ত নয়ানে
চেয়েছিলে মুখপানে ; বেজেছিল অকস্মাৎ কানে,
অধরার আকৃতির মতো,
তোমার সংযমগত
প্রিয়সম্বোধন।
তবু মোর অভিমানী মন,
মার্জনায় অপারগ, ভেবেছিল ভবিষ্যতে নাই
কৃতজ্ঞ স্বীকৃতি কিংবা স্মৃতির বালাই,
চেয়েছিল প্রমাণিতে নিদারুণ মোর দস্যুতার
নির্বিকার
ক্ষেত্র-মাত্র তুমি,—
কীর্তির সমাধিস্তূপ, স্বত্বশূন্য, মুক্ত মরুভূমি,
যার 'পরে
অবৈধ প্রবৃত্তি মোর অবাধে বিচরে
অবলুপ্ত ধন-রত্ন-আশে ;
রিক্ত যৌবনের পূর্তি ঘটায়ে প্রবাসে,
ঘরে ফিরে, যথারুচি অপচয় করিব সে-ধন॥

বুঝিনি তখন
আত্মপ্রসাদের শত্রু, সেই ইতিহাস
অনাগত সর্বনাশে হবে মোর অনন্য আশ্বাস।
তোমার নয়নে
অতীতের ছায়া অবলোকি,
শুধায়েছিলাম তাই, ঈর্ষায় কণ্টকি,
"কেন রবে মনে ?
আমি নিমেষের সখা, শুধু তব চাঞ্চল্যের সাথী,
চ'লে যাব স্বল্পপ্রাণ নিদাঘের শেষে
নিরুদ্দেশ থেকে নিরুদ্দেশে।
স্বপ্নান্ত প্রেমের কলি জাগাল যে-রবির প্রভাতী,
প্রথমে যে-অলি

উচ্ছল হৃদয়সুধা ল'য়ে, গেল চলি,
স্নান তব তাদের স্মরণে।
লাঞ্ছিত ভ্রমর,
মলয়ের ভ্রষ্ট অনুচর,
অকারণে
মধুরিক্ত কমলেরে করিলাম আমি প্রদক্ষিণ॥"

বিগত সে-দিন ;
সে-মৎসর অহংকার চিহ্নহীন অক্ষম ধিক্কারে ;
রুদ্র কালবৈশাখীর প্রহারে প্রহারে
অপর্ণ সে-উপবন, যার মাঝে নষ্টনীড় স্মৃতি
ঘুরে মরে নিতি,
আর মানে নিরুপায়ে জীবনের পরম সঞ্চয়
নিক্রোধ নয়নে তব ব্যথিত বিস্ময়॥

১০ ডিসেম্বর ১৯২৯

প্রলাপ

জানি, জানি
উপস্থিত বেদনা ও গ্লানি
আমারই প্রবীণ চক্ষে লাগিবে যে মূঢ়তার মতো
এক দিন আশু ভবিষ্যতে।
বিদায়ের পথে
যে-মৌনী শোকের স্পর্ধা করেছে ব্যাহত
দরদীর বাঙ্ময় সান্ত্বনা,
যে-রূঢ় যন্ত্রণা,
উপাড়ি মৃন্ময় মূল, এনেছে আমারে
নৈরাশ্যের পারে,

সে-সবার মহিমা বিনাশি,
মোর রিক্ত হাসি
শোনা যাবে অচিরাৎ আগামী উৎসবে।
সে-দিন মনের মধ্যে সংশয়ের লেশ নাহি রবে :
জিজ্ঞাসুরে বলিব নিশ্চয়
আজিকার অভিজ্ঞতা তুচ্ছ অতিশয়,
তারুণ্যের আতিশয্য, অমৃতের স্পর্শ তাতে নাই ॥

কভু যদি সত্য হয় তাই,
তোমার অমর বরে, হে বিধাতা, তবে কাজ নাই।
চাহি না থাকিতে বর্তমান
নির্বিকার পটে আঁকা নিরালোক দীপের সমান ;
প্রণয়ের প্রহসনে নায়কের পদ
যে-দুর্মদ
আত্মার নিয়োগে,
থাকুক সে বিপ্রলব্ধ অনন্ত বিয়োগে।
ছাড়িলাম অমৃতের দাবি :
ফিরে নাও প্রতিশ্রুত নন্দনের চাবি।
বজ্রবহ্নি, সংক্ষিপ্ত সংহারে,
জাগাক অসহ্য জ্বালা পুনবার বিক্ষুব্ধ আঁধারে।
কৈবল্যের পরিবর্তে করো প্রত্যর্পণ
নশ্বর আশ্লেষে তার নিমেষের বিশ্ববিস্মরণ ;
দিতে চাও, দাও, ভগবান,
সে-চপল চুম্বনের অখণ্ড নির্বাণ :
শুধু এক বার,
ধ্বংসি মুহূর্তের তরে সূক্ষ্ম তর্ক, কুটিল বিচার,
আনো মোরে মুখামুখি নির্বাক নিশাতে
ক্ষীণপ্রাণ পার্থিবার বিশ্বস্তব প্রণয়ের সাথে ॥

ভয় নাই, ওরে ভয় নাই,
অমরত্ব মিথ্যা কথা, মৃত্যুঞ্জয় বিজ্ঞের বড়াই

অক্ষয় প্রতির মধ্যে রবে না সঞ্চিত।
আসে মৃত্যু ঝঞ্ঝাওবাঞ্ছিত,
আসে মৃত্যু নীলকণ্ঠ, আসে মৃত্যু রুদ্র মহাকাল,
নিষ্পেষিত মানুষের শোণিতে গুলাল
চরণে অলক্তরেখা আঁকি।
হানো, হে পিনাকী,
হানো তবে তব বিষবাণ ;
গলিত পরান
হোক লয় তিলে তিলে, যাক মিশে নিমেষে নিমেষে
স্মৃতিশূন্য বিলয়ের শুদ্ধ নিরুদ্দেশে ॥

শুধু যেন রহে অন্তঃশীলা
তোমার অতনুলীলা
মোর ব্যর্থ প্রতীক্ষার অবাধ প্রান্তরে,
ক্ষুধাভরে
যেন না ভরাই বারংবার
বিরহসন্তপ্ত এই শূন্যতা আমার
নব নব ঝঞ্ঝারে আহ্বানি ;
নাস্তিক বুদ্ধির বশে কোনও দিন যেন নাহি মানি,
হে অন্তরতমা,
তুমি ভ্রান্তি যৌবনের, নও নিত্য সৃষ্টির সুষমা ॥

১৮ এপ্রিল ১৯৫০

উদ্‌ভ্রান্তি

সে-দিনে বৈশাখ
ধরেছিল ধ্বংসের পিনাক ;
জমেছিল সর্বনাশ অনাথ অম্বরে ;

তার পরে
ঘটেছিল কন্দ্র তাপে অবরোহী আলোর বিকার ;
শোষণে নিঃসার
সূর্য, শুষ্ক জবা-সম, উন্মত্ত কালীর বক্ষ হতে
খসেছিল আঁধি-ঢাকা প্রলয়ের পথে।
সঙ্গে সঙ্গে মহামৌনে কোটিকণ্ঠ নগরের শ্বাস
থেমেছিল ; অহেতু সন্ত্রাস
নেমেছিল মোর প্রাণে ; হয়েছিল মনে
অনাত্মীয় পরিবেশ ভাষাহীন প্রেতের ক্রন্দনে
উঠিতেছে গুমরি গুমরি।
ছিঁড়ে দড়াদড়ি,
ভয়ার্ত অশ্বের মতো, ছুটেছিল বিলুপ্তির পানে
আমার উন্মত্ত আত্মা মুমূর্ষার টানে ॥

অকস্মাৎ
বাধা পেল অব্যর্থ সম্পাত :
তোমার আমার কক্ষ, সীমাবদ্ধ স্ব স্ব দেশ-কালে,
মিলে গেল ক্ষণতরে দৈবের খেয়ালে।
নিরালম্ব শূন্যে আচম্বিতে
উপজিল স্বপ্নলোক : নক্ষত্রসংগীতে
শতধাবিভক্ত বিশ্ব পাসরিল বিরোধ, বিবাদ ;
আমাদেরই চিত্তের প্রসাদ
সঞ্চরিল নগরীর বিভীষিকাবিক্ষুব্ধ মূর্ছায়—
জাগিল সে, প্রিয়স্পর্শে দয়িতার প্রায়,
ওষ্ঠে অনিশ্চিত হাসি, আঁখিকোণে সন্দিগ্ধ মির্মির ;
বিতরিল মন্দারের পরাগ সমীর ;
চাহিলাম ঊর্ধ্বমুখে,
দেখিলাম অন্ধ তম ঝলমল স্বর্গের কৌতুকে :
তোমার নশ্বর কটি কথা
শুনাল সে-দিন মোরে অমৃতের পরম বারতা ॥

সংশয় জেগেছে আজ বুকে :
আবার সম্মুখে
পুঞ্জিত হয়েছে আঁধা স্তরে স্তরে, স্তবকে স্তবকে :
নিরালোকে
অন্তর্হিত পুন ধ্রুবতারা ,
সহচর কারা,
কেন্দ্রস্থলে সংকুচিত আত্মার ধিক্কার ।
বারংবার
আতুর নয়ন তাই করে অন্বেষণ
কুটিল অমার মধ্যে তব বক্র কেশের মতন,
অবাধ্য, উৎক্ষিপ্ত বহ্নি-সম :
তাই নিরাশ্রয় স্মৃতি খুঁজে মরে মরুর বাতাসে
অনুপম
সে-তনুর রতিপরিমল ,
অক্ষম হতাশে
আবার দেখিতে চাই দরদের বলি সে-ললাটে ॥

প্রযত্ন নিষ্ফল ।
বৈনাশিক বুদ্ধি হানে করাঘাত ভঙ্গুর কবাটে ;
সমস্বরে শূন্যবাদ দেখায় প্রমাণ
আকস্মিক সে-বিস্ময় আপতিক অধৈর্যের দান,
নাই তাতে তিলার্ধ নির্দেশ –
অমর্ত্যের উপাদানে বিরচিত নয় সে-আবেশ :
অলকানন্দার আগমনী
শুনিনি সে-দিন কানে ; গর্জেছিল আমারই ধমনী
বাঁধ-ভাঙা রিরংসার আবিল বন্যায় ;
মরুবাসী বর্বরের প্রায়,
অনভ্যস্ত সুসময়ে লজ্জাবস্ত্র কাড়ি,
কুচকলি নিঙাড়ি নিঙাড়ি,
মিটায়েছিলাম তৃষ্ণা, সুধা ভেবে, পর্যুষিত ক্লেদে ।

নেশা আজ কেটেছে নির্বেদে :
বিবিক্তিতে তাই
মুমূর্ষার প্রতিকার নাই ॥

সে-দিনের সেই ইন্দ্রজাল,
সে আর কিছুই নয়, শুধু গণ্ডে গ্রীষ্মের গুলাল,
অসতর্ক ভুরুভঙ্গে যদৃচ্ছ সুষমা ?
তাই, নিরুপমা,
অসংলগ্ন স্মরণে কি ফিরে মোর অসংবদ্ধ গান,
প্রবাসে অজ্ঞাতলক্ষ্য পান্থের সমান ?

৪ মার্চ ১৯৩১

নাম

চাই, চাই, আজও চাই তোমারে কেবলই ।
আজও বলি,
জনশূন্যতার কানে রুদ্ধ কণ্ঠে বলি, আজও বলি—
অভাবে তোমার
অসহ্য অধুনা মোর, ভবিষ্যৎ বন্ধ অন্ধকার,
কাম্য শুধু স্থবির মরণ ।
নিরাশ অসীমে আজও নিরপেক্ষ তব আকর্ষণ
লক্ষ্যহীন কক্ষে মোরে বন্দী ক'রে রেখেছে, প্রেয়সী
গতি-অবসন্ন চোখে উঠিছে বিকশি
অতীতের প্রতিভাস জ্যোতিষ্কের নিঃসার নির্মোকে ।
আমার জাগর স্বপ্নলোকে
একমাত্র সত্তা তুমি, সত্য শুধু তোমারই স্মরণ ॥

তবু মোর মন
চাহে নাই মোহের আশ্রয় ।

জানি তুমি মরীচিকা, তোমাসনে প্রাণবিনিময়
কোনও দিন হবে না আমার।
আমার পাতালমুখী বসুধার ভার,
জানি, কেহ পারিবে না ভাগ ক'রে নিতে ;
আমারে নিঃশেষে পিষে, মিশে যাবে নিশ্চিহ্ন নাস্তিতে
এক দিন স্বরচিত এ-পৃথিবী মম ॥

জানি ব্যর্থ, ব্যর্থ সেই সন্ধ্যা নিরুপম
যবে মোর আননে নেহারি,
অগাধ নয়নে তব কলদা স্বাতির পুণ্য বারি
উঠেছিল সহসা উচ্ছলি।
জানি সেই বনপথে, চিরাভ্যস্ত প্রেমনিবেদনে
আপনারে ছলি,
পশিনি তোমার মর্মে, নিজের গহনে
জমায়েছিলাম শুধু মিথ্যার জঞ্জাল।
জানি কত তরুণীর গাল
অমনই অধৈর্যভরে শত বার দিয়েছি রাঙায়ে ;
অন্তপূর্ব পথিকার পায়ে
বজ্রাহত অশোকেরে অলজ্জায় করেছি বিনত
ক্ষণিক পুষ্পের লোভে। ক্রমাগত
তাদের পদাঙ্ক মুছে গেছে রৌদ্রে, ধারাপাতে, ঝড়ে,
যুগান্তরে
তোমার স্মৃতিও, জানি, সেই মতো হারাবে ধুলায় ॥

তবু চায়, প্রাণ মোর তোমারেই চায়।
তবু আজ প্রেতপূর্ণ ঘরে
অদম্য উদ্বেগ মোর অব্যক্তেরে অমর্যাদা করে ;
অনন্ত ক্ষতির সংজ্ঞা জপে তব পরাক্রান্ত নাম—
নাম—শুধু নাম—শুধু নাম ॥

১৫ মে ১৯৩২

জিজ্ঞাসা

দিলেম বিমুক্ত ক'রে শিষ্টপুষ্প নিকুঞ্জের দ্বার,
অমোঘ প্রয়াণে তার রাখিব না মিনতির বাধা ;
কব না উদাস কণ্ঠে জীবনের যথার্থ সমাধা
যৌবনমধ্যাহ্নে আজি অকাতর বিস্মরণে তার ।

বার্ষিক প্রতিজ্ঞা তার ধ্রুবতার মরীচিকা আঁকে
বিচ্ছেদবিধুর স্বপ্নে পরস্পর যাত্রীর নয়ানে ;
জানি অলক্ষিত রাতে, শ্লথনীবি, কম্প্র আত্মদানে,
দেয়নি সে মোরে অর্ঘ্য, খুঁজেছিল বসন্তসখাকে ।

তবুও জিজ্ঞাসা জাগে, নিরুত্তর শূন্যেরে শুধাই
যে-অবেদ্য অভিজ্ঞান, চমৎকৃত যে-অনুকম্পন
বুলাল অমৃতযোগে চারি চক্ষে পরম চেতন,
সে কি মাত্র উপপাত, মূলে তার কোনও অর্থ নাই ?

সে-জাড্য ছিল কি শুধু ফাল্গুনের অত্যুগ্র মাতনে,
অভিরাম গ্রীবাভঙ্গে, উরোজের অনবগুণ্ঠনে ?

২১ জানুয়ারি ১৯৩১

সমাপ্তি

ভুলেছ কি তবে ?
আগন্তুক বিরহের উদ্‌ভ্রান্ত গৌরবে
দিয়েছিলে যেই অঙ্গীকার,
একটি অক্ষরও তার
কালের কবল হতে পারোনি কি রাখিতে সক্রিয়া,
হায়, মোর অতিক্রান্ত বসন্তের প্রিয়া ?

নাই মনে
বিদায়ের পথপ্রান্তে অন্তহীন অন্তিম চুম্বনে
আমার স্বতন্ত্র সত্তা চেয়েছিলে স্বায়ত্তে আনিতে
হেমন্তের জঙ্গম নিশীথে ?
নিবিড় চোখের মৌনে দুঃসহ মিনতি
করেছিল দ্বিধায় মন্থর
আসমাপ্ত মুহূর্তের ঊর্ধ্বশ্বাস গতি।
ক্ষীয়মাণ তব কণ্ঠস্বর,
ব্যাপক বিচ্ছেদে হানি প্রগল্‌ভ ঘোষণা,
বলেছিল, কভু ভুলিব না ॥

আজি যদি বসন্তের যবনবাহিনী
লণ্ড ভণ্ড ক'রে থাকে প্রস্তরিত সে-পুরাকাহিনী
অরক্ষিত অন্তরে তোমার ;
বিশ্ববাসনার
অধীর মদির ঘ্রাণ বিকশিত লাইলাক্‌-বাসে,
অন্বেষি অদৃশ্য ছিদ্র, যদি ছুটে আসে
শোকস্তব্ধ সমাধিমন্দিরে ;
রাত্রির গভীরে
আনে যদি চক্রী সমীরণ
নিরতীত নৈরাজ্যের রূঢ় নিমন্ত্রণ
রাজভক্ত নিবৃত্তির দ্বারে ;
তোমার অক্ষম হিয়া নিরুদ্দিষ্ট প্রণয়ের ভারে
প্রথম দস্যুর পদে যদি লুটে পড়ে,
তাই তবে সিদ্ধ হোক ; অপ্রাকৃত নিষ্ঠার নিগড়ে
তোমার দাক্ষিণ্য যেন বিষায়ে না উঠে,
ধর্মভ্রষ্ট অঙ্গ-সম, আত্মগত উগ্র কালকূটে ॥

করিলাম স্বত পরিহার
কপোলকল্পিত দাবি, বৃথা অধিকার ;

আমার প্রলাপ,
পঙ্গু ঈর্ষা, ব্যর্থ অভিশাপ
ও-তন্ময় ভোগাতীত ঐশ্বর্যের 'পরে,
সন্তপ্ত যক্ষের মতো, জাগিবে না যুগে যুগান্তরে।
যেও সবই ভুলে ;
চিত্ত হতে ফেলে দিও তুলে
প্রাণহীন প্রতিজ্ঞার অন্তর্ভৌম মূল।
অবসিত দুঃস্বপ্নের ভুল
জাগ্রত হৃদয় হতে যেন খ'সে যায়,
মিলনের সমারোহে প্রোষিতার জীর্ণ বস্ত্র-প্রায়॥

শুধু যবে গোধূলিলগনে
এ-বসন্তে পুনর্বার নব সখা-সনে
উপনীত হবে নদীতীরে :
চক্ষে অকারণ নীর, সুখশ্রান্তি শায়িত শরীরে,
আবার দেখিবে চাহি রাত্রি দেয় জ্বালি,
দিনের স্ফুলিঙ্গ-যোগে, স্বর্গদ্বারে তারার দীপালী,
তখন পারো তো মনে কোরো ক্ষণতরে
বিগত বৎসরে,
এই পীঠে, এমনই প্রদোষে,
বিপন্ন পথিক এক, পদপ্রান্তে ব'সে,
তোমাতে জাগায়েছিল শাশ্বতীরে অকাল বোধনে।
কিন্তু যদি লজ্জা পাও সে-কথাস্মরণে,
নিঃসংকোচে তবে
নাম সুদ্ধ ভুলে যেও, মেনে নেব বিলুপ্তি নীরবে॥

২০ মে ১৯৩১

দৈন্য

নিরালোক, স্তব্ধশোক, আয়ত নয়ানে
চেও না, চেও না মুখপানে ;
দ্বিধাকম্প্র স্বরে
বোলো না, বোলো না মোরে
এ-সর্বনাশের দায় কেবলই তোমার ;
বারংবার
কম্পিত কলুষ-নত শিরে
এনো না, এনো না ডেকে বিধির ধর্মিষ্ঠ অশনিরে,
ভেবো না, ভেবো না
মোর অন্ধ দুরাশারে সংহারিল তোমার বঞ্চনা ;
জানায়ো না অনুতাপ আর অকারণে ॥

আমি তো করিনি কভু মনে,
কখনও করিনি মনে প্রভুত্বের উন্মাত্র প্রমাদে,
রাগরিক্ত চিত্তপটে তব
অক্ষয় রেখায় আমি দীপ্র হয়ে রব ;
মিলনের তন্ময় প্রসাদে
ভুলি নাই দুর্নিবার বিকারের কথা,
মানিনি ভঙ্গুর ভবে নিতান্ত সুলভ অমরতা ॥

আমার অক্ষম বুদ্ধি দিবস-রজনী
শুনেছে অন্তবপথে বিপ্লবের নিত্য পদধ্বনি ;
জানে আপনার দৈন্য। তাই ভোরে নির্বাক ধিক্কারে
বিপ্রলব্ধ হৃদয়ের দাম্ভিক বিলাপ ;
তাই মোর উদ্বাস্তু সন্তাপ
পায় না প্রতিষ্ঠা আজ আত্মম্ভরি অসূয়ার দ্বারে,
তাই মোর প্রাণ
স্মৃতিশূন্য অন্ধকারে খুঁজে মরে নিশ্চিহ্ন নির্বাণ ॥

১০ মার্চ ১৯৩১

ধিক্কার

ধিক্কারে বিষায়ে ওঠে মন
যখনই স্মরণ
নিরুদ্দিষ্ট চংক্রমণে ফিরে সে-তিথিতে
যবে তব করপুটে মোর হিয়া পেরেছিল দিতে,
শ্রেষ্ঠ ভিক্ষা মানি,
সর্বশেষ অন্তরীয়খানি,
নিজেরে উজাড় করি, নিষ্কবচ করি।

হায়, আত্মম্ভরি,
তার অর্থ পশিল না তোমার মানসে :
যৌবনের নির্বোধ সাহসে
প্রাপ্য ভেবে, সে-নৈবেদ্য তুমি নিলে তুলি ;
দেখিলে না কাঁধে শূন্য ঝুলি,
চ'লে যায় লোকান্তরে মৈত্রীর দেবতা, –
প্রত্যাখ্যাত আশীর্বাদ, প্রতিহত অমৃতবারতা।

বুঝিলে না, তুমি বুঝিলে না
তুমি শুধু উপলক্ষ : মুক্তহস্ত বিধাতার দেনা
আমি চাই শুধিবারে, তোমারে মধ্যস্থমাত্র ক'রে।
ঋতুপতি বৎসরে বৎসরে
আনিল আমার তরে যে-বিচিত্র বরণের ডালি,
যে-দিব্য দীপালী
জ্বেলে দিল অমাবস্যা মাসে মাসে মোর সংবর্ধনে,
দিন দিন চিত্তের গহনে
উদয়াস্ত রেখে গেল যে-অক্ষয় রূপের সঞ্চয়,
সে তো নয়
ব্যয়কুণ্ঠ কৃপণের লাগি।

সম্ভোগের স্বপ্ন থেকে উঠেছিল জাগি
আমার হৃদয় তাই, তোমার ভিক্ষার গান শুনে ;
তাই সেই অমিত ফাল্গুনে,
সার্বভৌম সুন্দরের অমূর্ত উদ্দেশে,
দেহের দেউলে তব সঁপিলাম সর্বস্ব অক্লেশে ॥

কিন্তু ঋণ চুকিল না, কৃতজ্ঞতা হ'ল না লাঘব ;
শুধু জনরব
পিটায়ে বিদ্রূপডঙ্কা হাটে হাটে করিল ঘোষণা
অবাস্তব অলঙ্কার ব্যর্থ বিড়ম্বনা।
সন্ধিক্ষণ
প্রমাণিল আমি অকিঞ্চন।
বৈদ্যুতিক ব্যথা
দেখাল নিঃসঙ্গ শয্যা, উদ্‌ভাসিল নিরর্থ নগ্নতা
মতিভ্রান্ত উর্বশীকান্তের ॥

সর্বস্বান্ত যে-ক্ষতির জের
রেখেছে অজ্ঞাত ক'রে আজও মোরে দুঃস্থ নির্বাসনে
পথশূন্য বনের নির্জনে,
সে-সর্বনাশের দায়, জানি, নয় তোমার, আমার।
তথাপি ধিক্কার
মর্মে মর্মে তীব্র কশা হানে ;
নিরস্ত্র, বিবস্ত্র হিয়া ছুটে চলে মুমূর্ষার পানে ॥

২৩ জানুয়ারি ১৯৩২

সর্বনাশ

"বুঝি," বলেছিলাম সে-দিন, "সবই বুঝি।
করিব না পুঁজি
প্রেমের সমাধিস্তূপে মমত্বের জঘন্য জঞ্জাল।
মহাকাল
আমার ঈর্ষার বিষে নীলকণ্ঠ কখনও হবে না।
মূঢ়তার সেনা
ফাল্গুনীর প্রতিপক্ষে স্মরণের অক্ষম সঞ্চয়
জমাবে না পঞ্চত্বে যাবার সময়॥"

"জানি," বলেছিলাম, "ও-তনু
আশুক্লান্ত উপাদানে বিরচিল বিধি।
তাই ফুলধনু
ক্রমাগত হানে তব হৃদি,
ধৈর্যের অনর্থে তুমি কণ্ঠাগতপ্রাণ,
তোমার সাহস কাড়ে বৈধব্যের প্রেতার্ত শ্মশান।
তাই নিরন্তর
খোঁজে হিয়া বাটে বাটে যাত্রাসহচর।
শেফালীর প্রায়
তোমার কোমল বৃন্ত নিজ ভারে তাই ছিঁড়ে যায়
নিষ্ঠার জটিল বৃক্ষ হতে,
প্রীতির উদ্ভিন্ন কলি অকৃপণ মলয়ের স্রোতে
খ'সে পড়ে পদাশ্রিত পথিকের শিরে॥"

অন্তিম চুম্বন মম বিসর্জি তোমার অশ্রুনীরে,
তাই বলেছিলাম, "ইন্দ্রাণী
ইন্দ্রত্বের বিপর্যয়ে তুমি, দিবে আনি
প্রসন্ন স্বর্গের বর আগন্তুক তপস্বীর হাতে
অনাগত ফাল্গুনের প্রাতে॥"

আজও সবই বুঝি।
প্রাণপণে অন্তশ্চক্ষু বুজি,
সত্যের নিষ্ঠুর রশ্মি কোনও দিন করিনি ব্যাহত
আজও জানি, বুদ্বুদের মতো,
ক্ষণপ্রাণ মানুষের ভঙ্গুর, রঙ্গিল অঙ্গীকার,
ব্যর্থতাফেনিল হয়ে, টুটে বারংবার,
কালের প্রপাত যেথা, বিপর্যস্ত সৃষ্টির কিনারে,
বেগে নামে অনন্ত আঁধারে॥

আরও জানি
অনিত্য ব'লেই তুমি, দীপ্র তব নয়নের বাণী,
মদালস নিকুঞ্জের অন্ধকার নাশি,
বিদ্যুদ্‌বিলাসসম ফুটেছিল, সহসা উদ্ভাসি
মোর ক্ষিপ্র বাসনার পৃথুল প্রসার।
কটিভ্রষ্ট বসন তোমার
তাই ক্ষণে ক্ষণে
উপেক্ষার অভিযোগ এনেছিল মৌনের শ্রবণে ;
রোমাঞ্চের সংক্রামী বিস্ময়ে
অলক্ষ্য সৌন্দর্য তব ফিরেছিল মদির মলয়ে॥

সবই জানি, সবই আছে মনে।
তবু বুদ্ধি হার মানে, নিরশ্রু ক্রন্দনে
প্রাণের পরম শিরা ছিঁড়ে যায় মর্মমাঝে যেন।
যদি তুমি পরাঙ্কে আসীনা,
তবে কেন
আজও বাজে সৃজনের বীণা ;
এখনও ভাঙে না তাল উর্বশীর দৈবক নূপুরে ?
কেন মরে ঘুরে,
বিলয়ের পথরোধ করি,
ব্যোমের পরিধি-'পরে সমান্তর নক্ষত্রপ্রহরী ?

মনে হয় ফাঁকি, সবই ফাঁকি, —
মায়ার মুকুরপটে রিক্তগর্ভ প্রতিবিম্ব আঁকি,
যত সত্তা চ'লে গেছে অন্য কোনওখানে
নিয়ন্ত্রিত বিশ্বের সন্ধানে।
মনে হয়
অতল শূন্যের শেষে প'ড়ে আছি আমি নিরাশ্রয়,
দেখিতেছি ভ্রমিভ্রান্ত চোখে
গতায়ু আলোর প্রেত বিচরিছে স্তবকে স্তবকে
নিরালম্ব নৈরাশ্যের নিঃসঙ্গ আঁধারে॥

জানি, জানি অনাদ্যন্ত কালের মাঝারে,
জানি, তুমি অতিশয় হেয়,
নগণ্য বিন্দুর চেয়ে, অণু হতে আরও অবজ্ঞেয়।
তাহলেও তোমার অস্থিতি
নিয়েছে হরণ ক'রে ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্রস্থ প্রমিতি।
জানি সবই, তবু পরিবর্তনে তোমার
অস্পৃশ্য পেয়েছে ছাড়া, এমনকি নিত্য বিধাতার
জ্যোতির্ময় সিংহাসনখানি
ডুবেছে নাস্তির গর্ভে, সে-কথাও জানি॥

২৩ জানুআরি ১৯৩১

মার্জনা

ক্ষমা? ক্ষমা? কেন চাও ক্ষমা?
নিরুপমা,
আমি তো তোমার 'পরে করিনি নির্মাণ
অভ্রভেদী স্বর্গের সোপান;
স্থাপিনি অটল আস্থা বিদায়ের দিব্য অঙ্গীকারে;

ভাবিনি তোমারে
নিষ্ঠার প্রস্তরমূর্তি, অমানুষ, স্থবির, নিষ্প্রাণ ;
ভুলিনি তো তুমি মুগ্ধ নিমেষের দান ॥

তোমার আহ্বান,
মোর স্তব্ধ ভবিতব্য হানি,
উন্মত্ত উৎসবরাতে পঙ্গু বক্ষে দিয়েছিল আনি
চপলার উতল উল্লাস।
ভালো লেগেছিল ওই উদ্দাম, উড্ডীন কেশপাশ
মলয়ের তপ্ত স্পর্শে, ধান্যসম, কেলিপরায়ণ,
লক্ষ লক্ষ মধুপের মদির গুঞ্জন
তব ক্ষিপ্র কণ্ঠের আড়ালে।
সে-দিন তুমি যে এসে সম্মুখে দাঁড়ালে,
উৎসরি অচ্ছোদ নেত্রে যৌবনের উন্মুক্ত ফোয়ারা,
মূর্তিমান বিপর্যয়-পারা ॥

চেও না, চেও না তবে ক্ষমা :
নব বসন্তের প্রাতে অশোকের উদ্বেল সুষমা
কখনও কি ক্ষমা মাগে বন্ধ্যা ফণিমনসার কাছে?
ক্ষত পদে ফিরে এসে পাছে,
চাহে কি উধাও যাত্রী হিমস্তপ্ত শিলার মার্জনা ?
নিষ্কারণ ও-অনুশোচনা
আমার নিরিক্ত মর্মে বিষাক্ত শেলের মতো বাজে ;
কিছুতে ভুলিতে পারি না যে
সংকীর্ণ বিশ্বের কোণে আজও বৃথা জুড়ে আছি ঠাঁই,
সহজ প্রগতি তব বাধা পায় তাই,
থাকি থাকি
লক্ষ্যহারা হয়ে যায় তোমার করুণাপ্লুত আঁখি ;
তাই বারে বারে,
ব্যাজজীবী স্মরণের লুব্ধ অত্যাচারে

আত্মারে গচ্ছিত রেখে, আপনারে ভাবো চিরঋণী,
ক্ষমাভিখারিনী ॥

৯ মার্চ ১৯৩১

শাশ্বতী

শ্রান্ত বরষা, অবেলার অবসরে,
প্রাঙ্গণে মেলে দিয়েছে শ্যামল কায়া ;
স্বর্ণ সুযোগে লুকাচুরি-খেলা করে
গগনে গগনে পলাতক আলো-ছায়া।
আগত শরৎ অগোচর প্রতিবেশে :
হানে মৃদঙ্গ বাতাসে প্রতিধ্বনি :
মূক প্রতীক্ষা সমাপ্ত অবশেষে,
মাঠে, ঘাটে, বাটে আরব্ধ আগমনী।
কুহেলীকলুষ, দীর্ঘ দিনের সীমা
এখনই হারাবে কৌমুদীজাগরে যে ;
বিরহবিজন ধৈর্যের ধূসরিমা
রঞ্জিত হবে দলিত শেফালীশেজে।
মিলনোৎসবে সেও তো পড়েনি বাকী ;
নবান্নে তার আসন রয়েছে পাতা :
পশ্চাতে চায় আমারই উদাস আঁখি ;
একবেণী হিয়া ছাড়ে না মলিন কাঁথা ॥

একদা এমনই বাদলশেষের রাতে—
মনে হয় যেন শত জনমের আগে—
সে এসে, সহসা হাত রেখেছিল হাতে,
চেয়েছিল মুখে সহজিয়া অনুরাগে।
সে-দিনও এমনই ফসলবিলাসী হাওয়া
মেতেছিল তার চিকুরের পাকা ধানে ;

অনাদি যুগের যত চাওয়া, যত পাওয়া
খুঁজেছিল তার আনত দিঠির মানে।
একটি কথায় দ্বিধাথরথর চূড়ে
ভর করেছিল সাতটি অমরাবতী ;
একটি নিমেষ দাঁড়াল সরণী জুড়ে,
থামিল কালের চিরচঞ্চল গতি ;
একটি পণের অমিত প্রগল্‌ভতা
মর্ত্যে আনিল ধ্রুবতারকারে ধ'রে ;
একটি স্মৃতির মানুষী দুর্বলতা
প্রলয়ের পথ ছেড়ে দিল অকাতরে ॥

সন্ধিলগ্ন ফিরেছে সগৌরবে :
অধরা আবার ডাকে সুধাসংকেতে,
মদমুকুলিত তারই দেহসৌরভে
অনামা কুসুম অজানায় ওঠে মেতে।
ভরা নদী তার আবেগের প্রতিনিধি,
অবাধ সাগরে উধাও অগাধ থেকে,
অমল আকাশে মুকুরিত তার হৃদি,
স্বাতি মণিময় তারই প্রত্যভিষেকে।
স্বপ্নালু নিশা নীল তার আঁখি-সম,
সে-রোমরাজির কোমলতা ঘাসে ঘাসে ;
পুনরাবৃত্ত রসনায় প্রিয়তম ;
কিন্তু সে আজ আর কারে ভালোবাসে।
স্মৃতিপিপীলিকা তাই পুঞ্জিত করে
আমার রন্ধ্রে মৃত মাধুরীর কণা :
সে ভুলে ভুলুক, কোটি মন্বন্তরে
আমি ভুলিব না, আমি কভু ভুলিব না ॥

২৭ অগস্ট ১৯৩১

বিস্মরণী

কেন ধাও মোর পাছে পাছে ?
কিছু নেই কাছে ;
দিয়েছি উজাড়ি সবই নিলখ চরণে।
জীবন্ত মরণে
আপনারে নিকামত রেখেছি বেষ্টিয়া ;
স্বভাবের সার্বভৌম ক্রিয়া
ব্যাহত হয়েছে মোর নিবৃত্তির নিশ্চল তুহিনে ॥

নবাগত ফাল্গুনের দিনে
ধরণী, উমার মতো, যবে মোর সমাধির মূলে
ফলে-ফুলে,
বর্ণে-গন্ধে, রূপে-রসে রচেছে প্রেমের উপহার,
তখনও মারের গৈবী ধনুর টংকার
শুনি নাই মুগ্ধ কান পেতে ;
আত্মদুঃখে মেতে,
নির্জীব স্মৃতিরে বহি, ফিরেছি তাণ্ডবে,
ত্রিভুবন ছারখার করি ;
শূন্য নভে
রিক্ত প্রতিধ্বনি-স্ফীত অট্টহাসি ভরি,
উড়ায়ে মরুর বায়ে ছিন্ন বেদ-বেদান্তের পাতা,
বলেছি পিশাচহস্তে নিহত বিধাতা ॥

যেখানে যায় না কোনও লোক,
যেথা নাই ব্যাধি, মৃত্যু, নিরঞ্জন নিষ্কাম, নিঃশোক,
নিশ্চিহ্ন তুষারে ব'সে, আপনার মনে
প্রহরের জপমালা গণে,
তারেও দিইনি অব্যাহতি।

হায়, সতী,
তোমার গঠিত স্মৃতি, খ'সে নিজ ভারে,
কামক্লিষ্ট পীঠে সেথা স্থাপিত করেছে আপনারে॥

তোমার খেয়ানে
সঁপেছি আমার নিদ্রা; কণ্টকশয়ানে
ভুগেছি, জাগর স্বপ্নে, নিশি-ডাকা সংসর্গ তোমার।
একমাত্র তারা-জ্বালা গাঢ় অন্ধকার
নিয়ত এনেছে মনে অসীম, নীলিম আঁখি তব,
নিবিড়, রহস্যময়, অন্তর্দীপ্ত, ধ্রুব।
অগোচর নারিকেলবনে
মৃদুল মর্মর তুলে, খোলা বাতায়নে
কবোষ্ণ মলয় যবে ছুঁয়ে গেছে অলক্ষ্যে আমায়,
ক্ষণিক মায়ায়
ভেবেছি, বিহ্বল হয়ে, হয়তো বা তুমি ঘুমঘোরে,
রুদ্ধ কণ্ঠে করি প্রিয়সম্বোধন মোরে,
রোমাঞ্চ বিথারো দেহে উচ্ছ্বসিত কুন্তলের স্রোতে॥

আবেশ কেটেছে অশ্রুনীরে;
রুদ্ধশ্বাস গৃহ হতে ছুটেছি বাহিরে;
দেখেছি ক্ষীণাঙ্গ চাঁদ মন্দগতি কালের সৈকতে
চেয়ে আছে আশাপথ কার,
সুপ্ত কোন্ লগ্নভ্রষ্ট অভিসারিকার।
সঙ্গে সঙ্গে মোহের জোয়ারে
ডুবে গেছে শিক্ষা-দীক্ষা, ভূগোল-বিজ্ঞান একেবারে;
ভেবেছি তুমিও বুঝি শয়নবিরাগী,
দিগন্তরে,
সুখশ্রান্ত পুরীর শিখরে,
ঊর্ধ্বমুখ আকাঙ্ক্ষায় দাঁড়ায়ে, অভাগী,
করো অনুভব
সর্বব্যাপ্ত বিরহের আত্মঘ্ন গৌরব॥

আরও কিছু চাও ?
ক্লান্ত আমি ; অব্যাহতি দাও।
আলেয়ার ডাকে
জ্বলন্ত যৌবন মোর রুদ্ধ আজ পঙ্কের বিপাকে,
মুছেছে আমার ভবিষ্যৎ ;
অতীতের পথ
অবলুপ্ত বিনষ্ট স্বর্গের ধ্বংসস্তূপে ;
চুপে চুপে
ছেড়ে গেছে অন্তর্যামী অরাজক অন্তর আমার ;
আশা নাই, ভাষা নাই, কেবল ধিক্কার
রিক্ত মর্মে মাথা কুটে মরে ;
মৃত্যুর পাথেয়-মাত্র রাখি নাই সঞ্চয়ন ক'রে ॥

তাই বলি মিছে
ফিরো না আমার পিছে পিছে ;
দিতেছি অঞ্জলি এই সর্বশেষ গান :
হে প্রলুব্ধ ছায়াময়ী, অন্তরীক্ষে করো অন্তর্ধান ॥

৩০ জানুআরি ১৯৩৩

অর্কেস্ট্রা

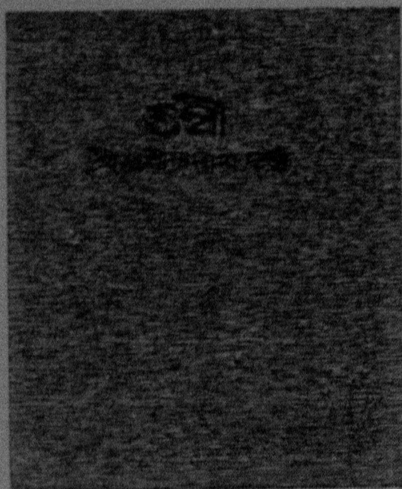
শ্রীযুক্ত অপূর্বকুমার চন্দ বন্ধুবরেষু—

১

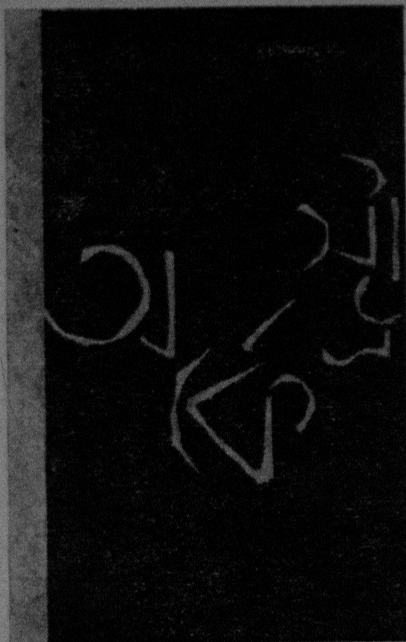
নিবে গেল দীপাবলী ; অকস্মাৎ অস্ফুট গুঞ্জন
স্তব্ধ হল প্রেক্ষাগারে। অপনীত প্রচ্ছদের তলে,
বাদ্যসমবায় হতে, আরম্ভিল নিঃসঙ্গ বাঁশরী
নম্র কণ্ঠে মরমী আহ্বান ; জাগিল বিনম্র স্বরে

[illegible]

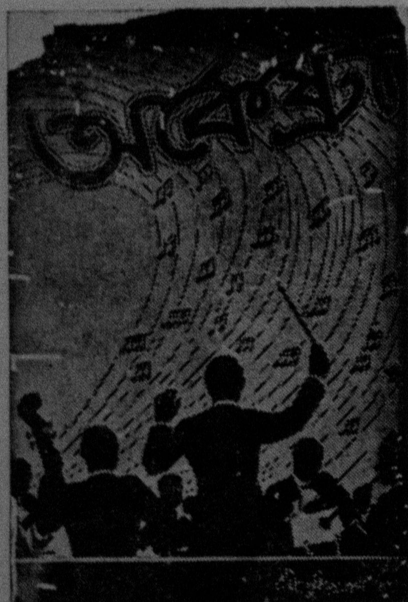
পাণ্ডুলিপির একটি পৃষ্ঠা



১৯৩০

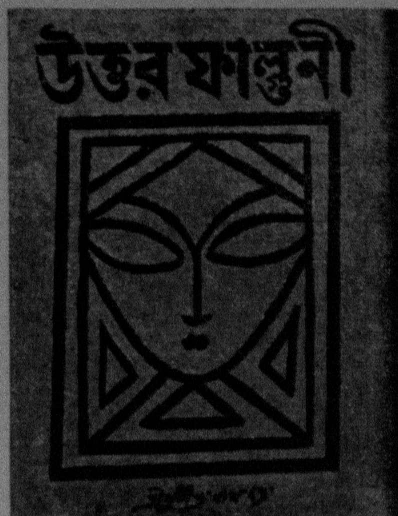


১৯৫৪

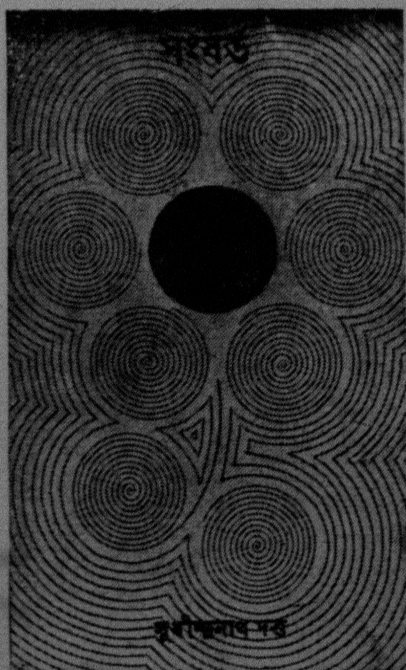


১৯৩৫

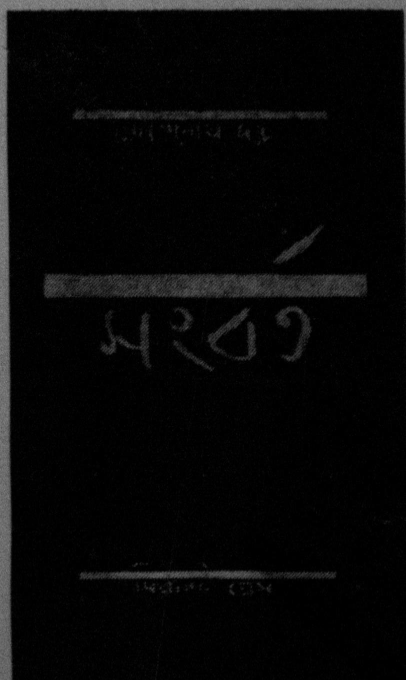




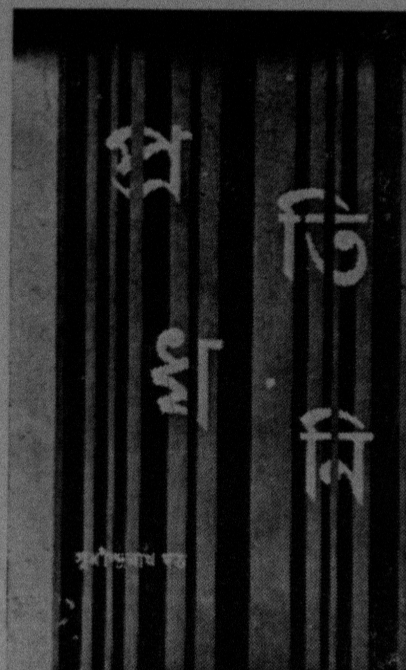
১৯৪০



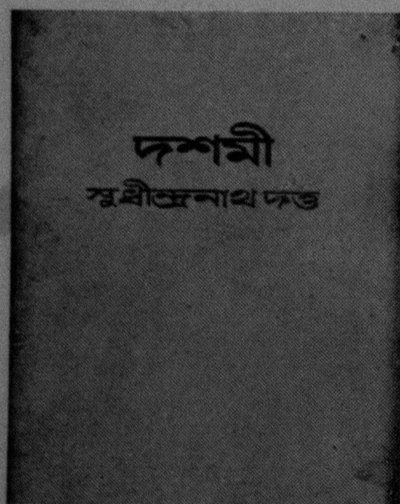
১৯৫৩



১৯৫৫



১৯৫৫



-কম্পিত উত্তর বেহালায় অচিরাৎ। মোর পাশে
সমাসক্ত নাগর-নাগরী সঙ্গে সঙ্গে বিকর্ষিল
ছিন্নগুণ ধনুকের মতো ; গাঢ়হাস্য প্রণয়ের
একান্ত প্রলাপ লজ্জা পেল সাধারণ্যে। আচম্বিতে
সচেতন প্রতিবেশিনীর ক্ষৌম কেশে উচ্চকিত
রতিপরিমল, পরদেশী সংগীতের ঐকতান
সমর্থনে যেন, পুনরায় উদ্বুদ্ধ করিল চিত্তে
অতিক্রান্ত উৎসবের বিক্ষুব্ধ ও বিক্ষিপ্ত সম্মোহ ॥

*

অস্তাচলে চন্দ্র দিশাহারা,
অতন্দ্রিত জোনাকি ম্রিয়মাণ,
বিদায় মাগে মলিন শুকতারা ;
স্বপনলীলা হয়েছে অবসান ॥

ত্রিযামা রাতি চাহিয়া বৃথা যারে,
জাগিল ধরা বিজন ফুলশেজে,
ছিন্ন ফুল, শুষ্ক সহকারে
উঠে কি তারই পদধ্বনি বেজে ?

সে আসে ওই, সে আসে ওই দূরে,
উতল বায়ু অধীরে কহে কানে ;
স্তম্ভসম তরুর চূড়ে চূড়ে
প্রহরী পাখী মুখর হল গানে ॥

*

রাত্রিশেষের দ্বিধাদুর্বল আলো
উঁকি মারে ওই খোলা জানালার ধারে ;
নির্বাণ দীপে ধূমকজ্জল কালো
মূর্ত করেছে ব্যর্থ প্রতীক্ষারে ॥

বিশ্বজগৎ ছিল কুয়াশায় ঘেরা ;
দীর্ঘশ্বাসে বিষাদিত মোর গেহ ;
রবি, শশী, তারা—সর্বরত্নভেরা,
সকলে উধাও ; দূরে, কাছে নেই কেহ ॥

কে জানে কোথায় আজিকে সে পলাতকা,
সে-মায়ামৃগীরে কে ধরেছে, ফাঁদ পাতি ?
মৃত্যু, কেবল মৃত্যুই ধ্রুব সখা,
যাতনা, শুধুই যাতনা সুচির সাথী ॥

চিন্তাও আর আগায়ে যেতে না পারে ;
গতাসু হতাশ ; বিলাপ চেতনাহত।
সহসা বিমুখ বাতাসে বন্ধ দ্বারে
কার করাঘাত বাজে স্বপনের মতো ?

২

ফুকারিল রণতূর্য ; প্রতিধ্বনিপ্রভব দুন্দুভি
সাড়া দিল সমস্বরে ; চমৎকৃত সুষিরে সুষিরে
ভরিল বিপুল মন্দ্র ; তন্ত্রে তন্ত্রে হল বিনিময়
গমক, মূর্ছনা, মীড় ; লক্ষ লক্ষ অদৃশ্য কিঙ্কিণী
অধীর আগ্রহ-ভরে বিতরিল দিকে দিগন্তরে
স্বর্ণপ্রভ কবোষ্ণ ঝংকার। তরুণীর বক্র কেশে
সঞ্চরিল শিহরণ বিচঞ্চল করতাল থেকে ॥

সপ্ততুরগ রবি আগত সহসা উদয়শৈলশিখরান্তে :
শাপবিমোচিত বসুধা বন্দে তারণ চরণোপান্তে।
মলয় কমলরজ বরষে ; মধুকর মুখরে হরষে ;
মায়ামুকুরিত সরসে ছায়া নিরখে কান্তে।
সপ্ততুরগ রবি আগত সহসা উদয়শৈলশিখরান্তে ॥

আগত, আগত উদার সবিতা : প্রাচী রঞ্জিত রাগে ;
উত্তর-দক্ষিণ-অন্তদিগন্তে লাগে আশিস্ লাগে।
চিরপরিচিত গৃহশিখরে কুহককনককণ ঠিকরে :
ধূলিমলিন পুরশিকড়ে জাগে শিহরণ জাগে।
আগত, আগত উদার সবিতা : প্রাচী রঞ্জিত রাগে॥

*

ললাট তোমার দিনের আশিসে দীপ্র :
নয়নে তোমার অমর প্রাণের লাস্য :
নিঃশ্বাস তব প্রণব আবেগে ক্ষিপ্র ;
তুমি প্রসন্ন অধরার স্মিত হাস্য॥

কুন্তলে তব শরৎসাঁঝের ঋদ্ধি ;
পাকা দ্রাক্ষার মদির কান্তি অঙ্গে ;
উরসে তোমার মর সাধনার সিদ্ধি ;
ধরা রূপবতী, সে তোমারই অনুষঙ্গে।

কত জনমের বঞ্চনাব্যথা মস্ত
পেয়েছে তোমার তিনটি কথায় ক্ষান্তি।
অলীক স্বপন — তুমিই নিপট সত্য ;
চলচঞ্চলা — তুমিই পরম শান্তি॥

৩

নীরব সকল যন্ত্র ; ক্লান্তিহীন বেহালা কেবল
ফিরিল সপ্তকরথে সমধর্মী সুহৃৎ-সন্ধানে
গ্রাম হতে গ্রামান্তরে। টুটিল হঠাৎ সনির্বন্ধ
অনুনয়ে তার শরমের সংকোচন নির্বচন
পিয়ানোর বুকে ; সঞ্চালিত কড়ি ও কোমলে দ্রব
স্বর উদ্বেল, উচ্ছল হল ; অতিমর্ত্য অনুনাদে
ভ'রে গেল সংগীতের শূন্য অবকাশ। মোর পাশে

যৌন বিদেশিনী অহৈতুক সোহাগের আকস্মিক,
গূঢ় প্রবর্তনে স্থাপিল অধীর পাণি দয়িতের
চমৎকৃত ভুজে, চিত্রল নখের মূলে শশিকলা
করি বিকিরণ। পরশিল আমারে উত্তরী তার॥

*

দখিন বায়ু আসি নির্ঝরিণীকানে
ভনিল কোন্ কথা, তা শুধু সেই জানে।
সহসা সে-সুমনা হয়েছে বিবসনা,
অশ্লীল নটীপনা জেগেছে প্রাণে প্রাণে।
কহিল সমীরণ কী কথা কানে কানে?

অচল শিলা-বুকে উন্মাদিনী নাচে;
স্ফুরিত তনুলতা, বুঝি না, কারে যাচে।
মেখলা, কটিতটে, চমকে ছায়ানটে,
নূপুরে জাদু রটে; কবরী উড়ে পাছে।
স্তব্ধ মেঘে যেন সৌদামিনী নাচে।

সে যেন মায়ামৃগী, বিতরি কস্তুরী,
পাগল বায়ু-সনে খেলিছে লুকাচুরি!
কখনও বনছায়া ঢাকে সে-বরকায়া;
কভু সে-পীত মায়া আলোরই কারিগুরি।
অপ্সরীতে প্যানে খেলে কি লুকাচুরি?

*

ছায়াবীথি মোহে ঢাকা,
সোনা-খচা পথখানি,
ফুলে অবনত শাখা
গুঞ্জরে বনবাণী॥

জানি আছ সে-রহসে,
তবু খুঁজি দিশাহারা—
অগোচর তামরসে
অলি বুঝি মাতোয়ারা ॥

নাতিদূরে তব হাসি
উন্মথে নীরবতা :
কঙ্কণ কলভাষী
বলে, শুনি, উপকথা !

হে তপতী, তোমা চুমি,
বায়ু আজি হিমজয়ী !
দিবে না কি ধরা তুমি,
ওগো কৌতুকময়ী ?

অবশেষে দাও দেখা,
বুকে লাইলাক্-রাশি ;
মুখে রঙ্গিলা রেখা,
ছুটে চলো পাশাপাশি ॥

অচিরাৎ ছল ভুলি,
ফিরে চাও আনমনে ;
পথপাশে ফুলগুলি
ঝ'রে পড়ে অযতনে ॥

গূঢ় অশ্রুতে যেন
অকারণে দ্রবীভূত,
হাতে হাত রেখে, কেন
করো মোরে অভিভূত ?

তার পরে ভাবাবেশে
সংকোচ বিস্মরি,
অধরার উদ্দেশে
পা বাড়াও, সহচরী ॥

তাকে বল সমুখে যে,
ঘনতর চয় ছায়া !
সেখানে কি ফুলশেজে
মিশে যাবে দুটি কায়া ?

৪

আবার সকল তুরী, সমস্ত বিষাণ আরম্ভিল
সমন্বয়ে কাংস্য কোলাহল ; অভ্রভেদী রুদ্রবীণা
ঝংকারিল সমুচ্চ সপ্তমে ; মহীয়ান্ অর্গানের
সাগরসংগীতে পিয়ানোর স্নিগ্ধ কণ্ঠ ডুবে গেল
ক্ষীণতোয়া তটিনীর মতো। ত্রিভুবন পরিপ্লুত
হল তানে, তালে, স্বরসমন্বয়ে ; রহিল না কোনও
ছিদ্র, নিবৃত্তি, বিরাম। রঙ্গমঞ্চ হতে পলাতক
আলোকের স্পন্দিত অণিমা বিচ্ছুরিল অকস্মাৎ
পার্শ্ববর্তী যুবতীর নীলাঞ্জন নয়নের কোণে ॥

৫

অগাধ গগন হতে, দ্বিপ্রহরে,
আলোর সোনালী সুরা অঝোরে ঝরে ;
সে-মাতনে বাহু তুলে, অটবী দোতুল দুলে ;
তারই কণা ফুলে ফুলে উঠেছে ভ'রে।
ঝরে আলোকের সুরা দ্বিপ্রহরে ॥

অসীম নীলিমা হাসে উদার নভে ;
পুলকিত শ্যামলিমা অখিল ভবে।

ছায়াতে কি প্রয়োজন ? সংকোচ অশোভন
মিলনের বিবসন মহোৎসবে ।
ধরণীতে শ্যামলিমা, নীলিমা নভে ॥

কখন হয়েছে মূক পাখীর গীতা ;
অকপট সমারোহে বচন বৃথা !
শোনো মৌনের তলে বিধাতা অবাধে চলে,
আঁকিয়া অলখ হলে প্রাণের গীতা ।
অকপট সমারোহে বচন বৃথা ॥

*

হিরণ নদীর বিজন উপকূলে
আচম্বিতে পথের অবসান ;
তপোবনে কল্পতরুর মূলে
আবির্ভূত নিত্য বর্ত্তমান ॥

পরপারে নাম-না-জানা গ্রাম
রৌদ্রে রঙীন মরীচিকার প্রায় ;
পশ্চাতে মাঠ উধাও, ঘনশ্যাম,
লুটায় গিয়ে স্বর্গলোকের পায় ॥

সাত সমুদ্র পেরিয়ে, চারণ বায়ু
অচিন ভাষায় করছে কথকতা ;
ঝংকারে তার মুখর মোদের স্নায়ু ;
জিহ্বা অবাক, নয়ন বলে কথা ॥

থামল প্রলাপ স্রোতস্বিনীর মুখে ;
স্তব্ধ হল হাওয়ার কোলাহল ;
শুনতে পেলেম আপন নীরব বুকে
আহুতি চায় অজর হোমানল ॥

পড়ল তোমার ব্যাকুল বন্ধন টুটে,
বিশ্বের চরণপ্রান্ত চুমি ;
ফিরল পুলক রিক্তাকাশে ছুটে ।
কল্পলোকের উর্বশী কি তুমি ?

শূন্যে হঠাৎ লুপ্ত বসুন্ধরা ;
ত্রিভুবনে কেবল তুমি-আমি :
সৃজনপ্রাতের প্রথম যমক মোরা,
প্রলয়রাতের শেষ বনিতা-স্বামী ॥

৫

সহসা ডম্বরু, ডঙ্কা বজ্রকণ্ঠে উঠিল হুংকারি ,
ক্ষণে ক্ষণে কর্কশ ঝঞ্ঝনা ঝংকারিল করতালে
বিপরীত স্বরে ; রহি রহি নিবদ্ধ তন্ত্রের 'পরে
বিচরিল অসংগত স্বরের ঝলক ; তীব্র বাঁশি,
বিদীর্ণ কীচক-সম, প্রচারিল প্রলয়ের ক্ষতি
অরুন্তুদ হাহাকারে ; অর্গানের সান্তর গর্জনে
বাসুকির নাভিশ্বাস শ্রুতিগম্য হল অচিরাৎ ,
পিয়ানোর ক্ষিপ্র আস্ফালনে উচ্চারিল মূর্ত মৃত্যু
নৃশংস নির্দেশ । সে-বিক্ষুব্ধ উতরোলে কিশোরীর
উদ্দীপ্ত নয়ন নিবে গেল আচম্বিতে ; নিরুৎসুক,
শ্লথ, স্তব্ধ তনুলতা তার অকস্মাৎ মোর রিক্ত
বুকে করিল সঞ্চার বিষাদের উদাস বেদনা ॥

৬

আজি ফাগুনবেলার পরসাদ
যায় হারায়ে অকাল বাদলে ;
ভাঙে সুখশ্রান্তির অবসাদ
ওই মত্ত মেঘের মাদলে ।

ফুঁকে কালবৈশাখী ঘূর্ণ ;
কাঁপে দেওদার, বট, ভূর্জ ;
ডুবে মধ্যদিনের সূর্য
ভীমা অমাবস্যার আদলে।
টুটে সিদ্ধ কামের পরমাদ
আজি সহসা অকাল বাদলে ॥

ঘোর ঈশানে সঘনে গরজায়
ওই প্রলয়পাগল অশনি,
ভাঙা কুঞ্জবনের দরজায়
নাচে রুদ্রাণী দিগ্‌বসনী,
তারই লেলিহান অসি খরধার
লিখে গগনে গগনে সংহার ;
যত ত্রিকালতিষ্ঠ মূলাধার
পাড়ে ঝঞ্ঝা করালদশনী।
ধরা আঘাতে আঘাতে মূরছায়,
ক্রোধে গরজে গগনে অশনি ॥

আজ মহেশ মেলেছে ত্রিলোচন,
পায়ে তাণ্ডব জেগে উঠেছে ;
হল বিন্ধ্যের শাপবিমোচন,
পুন সৌরলোকে সে ছুটেছে।
বুঝি উদ্‌ঘাট দ্বার নরকের ;
যত তৃষিত পিশাচ মড়কের,
তারা মেতেছে গাজনে চড়কের,
সারা বিশ্বের স্থিতি টুটেছে।
ওই রসাতলে যায় ত্রিভুবন ;
আজ প্রলয়েশ জেগে উঠেছে ॥

খেলাচ্ছলে শুধিয়েছিলেম, "তোমার প্রেমে
নই কি আমি প্রথম আগন্তুক ?"
অবাক বিষাদ এল তোমার চক্ষে নেমে ;
রক্তে ভাটা, ফিরিয়ে নিলে মুখ ॥

বলতে গিয়ে, আটকে গেল আত্মকথা ;
করুণ কাঁপন লাগল ওষ্ঠাধরে ;
আচম্বিতে সংকুচিত তনুলতা,
লুকাল না লজ্জা দিগম্বরে ॥

যোগ হারাল হঠাৎ নিবিড় আলিঙ্গনে,
শূন্য ঘিরে রইল আমার বাহু ;
নাড়লে মাথা, কাটায় কাঁটা গোলাপবনে
গর্বেরে মোর করলে কি গ্রাস রাহু ?

লুপ্ত হল আধারবিন্দু বিশ্ব হতে ;
খিল খসাল নাস্তি পুনর্বার ;
ভাগ্যরবি চলল ছুটে পাতালপথে ;
চতুর্দিকে আদিম অন্ধকার ॥

একলা আমি ধ্বংসাবশেষ কালের 'পরে ;
সামনে মরু অস্থিসমাকুল।
মৃত্যু স্বয়ং বিস্মরিল আজকে মোরে ;
অস্তমিত বিধির আমি ভুল ॥

*

ক্ষণকাল নিস্তব্ধ সকলই। তার পর আর বার
মোহন মুরলী কী অপূর্ব পূরবীর মোহময়
সুরের আবেশে তুলিল রণিত করি সীমাশূন্য
শূন্যতার হিয়া ; সারেঙ্গীর মলরোল বিলম্বিত

তালে সমাচ্ছন্ন পিয়ানোর মুখে সিঞ্চিল পরম
যত্নে সঞ্জীবনী সুধা ; অলক্ষ্য কিঙ্কিণী ঝংকারিল
শান্ত স্বরে বিরামে বিরামে। কান্তের বিহ্বল স্পর্শ
ফিরে দিল উৎসুক কম্পন যুবতীর জড় দেহে ॥

*

সন্ধ্যার রাগ ছিন্ন মেঘের অন্তরে
অঙ্গারমসি প্রেমালোকে করে পুণ্য ;
পূর্ব গগনে মধুনিশা আসে মন্থরে,
প্রতিচ্ছায়ায় রঙীন উদাস শূন্য ॥

পরপারে, কোথা অনামা গ্রামের কিনারে,
দৈববাণীর ছন্দে মুখরে ঘণ্টা ;
এ-পারে, সুচির ধ্রুবতারকার ঝিঝিরে,
স্নাত উপবন পাসরিল উৎকণ্ঠা ॥

দূর দিগন্তে, নিবাত ধূমের ডম্বরে,
বাজে পলাতক ঝড়ের মুরজমন্দ্র ;
গত দুর্যোগ — সে যেন উষার অম্বরে
বিরহরাতের দুঃস্বপনের চন্দ্র !

অমৃতলোকের কৌতুকে কাঁপে ক্রন্দসী ;
পরিমণ্ডলে বাহিত অলকানন্দা ;
ঝিল্লীর ডাকে মরধামে নামে উর্বশী ;
তিমিরতোরণে ফুটেছে রজনীগন্ধা ॥

অভয় নিশার দক্ষিণ হাতে উদ্ধৃত,
সপ্ত প্রদীপ ম্রিয়মাণ বাম হস্তে ;
যদিও দিনের ভাস্বর আঁখি মুদ্রিত,
মর্ত্যমহিমা যায় নাই তবু অস্তে ॥

*

স্বর্ণভারে তোমার মাথা লুটিছে মম উরুতে ;
নিবিড় নীল নয়ন-কোণে সজল স্মৃতি অঙ্কিত ;
অতীত ব্যথা—কেবল তার ত্রিবলি তব ভুরুতে ;
হরিণীসম, কম্প্র তনু অহেতু ভয়ে শঙ্কিত ॥

কণ্ঠে মম জড়ায়ে আছে তোমার ভুজমালিকা ;
বচনাতীত প্রলাপ তব শ্রবণে মম গুঞ্জরে ।
কী মায়াবলে ঊর্ণাজালে বেঁধেছ, সুরবালিকা,
মদস্রাবী, ঈর্ষাপর, সর্বনাশা কুঞ্জরে ?

স্পর্ধা মোর পড়েছে টুটে ; ভ্রান্তি মোর গিয়েছে ;
দৃপ্ত শির পঙ্কে লুটে তোমার চরণাম্বুজে ;
নিঃস্ব আমি, বিশ্ব তাই আজিকে কোল দিয়েছে ;
রাজার প্রেমকাহিনী যেন বাজে ভাঙা গম্বুজে !

চিনেছি চির মানবী তুমি ; পাবন তব করুণা,
অযোগ্যের অবগাহনে হয় না ম্লান, লাঞ্ছিত ;
প্রথম ঠাঁই পাইনি তাই তোমার প্রেমে, অরুণা ;
প্রত্যাগত মাধবে আজি তাই কি আমি বাঞ্ছিত ?

৭

উদাত্ত বিষাণ উৎসরিল ঊর্ধ্বগ আহ্বান ; মুগ্ধ
বেণু, দীর্ঘায়িত মিনতির সুরসূত্র টানি, বেঁধে
দিল রন্ধ্রে রন্ধ্রে সংযোগের রাখি ; আবিষ্ট মূর্ছনা,
উদ্বেল অন্তর হতে, উত্তরিল বেহালার তারে ;
ত্রিপথগা সুরধুনী, অর্গানের শঙ্খনাদে জেগে,
চরাচর ডুবাল উর্বর মোক্ষে । অগাধ উল্লাসে
লোকলজ্জা সহসা তলাল ; প্রণয়ীর বাহুপাশ
ঘেরিল তম্বীর তনু অপরোক্ষ স্নেহে ; চারি চোখে
হয়ে গেল দেওয়া-নেওয়া কী বেদনা অনির্বচনীয় !

*

স্বর্গের মর্ত্যের সকল ব্যবধান লুপ্ত সনাতন রাত্রে ;
মৌনের নির্ঝর মেদুর সুরাসার সিঞ্চে গগনের পাত্রে ;
জন্মান্তর কায় প্রণব সারিগান স্বপ্নাবেশে পিক গুঞ্জে ;
প্রাক্তন পুষ্পের অমর অবদান স্ফূর্ত গোলাপের পুঞ্জে ;
চন্দ্রের কৌস্তভ, উরসে প্রকৃতির, মুগ্ধ নিদ্রায় স্তব্ধ ;
মৃত্যুর মঞ্জীর নীরবে শোনা যায় ; শূন্যে মিশে যায় অব্দ ;
সিদ্ধির নির্বাণ প্লাবিল মরধাম। কাজ কি অমরায় অন্ত ?
সুপ্তির সন্ধান দিয়েছে ভগবান : ধন্য, ধরা আজ ধন্য !

*

পূর্ণ চন্দ্র খোলা বাতায়নে পশিছে ঘরে,—
তব তনুলতা সুপ্ত কুসুমশয়ন-'পরে।
জ্যোৎস্না তোমার পীড়িত উরোজে
বিথারে প্রলেপ সিত মলয়জে ;
স্তিমিত অঙ্গে মন্দারসার বপন করে।
নিদ্রিত সুখশ্রান্তিতে তুমি শয়ন-'পরে॥

মায়ামৃগী, তুমি বন্দিনী আজ আমার গেহে,—
আমার অমরা আশ্রিত তব মানুষী স্নেহে।
স্খলিতবসন উরুতে তোমার
অনাদি নিশার শান্তি উদার ;
নব দূর্বার চিকন পুলক ও-বরদেহে।
বিশ্বের প্রাণ বিকচ আজিকে আমার গেহে॥

মরণের সুধা সঞ্চিত তব আলিঙ্গনে ;
জন্মান্তর নিমেষে ফুরায় ও-চুম্বনে ;
তোমার নিবিড় নিঃশ্বাসবায়ু
করে হিমায়িত শবেরে শতায়ু ;
সন্নিধি তব সৃজন-আকৃতি পরানে ভনে।
আসে তথাগতি তোমার প্রগাঢ় আলিঙ্গনে॥

খোলা বাতায়নে চন্দ্রমা চুমে তোমার মাথা ;
দূর নীহারিকা শুনে শ্রবণে স্বস্তিগাথা।
তব স্বপনের শঙ্কিত লহরী
দেয় মোর বুকে হিন্দোলা ভরি ;
গভীর আবেশে নিমীলিয়া আসে চোখের পাতা
বিধির আশিস্ মুকুটিত করে যুগল মাথা॥

...

অকস্মাৎ স্বপ্ন গেল টুটে। দেখিলাম ত্রস্ত চোখে
জনশূন্য রঙ্গালয়ে নির্বাপিত সমস্ত দেউটি,
নিস্তব্ধ সকল যন্ত্র, মঞ্চ-'পরে যবনিকা ঢাকা।
অলক্ষ্যে কখন পার্শ্ব হতে প্রেমিক-প্রেমিকা চ'লে
গেছে অমৃতসংকেতে। শান্তি—শান্তি—শান্তি চারি ধারে!'
কেবল অন্তর মোর উত্তরঙ্গ ক্ষুব্ধ হাহাকারে॥

১১ ফেব্রুআরি ১৯৩২

ক্রন্দসী

হম্‌ফ্রে হাউস্‌

বন্ধুবরেষু—

—"ওগো বনের অধিষ্ঠাতা আর তোমরা যত অন্য দেবতারা এখানে বিদ্যমান, আমার অন্তরকে সৌন্দর্য দাও, আমার বাহ্য সম্পত্তিকে করো অন্তরের অনুকূল। যেন ভাবি জ্ঞানী যে বিত্তবান শুধু সেই; যেন আমার ভাগে জোটে কেবল সেইটুকু সুবর্ণ যার ভার মিতাচারী ভিন্ন অপরের দুর্বহ।—"

—ফীড্রাস্, ২৭৯

উটপাখী

আমার কথা কি শুনতে পাও না তুমি ?
কেন মুখ গুঁজে আছ তবে মিছে ছলে ?
কোথায় লুকাবে ? ধূ ধূ করে মরুভূমি ;
ক্ষ'য়ে ক্ষ'য়ে ছায়া ম'রে গেছে পদতলে।
আজ দিগন্তে মরীচিকাও যে নেই ;
নির্বাক, নীল, নির্মম মহাকাশ।
নিষাদের মন মায়ামৃগে ম'জে নেই ;
তুমি বিনা তার সমূহ সর্বনাশ।
কোথায় পলাবে ? ছুটবে বা আর কত ?
উদাসীন বালি ঢাকবে না পদরেখা।
প্রাক্‌পুরাণিক বাল্যবন্ধু যত
বিগত সবাই, তুমি অসহায় একা ॥

ফাটা ডিমে আর তা দিয়ে কী ফল পাবে ?
মনস্তাপেও লাগবে না ওতে জোড়া।
অখিল ক্ষুধায় শেষে কি নিজেকে খাবে ?
কেবল শূন্যে চলবে না আগাগোড়া।
তার চেয়ে আজ আমার যুক্তি মানো,
সিকতাসাগরে সাধের তরণী হও ;
মরুদ্বীপের খবর তুমিই জানো,
তুমি তো কখনও বিপদ্‌প্রাজ্ঞ নও।
নব সংসার পাতি গে আবার চলো
যে-কোনও নিভৃত কণ্টকাবৃত বনে।
মিলবে সেখানে অন্তত নোনা জলও,
খসবে খেজুর মাটির আকর্ষণে ॥

কল্পলতার বেড়ার আড়ালে সেথা
গ'ড়ে তুলব না লোহার চিড়িয়াখানা ;

ডেকে আনব না হাজার হাজার ক্রেতা
ছাঁটতে তোমার অনাবশ্যক ডানা।
ভূমিতে ছড়ালে অকারী পালকগুলি,
শ্রমণশোভন বীজন বানাব তাতে;
উধাও তারার উড্ডীন পদধূলি
পুঙ্খে পুঙ্খে খুঁজব না অমারাতে।
তোমার নিবিদে বাজাব না ঝুমঝুমি,
নির্বোধ লোভে যাবে না ভাবনা মিশে;
সে-পাড়া-জুড়নো বুল্‌বুলি নও তুমি
বর্গীর ধান খায় যে উনত্রিশে॥

আমি জানি এই ধ্বংসের দায়ভাগে
আমরা দু জনে সমান অংশীদার;
অপরে পাওনা আদায় করেছে আগে,
আমাদের 'পরে দেনা শোধবার ভার।
তাই অসহ্য লাগে ও-আত্মরতি।
অন্ধ হলে কি প্রলয় বন্ধ থাকে?
আমাকে এড়িয়ে বাড়াও নিজেরই ক্ষতি।
ভ্রান্তিবিলাস সাজে না দুর্বিপাকে।
অতএব এসো আমরা সন্ধি ক'রে
প্রত্যুপকারে বিরোধী স্বার্থ সাধি:
তুমি নিয়ে চলো আমাকে লোকোত্তরে,
তোমাকে, বন্ধু, আমি লোকায়তে বাঁধি॥

২২ অক্টোবর ১৯৩৪

সন্ধান ।

আপনারে অহরহ খুঁজি।
কিন্তু যার স্পর্শ পাই, নিগূঢ় বিশ্রম্ভালাপ বুঝি,
অভীষ্ট সে নয়।
সে শুধু কামসর্বস্ব বাচাল হৃদয়
বহুরূপী, বহুভাষী, বহুব্যবসায়ী,
যার সনে আত্মীয়তা নাই
স্বচ্ছন্দ দেহের কিংবা স্বতন্ত্র বুদ্ধির ;
যে-অধীর
পৃথ্বীর পৃথুল কোলে শান্ত হয়ে থাকিতে পারে না ;
বারে বারে যার স্বপ্নসেনা
অলীক স্বর্গের দ্বারে হানা দিতে ছুটে
শূন্যের পরিখা-ঘেরা ব্রহ্মাণ্ডের সন্তপ্ত সম্পুটে
যেথা তার প্রতিনিধি, ক্রূর ভগবান,
পাসরি সম্রাট্‌নিষ্ঠা অগোচর সামন্ত-সমান,
অনাদি নীরবে ব'সে, মনের গোপনে
চক্রান্তের ঊর্ণাজাল বোনে ॥

আমি যারে চাই
তার মাঝে ভেদ নাই, দ্বন্দ্ব নাই, দেশ-কাল নাই ;
মননে ও মনীষায়, দেহে ও বুদ্ধিতে
একান্ত সে ; বিসংবাদী উপাদান শিল্পের শুদ্ধিতে
যেমন নিষ্কল, সেও তেমনই সংগত—
সংকল্পপ্রহত
বাদ্যভাণ্ড মগ্ন ঐকতানে ;
দেবযানে
উদ্‌গাতা জ্যোতিষ্ক যেন বৃত্তির নিজস্বে পূর্ণ করে
অসম্পৃক্ত অয়নাংশ ; তথায় বন্দরে
নিশাক্রান্ত তরণীরে নিরুদ্দিষ্ট তার আশীর্বাদ ;

ব্যক্তিনিরপেক্ষ তার প্রচুর প্রসাদ
রূপসীর অহংকারে, কুরূপার কৌতুকে ধরাই ;
রটায় সে-হতবাক্ ভাট,
নবজাতকের বার্তা উৎকর্ণ জগতে ॥

আমারে যে ডাকে মুক্ত পথে
দীক্ষা দিতে, মোক্ষে নয়, স্বায়ত্তশাসনে,
তার অপেরণে
অপচারী দ্রষ্টাই প্রকট ;
শাঠ্যের প্রেরণা তারে যোগায় না শঠ ;
মজে না সে প্রশংসায়, পায় না লোকাপবাদে ভয় ;
স্থিতধী সঞ্জয়
ডরায় না ব্যাধি, মৃত্যু, জরা,
চিতার স্ফুলিঙ্গযোগে জীবনের দীপপরম্পরা
জ্বালায় সে নির্বিবাদ নির্বাণের আগে ॥

অক্ষয় মনুষ্যবট নির্বিকার যে-প্রাণপরাগে
বিকশিত আগুক্লান্ত নির্বিশেষ ফলে,
সে-অনাম চিরসত্তা খুঁজি আমি নিজের অতলে ॥

১২ অক্টোবর ১৯৩৩

সৃষ্টিরহস্য

আয়ুর সোপানমার্গ বহু কষ্টে অতিক্রম করি
উন্মুক্ত মৃত্যুর প্রান্তে ঊর্ধ্বমুখে দাঁড়ায়েছি এসে ;
সিন্ধুর ভাস্বর আঁখি খোঁজে মোরে নিয়ে নিরুদ্দেশে ;
আমার আরতিদীপ মহাশূন্যে সাজায় শর্বরী ॥

সম্মুখে নিখিল নাস্তি ; পৃষ্ঠদেশে মৌন নীরবতা ;
প্রশান্তি দক্ষিণে, বামে ; জনহীন অন্তর, বাহির ।

তবু কার আবির্ভাবে কণ্টকিত আমার শরীর ;
অবচেতনার তলে গুমরে কী জাতিস্মর কথা ?

তবে কি বিরাট শূন্য শূন্য নয়, সাগরের প্রেত ;
উদ্বেল বিক্ষোভ তার পরিণত বিদেহ ঈথারে ?
তবে কি দুর্মর মর্ত্য ক্রন্দসীতে ক্রন্দন বিথারে ;
শস্তের মিসরী শবে উপ্ত সম্ভাবনার সংকেত ?

নির্লিপ্ত আলোর দ্বীপ নয় ওই দিব্য নীহারিকা,
কালের প্রপাতে মগ্ন বাসনার ভাসমান ফেনা ?
অবচ্ছিন্ন তারারাশি, ওরা চিরদিনকার চেনা
পশুদের স্থূল সত্তা, লালসার মূর্ত বিভীষিকা ?

নাই নাই মৌন নাই, সর্বব্যাপী বাঙ্ময় জগৎ ;
নির্বাণ বুদ্ধির স্বপ্ন, মৃত্যুঞ্জয় জ্বলন্ত হৃদয় ;
হয়তো মানুষ মরে, কিন্তু তার বৃত্তি বেঁচে রয় ;
জন্ম হতে জন্মান্তরে সংক্রমিত প্রত্ন মনোরথ ॥

রূপোপাস কল্পনা ত্যাগ ; নিরাসক্তি অসাধ্যসাধন ;
অনন্তপ্রস্থান মিথ্যা ; সত্য শুধু আত্মপরিক্রমা ;
বিদ্রোহে স্বাতন্ত্র্য নাই ; মুক্তি মানে নিরুপায় ক্ষমা ;
সৃষ্টির রহস্য মাত্র আলিঙ্গন, পুনরালিঙ্গন ॥

১৫ অক্টোবর ১৯৩৩

প্রত্যাখ্যান

অধোমুখ আকাশের পানপাত্র থেকে
আবার মাথায় ঝরে নীলারুণ সন্ধ্যার মাধুরী
সুরাসম স্বচ্ছ, ফেনোজ্জ্বল ।

পুনরায় পরিপ্লুত প্রতি রোমকূপে
মাগে অন্ধ উন্মাদনা রুক্ষ মর্মে অবাধ প্রবেশ।
অন্তরের আগ্নের গহ্বরে
শত জন্ম-জন্মান্তের নির্বিকার অভাব সহসা
আমায় কি স্বপ্নবিষ্ট ঘুমে ?
জীবনগণিকা
ঘৃণ্য সংক্রামক ব্যাধি প্রসাধনে ঢেকে,
সার্বজন্য অভিসারে ডেকে
ভুলাবে কি আত্মহারা পুরাণপুরুষে ?
ভাগী হয়ে মর্ত্যের কলুষে
ষড়যন্ত্রীদের সঙ্গে সমস্বরে সেও কি রটাবে,
পৃথ্বীর বিষাক্ত স্তন পীন সুধাস্রাবে ?

রে মোহিনী,
এবারে হবে না স্থায়ী মায়ার চাতুরী।
বশীকরণের মদে উচ্ছ্বসিত নীলার পেয়ালা
ইতিমধ্যে পদান্তে লুটায় ;
উবে যায় মহাশূন্যে বুদ্বুদের চিত্রল বিলাস।
আজি আর
মুদিব না অবসাদে তমস্বস্ আঁখি ;
শর্বরীর রুগ্‌ণ মুখ ভ'রে গেলে মারী গুটিকায়
ভাবিব না উৎসুক অমরা
আমাকে ও-পার থেকে আবাত্রিকে আহ্বান পাঠায় ;
ছাড়িব না হিংসাব্রত :
গুহাবাসী নৃসিংহেরে বাঁধিব না শীলের শৃঙ্খলে,
পরাব না সভ্যতার শ্লীল ছদ্মবেশ ;
ঢাকিবারে গলিত শবের গন্ধ
রজনীগন্ধার গুল্ম করিব না শ্মশানে রোপণ ;
নারীরূপী কঙ্কালের প্রলোভনে ভুলে
বীর্যের অনন্তশয্যা পাতিব না বিকচ মশানে ;

চাহিব না পাসরিতে প্রাক্তন পিপাসা
অহরহ অনির্বাণ
ঘৃতপুষ্ট সন্তুষ্টির তপ্ত রক্ত বিনা ॥

ভগবান, ভগবান, য়িহুদির হিংস্র ভগবান,
ভুলেছ কি আজি দুঃশাসনে ?
ধেয়ে এসো রুদ্র রোষে, ধেয়ে এসো উন্মত্ত হুংকারে,
ধেয়ে এসো
এলায়ে বিশাল জটা, অরুন্তুদ অশনি আস্ফালি,
ধেয়ে এসো চণ্ড ক্ষোভে দ্বৈরথ সমরে।
দাও মোরে দাও শত্রু দাও।
সহে না সহে না আর জনতার জঘন্য মিতালি।
প্রণয়ের মমত্ববন্ধনে,
পতঙ্গের সাম্যবাদে, কৃপাজীবী ক্লীবের ক্রন্দনে,
হে ভৈরব, জীবন দুঃসহ।
দহো সৃষ্টি দহো,
শতপ্রস্থ ধরিত্রীরে নাশো,
ঊষর মরুর মাঝে স্তরে স্তরে সাজাও কঙ্কাল।
মহাকাল,
আজিকে উদ্গীর্ণ করো উদ্বেষ্টিত উপকণ্ঠ হতে
প্রাগৈতিহাসিক বিষ ;
পাতালের পথ থেকে তুলে নাও সকল অর্গল।
পদাহত ব্রহ্মাণ্ড আবার
ডুবে যাক আচম্বিতে অনাদি অমায় ॥

চাহি না মৃত্যুরে আমি ; স্বপ্নগর্ভ সেও নিদ্রাসম,
সখার সংসর্গে দুঃস্থ, আত্মীয়ের বিলাপে বিহ্বল।
হানো তীক্ষ্ণ সর্বনাশ, তীব্র ক্ষতি, বৈরিতা নির্মম ;
জুগুপ্সার শক্তি দাও, দাও মোরে নির্গুণ নির্বাণ ॥

২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৩১

জাদুঘর

এক উপবাসী কবি নাটকীয় উনিশ শতকে
অপণ্য গ্রন্থের মৌনে বলেছিল, সাক্ষী অন্তর্যামী—
"রাজন্যের কেলিকুঞ্জে শিল্পজাত উৎস নই আমি;
হেরিবে না মুখচ্ছবি রঙ্গিণীরা এ-চিত্রফলকে॥

"আমি অব্যাহত নদ, পিপাসার্ত পশুদের ক্ষুরে
যদিও আবিল, তবু চরিতার্থ আমার প্রবাহ,
ঘুচায় কর্মের ক্লেদ পল্লীস্ত্রীর সান্ধ্য অবগাহ;
চাষীরা গৃহাভিমুখী; খেয়ামাঝি তটস্থ সবুরে॥"

সে-দিন হাসায়েছিল দুর্গতের রিক্ত দৈন্যবাদ।
অন্ধকার অবরোধে বিষায়িত আজি প্রাণবায়ু;
আকাশকুসুম প'চে বাড়ে শুধু অশ্রুকূপে গাদ,
আমার উৎকর্ষ হায়, মূল্যাভাবে হয়নি চিরায়ু॥

মিসরী সমাধিসম মরুগ্রস্ত এই জাদুঘরে
রোমন্থক মহাকাল আপনারে পরিপাক করে॥

২৭ জুলাই ১৯৩২

বর্ষপঞ্চক

১

পঞ্চ বর্ষ অতিক্রান্ত। মরুপথ ধূলায় আকুলি
অচিরাৎ অন্তর্হিত জীবনের শ্রেষ্ঠ বর্ষগুলি
দৃষ্টির দিগন্তপারে, অনিশ্চিত বেদনার মাঝে,
সমাপ্ত পূরবী যেথা নির্বিকার অনুনাদে বাজে,
সম্বল হারায় স্মৃতি অসংহত প্রদোষান্ধকারে।

একদা যে-পঞ্চবর্ষ অধুনার সূচীমুখ দ্বারে
অগ্রাজি ঐক্যের ব্যূহ বেঁধেছিল, ভবিতব্য যাতে
যাযাবরবৃত্তি ভুলে ক্ষণমাত্র শিবির না পাতে
দুর্গের ধ্বংসাবশেষে, প্রত্যক্ষের পরীণাহ মেপে
যাদের সংসারযাত্রা, ভূমিকম্প প্রতি পদক্ষেপে,
জুড়েছিল অসম্পূর্ণ শতাব্দীর প্রশস্ত সোপান ;
সে-স্থাবর পঞ্চবর্ষ, তারাও কি শূন্যে ধাবমান ?
অবিচ্ছিন্ন, অবিরাম, অচঞ্চল তাদের প্রগতি.
আপাতনিশ্চলা যেন হিমনদী অন্তর্বেগবতী,
আচম্বিতে একদিন প্রলয়ের বিক্ষুব্ধ সম্পাতে
করে আত্মপ্রকটন। আজি নব বসন্তপ্রভাতে
চেয়ে দেখি অকস্মাৎ তাহাদের স্থবির প্রয়াণ
মোর স্তব্ধ যৌবনেরে দিয়ে গেছে বিনষ্টির দান
ধ্বংসের কালিমাক্লিষ্ট, নগ্ন, নিঃস্ব বৈধব্যে গোপন ॥

ভেবেছিনু নাহি ত্বরা ; তোদের সাদর সম্ভাষণ
শুনিলে চলিবে পরে। ভেবেছিনু তোরা বর্তমান,
রক্ষণশীলের শক্র, জয়দৃপ্ত, চির-আয়ুষ্মান,
নহিস ক্ষণের পান্থ ; তোদের ও-অচল গৌরব
ফুরালে পাতিব সখ্য। অতএব ভাবিনি সেদিন
লগ্ননিষ্ঠ গড্ডলিকা, জিতশ্রম, স্বাচ্ছন্দ্যবিহীন,
গমনসর্বস্ব তোরা ; অনন্তের পটে যেন আঁকা
অসীমের আজ্ঞাবহ, মুক্তপক্ষ, উদ্‌ভ্রান্ত বলাকা
তোরা ক্ষিতিনিরপেক্ষ। বুঝি নাই সেইদিন মনে
জীবনের মায়াপুরে নিরুদ্ধ স্ফটিক বাতায়নে
সবাষ্প রঙীন শ্বাস তোরাও যে ব্যাহত কালের,
নিমেষে বিলুপ্ত হবি ; অচুম্বিত কুমারীগালের
সত্রস্ত লজ্জার রাগ প্রথম প্রগল্‌ভ নিমন্ত্রণে,
তোরাও বিলীন হবি সম্ভোগের সার্থক লগনে

পাণ্ডু, শ্লথ তর্পণের নিরুপায়, নির্বীর্য শিকারে
অকস্মাৎ। নিষ্করুণ মধ্যাহ্নের প্রখর প্রহারে
তোদের সন্তাপশুভ্র হৃদয়ের মুকুরকলকে
যে-ইন্দ্রধনুর কান্তি বিচ্ছুরিত বিচিত্র ঝলকে,
কে জানিত সেইদিন হবে তার আশু পরিণাম
উন্মাদিনী বৈশাখীর প্রলয়দ, নবঘনশ্যাম,
তড়িৎতাড়িত মেঘে। কে জানিত পাঁচটি বৎসর
কালগ্রাসী বিধাতার অলক্ষিত তুচ্ছ অবসর
প্রহরাপীড়িত আঁখি একবার পালটি লবার।
কে জানিত সেইদিন ভোগাসক্ত বিরত আমার
বিলাসী অশ্রুর ধারা মুছিতে পাবে না অবকাশ;
করিতে নারিবে সাঙ্গ দীর্ণ, দীর্ঘ একটি উচ্ছ্বাস
মুহূর্তেক অবহেলি উধ্বর্শ্বাস মিলন-উল্লোল॥

২

আজি পুন প্রত্যাগত বসন্তের পুলকহিল্লোল
সগর্বে প্রচার করে চেতনের মজ্জায় মজ্জায়
নব প্রতীক্ষার বার্তা: মাঙ্গলিক নূতন লজ্জায়
হোথা ওই স্তব্ধশোক, ভ্রান্তমতি, উলঙ্গ বল্লরী
আস্বচ্ছ কপিশ বস্ত্র রিক্ত বক্ষে টানিছে শিহরি
আগন্তুক জ্যোতিষ্কের মুগ্ধ, স্থির, তপ্ত আঁখিপাতে;
সংহতির চির-অরি যৌবনের দুর্বার সংঘাতে
বিজড় প্রান্তর ওই অকস্মাৎ হয়েছে জাগ্রত
প্রাণের পরম স্পন্দে, অভিশপ্তা অহল্যার মতো,
তরুণের পদস্পর্শে উজ্জীবিত শিলাস্তূপে আজি
অঙ্কুরিছে আচম্বিতে হর্ষোত্থিত নব রোমরাজি;
কিছু না ভ্রূক্ষেপ ক'রে আত্মম্ভরি যুগের সারথি
অজ্ঞানগোচরগতি চ'লে গেছে যে-পথে সম্প্রতি
ঘর্ঘরিত রথচক্রে এঁকে দিয়ে গভীর লাঞ্ছন,
সে-পথের মর্মক্ষত ফাল্গুনের লঘু বরিষণ

সস্নেহে দিয়েছে ধুয়ে। ভুলিবার এসেছে সময়।
প্রাচীন দৌর্বল্য মোর, কম্প, লজ্জা, ক্ষয়, পরাজয়
হারায়ে আশ্রয় যাক ঝরকে ঝরকে লুটে টুটে
সর্বভুক রজনীর ব্যগ্রকুণ্ঠ রহস্যসম্পুটে,
বিস্মৃতির গুহাগর্ভে।

পশ্চিমের শ্মশান-অঙ্গনে
যে-চিতা নির্বাণমুখ অনাঙ্গিক পঞ্চভূতসনে
মূর্ত পঞ্চ বৎসরেরে একাকার করিয়া বিষাদে
স্তিমিত অরুণ তেজে আপাতত জ্বলে ভস্মাচ্ছাদে,
সৃজনবেদনাস্ফীত, পীত তার উর্বর জরায়ু
আবার কি জন্ম দিবে ক্ষণস্থায়ী অথচ চিরায়ু
অক্ষয় ফিনিক্স্-সম অভিনব বৎসরপঞ্চকে ?
তাহারাও আসিবে কি বিজয়ের শূন্য প্রপঞ্চকে
অর্গলিত দুর্গ সম অবরোধ করিতে আবার ?
সংকীর্ণ আকাশ মোর উদ্ভাসি সদর্পে পুনর্বার
তাহাদের বৈজয়ন্তী আস্ফালিবে বহুবর্ণচ্ছটা ?
আসিবে কি পুনরায় স্বার্থসিদ্ধি, কুহকী কুলটা,
মিসরসম্রাজ্ঞীসম বিলাসের অপাঙ্গ ইঙ্গিতে
ভাঙিতে উদীর্ণ ব্রত ; তনিমার সলীল ভঙ্গিতে
আত্মদানবিনিময়ে করিবে কি স্মিত অঙ্গীকার
সে-তপ্তকাঞ্চন দেহে নিমেষের মত্ত অধিকার ?
মনোজ্ঞ মৃত্যুরে পুন ল'য়ে তারা আসিবে কি সাথে,
স্নিগ্ধ, শান্ত, শ্যাম কান্তি, বাঁশের বাঁশরী বাঁকা হাতে,
করুণ তরল হাস্যে নির্বাণের নিঃশঙ্ক আশ্বাস ?
পথাশ্লিষ্ট-শূন্য-আঁখি, ক্ষিপ্র-পদ, সঘন-নিঃশ্বাস,
আসিবে দুরন্ত প্রেম, টংকারিত কুসুমকার্মুকে
অলক্ষ্যসন্ধানী শর সংস্থাপিয়া চপল কৌতুকে
হানিতে নিখিলব্যাপী দুরারোগ্য, দুর্বিচার ক্ষত ?

৩

এ-জিহ্বু সেনার পাছে, জানি জানি, আজিকার মতো
ভ্রমিবে কবন্ধমুখ, অন্ধকার, ত্রস্ত বিভীষিকা,
নৈর্ব্যক্তিক হাহাকার, ভ্রান্তিসার, শূন্য মরীচিকা,
মড়ক কঙ্কালশেষ, বিকলাঙ্গ গতানুশোচনা,
অক্ষম ক্রোধের দাহ, নিকারণ অতৃপ্তিযন্ত্রণা,
রুদ্ধ আত্মধিক্কারের ধূমায়িত, খিন্ন তুষানল।
পলক ফেলার আগে সে-নবীন বিজেতার দল
পঞ্চ বৎসরের শেষে বিনাবাক্যে হবে অন্তর্ধান
আসন্ন আঁধারে পুন। দুর্নিবার তাদের প্রয়াণ
সময়ে হবে না লক্ষ্য। সেদিনেও অশ্রুনত চোখে
অচপল ব'সে রব অবলুপ্ত অতীতের শোকে
উপেক্ষিয়া স্থলগন। তার পরে কেটে গেলে বেলা
হঠাৎ পড়িবে মনে করিয়াছি পুন অবহেলা
দ্বারাগত অতিথিরে। আর বার শিরে কর হানি
অসম্পূর্ণ অভ্যর্থনা, অসমাপ্ত পরিচয়খানি
বেদনাবিলাসী বক্ষে বর্মসম ধরিব গৌরবে।
পুন মোর বন্ধ দ্বারে বসন্তের বৈতালিক যবে
উচ্চারিবে আবাহনী, নিবৃত্তির আত্মপরসাদে
রুদ্ধ ক'রে রব শ্রুতি। সেদিনেও অন্ধ পরমাদে
ব্যর্থতারে শ্রেষ্ঠ ব'লে মনে মনে করিব নিশ্চয় ;
ভাবালু সংগীতে পুন পরাস্তের দুর্জ্জেয় বিজয়
চাহিব ঘোষিতে মর্ত্যে ; স্বেচ্ছাপঙ্গু ঘৃণ্য নিরাশারে
অসংকোচে দিব নতি ; নিশ্চেষ্ট বাচাল অহংকারে
ক্লৈতীর পবিত্রাসনে করিব ক্লীবের অভিষেক ;
রক্তগর্ভা-প্রতি হানি বিষতিক্ত বিদ্রূপ শতেক
ভাবিব মহৎ' বুঝি নিরিন্দ্রিয়া বন্ধ্যার সংযম ;
ভবিষ্যের মৈত্রীবাহী অধুনা-দূতের সমাগম
হেলায় নিষ্ফল ক'রে সহনীল অদৃষ্টের 'পরে
অর্পিব সমস্ত দোষ, রুদ্র যবে রুষ্ট মূর্তি ধ'রে
হানিবে নিষ্ঠুর বজ্র।

এই ভাবে কেটে যাবে কাল।
জরান্ধ, নির্দয়ছায়া নিয়তির বাহুর আড়াল,
নির্বল, নির্ভরশীল, নিরুপায় দুলালের মতো,
আমারে বেষ্টন করি দূরে দূরে রাখিবে নিয়ত
পতন ও অভ্যুদয়ে যেই পন্থা হয়েছে বন্ধুর,
সে-পথের প্রান্ত হতে। গৃহকোণে ব্যর্থশ্রমাতুর,
ক্ষতির সহিত ক্ষতি, অপচয়সনে অপচয়
যোগ দিতে দিতে মোর সুদীর্ঘ জীবন হবে ব্যয়
অখ্যাতির অবচ্ছায়ে। ঘটিবে না কোনওখানে ত্রুটি :
বিদ্রোহের ঝঞ্ঝাবাতে বিজ্ঞতার সতর্ক দেউটি
হবে না নির্বাণ কভু নপুংসের নির্বিঘ্ন ভবনে।
যে-অতীত চুপে চুপে আয়ুটুকু কাটায়ে ভুবনে
অকীর্তির অন্তরালে অবশেষে লভিছে বিশ্রাম,
নগণ্য সুকৃতি যার, অবজ্ঞেয়, নশ্বর দুর্নাম
ঐতিহ্যের স্মৃতিস্তম্ভে কোনও কালে নাহি হবে লেখা
গভীর অক্ষরে, তারই নিভৃত পদের ভৃগুরেখা
শুধু মোর হৃদয়ের ক্রমশুষ্ক ফলকে গোপন
হয়ে রবে সদাপূজ্য, হয়ে রবে চির চিরন্তন॥

১২ ফাল্গুন ১৩৩৪

বর্ষাপ্রেম

দহনক্লান্ত দুপুরবেলার ঝাঁজে
অন্যমনে চলেছিলুম রিক্ত পথের মাঝে।
ছিল নাকো অন্তরে আর আশা ;
দুঃস্থ মাথার চিন্তাগুলো কণ্ঠে খুঁজে পাচ্ছিল না ভাষা ;
হচ্ছিল বোধ অবুঝ হৃদয়খানা
কুলায়বিমুখ চিলের মতো মুক্তাকাশে প্রসার ক'রে ডানা

দিচ্ছে পাড়ি মৃত্যু-অভিযানে
আত্মঘাতী ঊর্ধ্ব রবির অগম চিতার পানে ;
বক্ষে থাকি
চমকে ওঠে শূন্যতা আর কল্পনাশা বাকি
আত্মগ্লানির ঘূর্ণিবেগে আপনাকে দেয় উড়িয়ে দিগন্তরে
যেথায় অবিরত
নেচে নেচে গাজনপাগল বৈরাগীদের মতো
দশা পেয়ে শীর্ণ হাওয়া মরে।
এমন সময় আড়াল থেকে রঙ্গনিপুণ নাগরিকার প্রায়
প্রাণদেবতা হঠাৎ ছুঁড়ে মারলে আমার গায়
পীত-লোহিতের চূর্ণমুঠি গুলমোরের ফুলে।
চমকে উঠে দেখলুম চোখ তুলে ;
মনে হল পত্রবিরল গাছের অন্তরালে
কোন্ চরণের সোনার নূপুর বেজে বারেক নাম-না-জানা তালে
লুকিয়ে গেল ধরা পড়ার আগে ;
রোমাঞ্চিত হল শরীর কিসের অনুরাগে।
জানি না সে স্বপ্ন কিনা ; কিন্তু যদি স্বপ্ন ব'লেই মানি,
নয় কি আরও অসার স্বপন আর বছরের শুকনো মালাখানি ?

১৪ মার্চ ১৯৩১

প্রতর্ক

(শ্রীবসন্তকুমার মল্লিকের করকমলে)

দেশে দেশান্তরে
উদ্দীপ্ত যৌবনখানি অপচয় ক'রে
এসেছে মুমূর্ষু দিবা লুপ্তকীর্তি নর্তকীর প্রায়
অক্ষম জরার লজ্জা লুকাতে হেথায়,
জগতের এ-অখ্যাত কোণে॥

মোর মনে
হয়তো বা শান্তি নেই তাই।
তাই বুঝি বোধ হয় নিতান্ত বৃথাই
অন্ধকার বন্ধ ঘরে শ্বাস টেনে বাঁচা কোনও মতে ;
উন্মার্গ হয়েছে নদী, বর্জিত এ-শ্মশানসৈকতে
নির্বিকার ঊষরতা শুধু ;
যতদূর দৃষ্টি যায় করে ধু ধু
ভ্রাম্যমাণ পিঞ্জরের দুর্লজ্ঘ্য প্রসার
নিঃসঙ্গ, নির্বাক, নিরাকার।
মনে হয়
শুনি যেন অহোরাত্র প্রতিধ্বনিময়
আত্মাপুরুষের কান্না নীরবের ফাটলে ফাটলে ;
কি জানি কে বলে—
"খোলো, খোলো অলক্ষ্য দুয়ার,
হয়ে গেছে পার,
সহনীয়তার সীমা পার হ'য়ে গেছে বহুক্ষণ ;
অস্থানের মুক্তির লগন
সূর্যাস্তের স্বর্ণসম ভস্ম হবে চোখের নিমেষে॥"

তাই মোর দার্শনিক বন্ধু যবে এসে
জ্ঞানসুগম্ভীর কণ্ঠে আরম্ভিল তত্ত্ববিশ্লেষণ,
হল না তো তখনও বচন
অভ্যস্ত সখ্যের সেতু মোদের বিজন ব্যবধানে॥

সে কহিল—"মরুগ্রস্ত, রুদ্ধ প্রেতস্থানে
হানি তীক্ষ্ণ মর্মক্ষত উর্বরতা আনে হলধর।
অমৃতের পুত্র মোরা ; জন্ম-জন্মান্তর,
নন্দনের প্রতিশ্রুতি বুকে,
অভুক্তিত ভূমিসম প'ড়ে আছে মোদের সম্মুখে।

আজিকার ক্লেশ,
এ-বিরোধ, বিসংবাদ, এই নিরুদ্দেশ,
এ-সকলই পরীক্ষা কেবল।
উন্মথি সুখের স্মৃতি সর্বনাশা যেই হলাহল
সৃষ্টি করে সুরাসুরে জীবনের প্রতি সন্ধিক্ষণে,
ত্রিভুবনে
সে-বিষের জ্বালা হতে নেই নেই কাহারও নিস্তার;
তারই পুরস্কার
অমোঘ সাযুজ্য, ঐক্য মৃত্যুঞ্জয় নীলকণ্ঠ-সাথে।
হয়তো বা হাতে হাতে
দক্ষিণান্ত হয় না মোদের,
জীবনের প্রসর্পণ হয়তো বা পথে বিকল্পের।
কিন্তু যার পরমায়ু অমেয়, অক্ষয়,
দুর্গ্রহের উপদ্রব তার কাছে নগণ্য কি নয়?
একাধিক শতাব্দীর বৈফল্য, নৈরাশ,
শাশ্বতের তুলনায় তাহা যেন সংক্ষিপ্ত নিঃশ্বাস
দ্রুতগামী সোপানারোহীর।
ভ্রমান্ধ যে, সে কেবল আতুর, অধীর,
অনন্তের প্রকৃতিরে কোনও মতে বুঝিতে না পেরে
পথকষ্টে মৃতপ্রায় কেন্দ্র খুঁজে ফেরে।
শুধু আস্থা আর সহিষ্ণুতা,
সৃষ্টির রহস্য মাত্র এই দুটি সনাতন কথা॥"

আরও কত ব'লে গেল সে যে।
মোর জীর্ণ সংস্কারের ছিন্ন তারে বেজে
সে-তর্কের অনুনাদ মুখরিল নিষ্ক্রিয় মস্তকে।
কিন্তু মোর স্মৃতিসিক্ত চোখে
ঘনীভূত প্রদোষের বিদেশী নীলিমা
এ-বাঙ্ময় প্রকোষ্ঠের ক্ষুদ্র চতুঃসীমা
অনায়াসে দিল লুপ্ত ক'রে।

শরীর রহিল হেথা, সপ্ত সিন্ধু পলকে সন্তরে'
আত্মা বেগবান
অচেনা নগরীচূড়ে সংগোপনে করিল প্রয়াণ ॥

যুগান্তে একদা সেথা আমরা দু জনে
কল্পনার স্তূপ দিয়ে গড়েছিনু প্রসন্ন গগনে
অসম্ভব দুরাশার উদ্ধত পাহাড় ;
দুরারোহ নিরালায় তার
আকাশকুসুম তুলে পেতেছিনু ভাবী ফুলশেজ।
সে-দুর্ধর্ষ বিশ্বাসের নাক্ষত্রিক তেজ
নির্বাণ চন্দ্রের মতো মৃত্যুহিম আজিকে বিতরে ;
বিশ্বব্যাপ্ত অভাবের অতল বিবরে
অন্তরিত সে-সন্ত্রাস্ত বিরহের দৃপ্ত সহিষ্ণুতা ;
সে-দীপ্র বেদনা অনাহূতা
লাগে নাই আত্ম-পর কারও উপকারে ,
শুধু আপনারে
করেছি একেলা, নিঃস্ব অপ্রস্তর পরিখার মাঝে ॥

সেদিনও যে নিরুপাধি সাঁঝে
এমনই চৈনিক নীল রেখেছিল ঘিরি
অন্তরঙ্গ ঘটাটোপে অবিচল সে-মানসগিরি।
তাই জানি, ও-দিব্য বরণ
নহে শাশ্বতের কান্তি ; ও যে প্রাবরণ
নিরাশ্বাস, নিরর্থ শূন্যের।
হে বন্ধু, তাইতে তব তত্ত্বদর্শনের
পরিক্ষিপ্ত যুক্তিজাল বাঁধিবারে পারে না আমায়।
যদিও বা ক্লান্ত বুদ্ধি মাঝে মাঝে তর্কে দেয় সায়,
তবু মোর উপজ্ঞা গভীর
জানে স্থির

অনন্ত, অমৃত তব মায়া, মিথ্যা মায়া।
সম্ভবত তার চেয়ে সত্য এই অতীতের ছায়া।
১৩ জুন ১৯৪২

কাল

কিছুরই কি নেই অব্যাহতি ?
জীবনের মরুপ্রান্তে-স্মরণের অখ্যাত বসতি,
তারেও করিবে ছারখার
রক্তলোভাতুর তব দিগ্বিজয়ী শকট দুর্বার
হে কাল, হে মহাকাল ?
অতিক্রান্ত উৎসবের উচ্ছিষ্ট জঞ্জাল,
পলাতক পৃথ্বীশের নগণ্য পাথেয়,
প্রয়োজন তোমার তাতেও ?
তব ক্ষুধা
অক্লেশে করেছে জীর্ণ আমার বসুধা।
কীর্তিস্তম্ভসংবলিত সসাগর সাম্রাজ্যে আমার
নিরুৎপাদ প্রতিধ্বনি করে হাহাকার।
ভস্মশেষ পারিজাতবনে
উন্মথি পাংশুল ধূলি মাথা খোঁড়ে ব্যর্থ অন্বেষণে
চারণ মলয় আজ অমৃতের আমন্ত্রণ ল'য়ে।
চূর্ণ দেবালয়ে
তোমার যবনসেনা রেখে গেছে পদাঘাতরেখা
মোর কুলদেবতার বুকে।
আমি একা, আজ আমি একা।
আমার বাসবজয়ী ভয়াল কার্মুকে
খণ্ডিত তারণ গুণ উচ্ছৃঙ্খলা স্বৈরিণীর দ্রোহে।
আত্মর কলহে

দিয়েছে কুটুম্ব, বন্ধু প্রাণবলিদান।
শূদ্রের অলক্ষ্যভেদে নিহত আমার ভগবান॥

তবে আজ কিসের আশায়
অজ্ঞাত শিবিরদ্বারে এসে পুনরায়
অক্ষুযাত্র সঙ্গে ক'রে, রুদ্র রোষে আস্ফালি কুলিশ ?
স্তব্ধ রাতে
শোকাবহ শিশিরসম্পাতে
মোর ফণিমনসায় ধরিল যে-অপুষ্পক শীষ
এ-বিস্মৃত মরুভূর অনামিক কোণে,
ধ্বংসসার, দুর্গম নির্জনে,
তাতেও তোমার লোভ, তাতেও তোমার প্রয়োজন ?
সর্বস্বান্ত কৃপণের শেষ সঞ্চয়ন
ওই কটা মূল্যহীন, নিরানন্দ, কণ্টকিত স্মৃতি।
চৌদিকে বিরচি ওই সংভ্রান্ত বৃতি
মেয়াদ কাটায় দিশে ম্রিয়মাণ অহমিকা মম।
ক্ষমো, ওরে ক্ষমো,
ওটুকু স্বত্বেরে আজ দাও অব্যাহতি।
হে রুদ্র, হে ভয়ংকর, হে দুর্ধর্ষ ত্রিলোকের পতি,
হবে না নির্ভার
ও-তিলেক কৃপাক্ষয়ে অক্ষয় ভাণ্ডার॥

মিছে চাওয়া, মিছে এ-মিনতি,
তোমার সংহার হতে নেই নেই কারও অব্যাহতি।
নিরুত্তর, সবই নিরুত্তর ;
কেবল শূন্যের মৌনে ধাবমান রথের ঘর্ঘর
অনির্বেদ অট্টহাসি হেসে,
উড়ায়ে রঞ্জিত ধূলি বিলুপ্তির সীমান্তরে মেশে॥

১৯ জানুআরি ১৯৩২

অকৃতজ্ঞ

আমার মৃত্যুর দিনে কৌতূহলী প্রশ্ন করে যদি –
সাধিলাম কী সুকৃতি, হব যার প্রসাদে অমর ?
মেনে নিও মুক্ত কণ্ঠে, নেই মোর পাপের অবধি ;
সারা ইতিহাস খুঁজে মিলিবে না হেন স্বার্থপর ॥

অজস্র ঐশ্বর্য মোরে অর্পিয়াছে সমুদার বিধি ;
ভুঞ্জেছি নিষ্কুণ্ঠ মনে সে-সকলই প্রাপ্য ভেবে আমি ।
পেয়েছি অমিত সুধা আমন্থিয়া কালের বারিধি ;
করেছি তা আত্মসাৎ, শুধু বিষ কণ্ঠে গেছে থামি ॥

দেখেছি এ-মরচক্ষে নটরাজ মহাশূন্যে নাচে ;
শুনেছি পার্থিব কানে সে-নক্ষত্রনূপুরের ধ্বনি ।
তথাপি আমার বীণা বাজায়েছে বেসুর পিশাচে ;
অধরার অনুনাদে সাড়া কভু দেয়নি ধমনী ॥

ফাল্গুন অঙ্গনে মোর ছড়ায়েছে অশোক পলাশ ।
দক্ষিণের বাতায়নে কৃষ্ণচূড়া হেনেছে বৈশাখ ।
জাগায়ে মেদুর মেঘে চপলার চকিত বিলাস
বিকচ কদম্বকুঞ্জে আষাঢ় দিয়েছে মোরে ডাক ॥

শেফালীরঞ্জিত হস্তে নবান্নের নৈবেদ্য এনেছে
অতিক্রমি কাশবন সিতাম্বর শ্যামল আশ্বিন ।
কাননে ছড়ায়ে সোনা উদাসী অঘ্রান চ'লে গেছে ।
পৌষের পাথেয় দিতে সর্বহারা হয়েছে বিপিন ॥

তথাপি অভাব মোর মিটে নাই মুহূর্তের তরে ;
অপব্যয়ী প্রকৃতির অরক্ষিত দানসত্র হতে
অপহরি মহাবিত্ত আনিয়াছি বৎসরে বৎসরে
অন্তর্ভৌম কোষাগারে মরুলুপ্ত সুড়ঙ্গের পথে ॥

সে-উদার দৃষ্টান্তেও হয় নাই কার্পণ্য লজ্জিত,
সন্দেহের অবকাশ পায় নাই গৃধ্নুতা আমার।
ফিরেছি ধনীর দ্বারে অপলাপী চীবরে সজ্জিত,
বলেছি নাটকী স্বরে, বিশ্বে শুধু সত্য অবিচার॥

অন্তরঙ্গ সখাসম ফুলধনু আমার ইঙ্গিতে
ফুটায়েছে পারিজাত হিমরুক্ষ তুঙ্গ তপোবনে ;
স্বয়ংবরা শৈলসুতা এসেছে কৌমার্য নিবেদিতে ;
টুটেছে দুঃস্বপ্ন মোর ব্রহ্মাণ্ডের মঙ্গলাচরণে॥

তবু মোর নীল কণ্ঠে উঠে নাই কামোদ ঝংকারি ;
অনভ্যস্ত রসনায় উৎসরিত হয়নি দীপক।
মোর প্রিয়সম্ভাষণে বিরহের আশঙ্কা সঞ্চারি,
অন্তরের দ্বার জুড়ে হেসেছে অশ্লীল বিদূষক॥

গোপন বৈভব আমি ব্যক্ত কভু করিনি প্রিয়ারে ;
বুঝি নাই বিনিময়, বিনা বরে কুড়ায়েছি পূজা ;
অভিব্যাপ্ত ক্ষুধা মম অবরোধে ঘিরেছে তাহারে ;
পরিতৃপ্তি বিতরিতে পারেনি স্বয়ং দশভুজা॥

নিমেষ না যেতে তাই ফুরায়েছে প্রথম আবেশ ;
উন্মীলিত বিলোচন জ্বলিয়াছে বিপ্রলব্ধ লোভে,
অচিরাৎ সে-আগুন কামেরে করেছে ভস্মশেষ ;
অপর্ণা সেজেছে চণ্ডী আত্মহিতে মোর উপদ্রবে॥

কেবলই চেয়েছি আমি, ক্ষতি কভু ছোঁয়নি আমারে ;
কোনওদিন বজ্রাঘাতে সর্বস্বান্ত করেনি উর্বশী ;
মোর তারাদীপাবলী মূলাধার অমার ফুৎকারে
কখনও যায়নি নিবে, ধ্বংসমুখ হয়নি ক্রন্দসী॥

শিখিনি কদাচ আমি কাম্য যার নিশ্চিন্ত অমরা,
অনির্বাণ কুম্ভীপাকে হ'তে হয় তাহারে নিখাদ।
শুধুই জঞ্জালে তাই ভরিয়াছি প্রাণের পসরা ;
গায়ত্রী জপেছি, কিন্তু শোনা গেছে নিরর্থ নিনাদ ॥

আমার মৃত্যুর দিনে তাই যদি অলস জিজ্ঞাসু
মাগে শবপরিচিতি, বিনা ভাষ্যে বোলো তারে, সখা,
জগতের কোনও কাজে লাগেনি এ-অখ্যাত গতাসু,
যায়নি অনাথ ক'রে কোনও মৌন হৃদয়-অলকা ॥

২৩ জুন ১৯৩২

লঘিমা

পাষাণে প্রিয়ার দ্বার দেখিলাম ঊর্ধ্বমুখে চাহি –
শীর্ণকায় শুক্ল শশী অগাধ তিমিরে অবগাহি,
ফিরে গেছে বহুক্ষণ আপনার অখ্যাত আবাসে
অতিক্রমি চক্রবাল ; গুপ্তগতি কালস্রোতে ভাসে
বেপমান তারাদল বেগজাত বুদ্বুদের প্রায় ;
মাঝে মাঝে মজ্জমান মুহূর্তের বিক্ষোভ জানায়
আবর্তিত নীহারিকা ; নিরুদ্দেশ কোন্ লোক হ'তে
কাহার সোনার তরী অজানার অদৃশ্য সৈকতে
নিঃশব্দে গিয়েছে চ'লে প্রস্ফুরিত ছায়াপথ এঁকে
রজতক্ষেপণীস্পর্শে ; ধরণীরে সুখসুপ্ত দেখে
যেন কোন্ চিরচোর অরক্ষিত মহাবিত্ত তার
হয়েছে অন্দরে প'শে ; নিদারুণ সেই দস্যুতার
সাক্ষী নেই জনপ্রাণী, শুধু ওই বৃদ্ধ বনস্পতি
মুহুর্মুহুঃ জটা নেড়ে ব্যক্ত করে কী নিষ্ঠুর ক্ষতি
দুর্ধর শৈশবসখা বিকলাঙ্গ বায়ুর নিকটে ॥

জানি না প্রাকৃত ভাষা, তাই যবে মোর কর্ণপটে
ক্ষণে ক্ষণে হানা দেয় অন্তরজ সেই গুঞ্জরণ,
মিলে না বুদ্ধির সাড়া, শুধু মোর নিগূঢ় চেতন
ভ'রে ওঠে অকস্মাৎ নিরুপাধি কিসের বিলাপে ;
জাতিস্মর জৈব কণা মর্মে মর্মে থরথর কাঁপে
অব্যক্তির যন্ত্রণায় ; শোকাবহ কোন্ ইতিহাস
উন্মথিত করি তোলে কবেকার রুদ্ধ দীর্ঘশ্বাস
দুষ্প্রবেশ বিস্মৃতির প্রতিধ্বনিপ্রচ্ছন্ন গহ্বরে ॥

আচম্বিতে চিত্ত মোর কী অমর্ত্য সংক্রামে শিহরে—
মনে হয় স্বার্থপর, অকিঞ্চন, উঞ্ছজীবী আমি,
আমার ইতর লোভে অমৃতবঞ্চিত অন্তর্যামী
বুভুক্ষায় মরে আজ ; মনে হয় এ-ক্ষুধার পাশে
তুচ্ছ মোর চাওয়া-পাওয়া ; বিচঞ্চল অসীম আকাশে
বিকীর্ণ যে-সর্বনাশ, তার মাঝে হারায় হঠাৎ
মোর উল্লাসের অর্থ ; মূল্যহীন হয় অচিরাৎ
যে-দান অনতিপূর্বে সুদক্ষিণ প্রেয়সীর কাছে
পেয়েছি তপস্যাবলে ; ভয় পাই নেহারিতে পাছে,
মনে হয় চাহি যদি দীপান্বিত বাতায়নপানে,
তারে দেখিব না সেথা, নিরখিব নির্বোধ নয়ানে
ক্ষণপ্রাণ প্রজাপতি ম্রিয়মাণ প্রদীপেরে ঘিরে
ঘুরে যেন মর্ত্যনাচে ॥

নাস্তিগর্ভ প্রাক্তন তিমিরে
আমার স্বতন্ত্র সত্তা হতে থাকে ক্রমাগত ক্ষয় ;
ফুরায় ইন্দ্রিয়বোধ ; মূক হয় বাচাল হৃদয় ;
শুধু শ্রুতি জেগে রহে। মহামৌনে শুনি অকস্মাৎ
বিনষ্ট বিশ্বের প্রান্তে কোথা যেন কালের প্রপাত
উল্বণ রভসে নামে অনন্তের উন্মুদ্র অতলে।
কণিকাও নহি আমি ; চরাচর লুপ্ত সে-কল্লোলে ॥

১৫ জুলাই ১৯৩০

বিরাম

বায়ুকোণের বাতায়নে ব'সে
তাকিয়ে আছি দিগন্তরে উদাস চক্ষু মেলে।
শূন্য মনে
ঘুরে বেড়ায় আকুল হয়ে ক্ষণিক খুশির খামখেয়ালী ছবি
শরৎসাঁঝের নকশাবহুল খণ্ডমেঘের মতো।
পিছলে-পড়া খোলা কেতাবখানার
কয়েক পাতা দুমড়ে গিয়ে উলটো-পালটা চটিজুতোর পাশে
হচ্ছে ধুলোয় মাখামাখি;
সামর্থ্য নেই কুড়িয়ে নিয়ে ঝাড়ার।
মাঝে মাঝে ভিতর-বাড়ি থেকে
যাচ্ছে শোনা ধমক-ধামক, গৃহস্থালির আওয়াজ ছোট-খাট।
ক্ষণে ক্ষণে উজান হাওয়া বেয়ে
বল্‌খেলোয়াড় ছেলের দলের বিজয়কোলাহল
আসছে ভেসে পোড়ো মাঠের থেকে।
সামনের ওই খাপরা-ছাওয়া বস্তিখানার চালে
ধোঁওয়ার কারিকুরি
দেখায় ঠিক তেমনিতর
যেমন, ধরো, তাপ্পি-দেওয়া ফোতোবাবুর কাঁধে
নিলেম থেকে দাঁওয়ে কেনা ঘরোওয়ানার আসল জামিওয়ার॥

শান্তি, নির্ভাজ শান্তি চতুর্দিকে।
অহর্নিশি-অসন্তুষ্ট শহরখানা যেন
প্রাণধারণের নিছক সুখে হাহুতাশে হঠাৎ উদাসীন।
সন্ধ্যাপরীর জাদুর ছোঁওয়াচ লেগে
এমন-কি সব আধি, ব্যাধি কিছু ক্ষণের জন্যে ঝিময় আজ॥

জানি জানি মুহূর্তেকেই জাগবে কলিকাতা;
চলবে চাকার ঘড়ঘড়ানি, পথে পথে জ্বলবে গ্যাসের আলো,

দোকান-পাটে আবার শুরু হবে
দর-করা আর চেঁচামেচি, গলি-ঘুঁজির ধারে
খড়ি-মাখা বেশ্যারা ফের কাষ্ঠ হেসে থাকবে পেতে ওৎ
ছাত্র, মাতাল, মজুর, কুলির আশায়,
ভিক্ষা মেগে মেগে
ফিরবে আবার ঠক, জুয়াচোর, কানা, খোঁড়া, কুষ্ঠরোগীর দল ॥

নিমেষ পরে
আমার মনেও অধৈর্য ফের আসবে ফিরে, জানি,
আরোগ্যহীন রোগের বিষে ছটফটিয়ে উঠবে আবার দেহ,
এই নিরালা স্বপ্নমগন ঘর
লাগবে অন্ধকূপের সমান, ঘরকন্নার খুঁটিনাটি
জগদ্দলের মতো
বসবে চেপে বুকের উপর, মনে হবে শ্বাসচলাচল দায়।
মৃত্যুকে ফের অচল ভেবে, জানি,
দেব আবার তাড়া, তাগিদ, ত্রাহি-স্বরে করব ডাকাডাকি ॥

কিন্তু তবু এই গোধূলিবেলায়,
বহুরূপী রঙের খেলা চোখের আগায় চলছে যত ক্ষণ,
সাঁচ্চা কেবল হালকা হাওয়া বক্ষে পুঁজি করা,
নেহাৎ মেকী ভুভাবনাগুলো।
রাত্রে যেমন উধাও নদীর স্রোতে
আঁধার-ছাওয়া নাওয়ের বাতি হেথায় হোথায় ঝকমকিয়ে উঠে
নিরুদ্দেশে হয় পলকে লোপ,
তেমনি ফাঁকি কান্না, হাসি, সাধ্য ও সাধ, আকাঙ্ক্ষা, নৈরাশ,
চাওয়া, পাওয়া, সিদ্ধি, প্রবঞ্চনা ॥

সত্য কেবল বাঁচা, কেবল বাঁচা,
সত্য কেবল পশুর মতো মনের বালাই ঝেড়ে ফেলা বাঁচা,
বাঁচা, কেবল বাঁচা ॥

৪ জুলাই ১৯০২

প্রশ্ন

ভগবান, ভগবান, রিক্ত নাম তুমি কি কেবলই ?
নেই তুমি যথার্থ কি নেই ?
তুমি কি সত্যই
আরণ্যিক নির্বোধের ভ্রান্ত দুঃস্বপন ?
তপন্ত তপন
সাহারা-গোবির বক্ষে জ্বলে না কি তোমার আজ্ঞায় ?
চোখের ইঙ্গিতে তব তমিস্রা করাল
ভারাক্রান্ত গগনেরে করে না কি স্বচ্ছন্দে নিক্ষেপ
উন্মত্ত, উদ্বেল আংলাস্তিকে ?
স্তব্ধ গৌরীশংকরের বুকে
দিগম্বরী ঝঞ্ঝা, সে কি বাজায় না তোমার বিষাণ
তাণ্ডবের উন্মথ হিন্দোলে ?

ক্ষমা ! ক্ষমা ! ক্ষমিতে কি জানি না আমরা ?
মোরাও কি অন্যমনে তাকাই না নীরব আকাশে
অসিধৃত বাহুবল যবে
বিচ্ছিন্ন হৃদয় ল'য়ে করে তুচ্ছ খেলার কন্দুক ?
দেখি না কি মোরা নির্বিবাদে
লুব্ধ দুঃশাসন
কামার্ত সভার মাঝে কেড়ে নেয় বুকের বসন
অসূর্যম্পশ্যরূপা পরানপ্রিয়ার ?
নিরিন্দ্রিয় অহিংসার ব্রতে
মোরা কি যাই না ছুটে কশাহত গড্ডলিকাসম
রক্তলোভাতুর যূপে পাতিবারে নিরীহ মস্তক ?
আমাদের অপৌরুষ করে না কি ক্ষমা
গূঢ় নিষাদের হাতে বারংবার তোমার নিপাত ?
মোরা কি জানি না
তিতিক্ষা, মার্জনা,

সে কেবল
নিরুপায় নির্জিতের স্বগত প্রবোধ,
অক্ষমের অন্তিম সম্বল ?

যাযাবর আর্যের বিধাতা,
হুংকৃত পিনাক আজ বিরাজে কি ইন্দ্রধনুমাঝে ?
মৃত্যুঘন প্রগল্‌ভ দম্ভোলি
পরিণত অমায়িক কুসুমসায়কে ?
কেবলই কল্যাণ !
কেবলই কল্যাণ !!
শুধু ধৈর্য !
অন্তহীন সহিষ্ণুতা শুধু !
অদৃশ্য, অস্পৃশ্য শূন্য হতে
কিন্নরীনিন্দিত কণ্ঠে কত্র, কম্প্র করুণার বাণী—
ক্ষমা করো,
ক্ষমা করো দুর্বৃত্তের জিঘাংসু অজ্ঞান !

হায়, ভগবান,
হায়, হায়, ব্যর্থ ভগবান,
তোমার অমিত ক্ষমা, সে কি শুধু অসুরের তরে ?
কিন্তু যারা প্রহরে প্রহরে
উৎসর্গিছে অকাতরে অতিমূল্য প্রাণ
সুপ্রতিষ্ঠ করিবারে মরলোকে সিংহাসন তব,
তারা অবজ্ঞার পাত্র ?
তারা নয় আত্মীয় তোমার ?
যারা সব ত্যজি,
আপন ধমনী ছেদি সিঞ্চিয়াছে রুক্ষ মরুভূমি
অঙ্কুরিতে সোনার স্বপন,
নাই তাহাদের দাবি ও-কৃপণ করুণাকণায় ?

তৃষিত বালুতে
সদ্‌গতি-সৎকারহীন তাহাদের শব
শকুনির ভোজ্যমাত্র ?
তাহাদের ক্ষয়িষ্ণু কঙ্কাল
সর্বংসহা ধরণীর বর্ধমান জঞ্জালের বোঝা ?

এ-নিষ্ঠুর অপচয়,
এর পাছে আছে অভিপ্রায়,
আছে কি আকূতি ?
হেথা যারা পরাজিত, বৈকুণ্ঠে তাদের হবে জয় ?
তোমার স্মারকস্তম্ভে অমর অক্ষরে
লেখা রবে তাহাদের নাম ?
নাম — শুধু নাম !

কোন্ ফল সে-অমৃতে ?
পারিবে কি তাহা ফিরে দিতে
পৃথিবীর জল-বায়ু, রৌদ্র-ছায়া, সিদ্ধি ও সাধনা ?
ধ্বংসশেষ প্রমোদের কণা
অখণ্ড হবে কি পুন সে-দিব্য পরশে ?
অনন্তের সঞ্জীবনী রসে
মিলিবে কি প্রতিদান
উপেক্ষিতা পার্থিবার মুখমদিরার ?
হায়, ক্ষেমংকর,
অজস্র মঙ্গল তব পারিবে কি করিতে সুন্দর
অবরুদ্ধ যৌবনের জীবন্ত মৃত্যুরে ?
আজিকে আর্তের কাছে পারিবে কি করিতে প্রমাণ
নও তুমি নামমাত্র ;
তুমি সত্য, তুমি ধ্রুব, ন্যায়নিষ্ঠ তুমি ভগবান ?

১৮ জানুআরি ১৯৩২

প্রতীক

মিলের ধোঁওয়ায় ঢাকা শরতের নীল নভস্তল,
নগরের আবর্জনা জাহ্নবীর পুণ্য স্রোতে ঘুরে।
ছুটি-পাওয়া মসিজীবী দল বেঁধে করে কোলাহল,
পরিক্ষিপ্ত পরচর্চা বিষায়িছে বিমুক্ত বায়ুরে॥

তুমি আর আমি দোঁহে ব'সে আছি স্টীমারের কোণে
অপ্রতিভ, অপাঙ্‌ক্তেয়, অনাহূত অতিথির মতো।
জানি না কী ভাব জাগে তব মৌন চিত্তের গহনে,
ভিড়ের সংসর্গ মোরে করে সদা নৈঃসঙ্গ্যবিব্রত॥

তাই ধায় স্মৃতি মোর অতীতের নির্বিন্দ্রিয় লোকে,
ছায়াতরীনিমগ্নিত, মরুমুখী প্রেতনদীপানে,
নির্বাক বৈদেহী এক মেঘাচ্ছন্ন চন্দ্রের আলোকে
সাযুজ্যের মূলমন্ত্রে দীক্ষা দিল আমারে যেখানে॥

সে-নিগম সাধনায় হয়তো বা ঘটেছিল ত্রুটি,
মিলে নাই মোক্ষ, শুধু ছিঁড়ে গেছে জীবনের ডোর;
সেই থেকে বেঁচে আছি মরণের গৈবী পায়ে লুটি;
আমারে ডরায় লোকে, জনসংঘ বিভীষিকা মোর॥

তবু বিশ্বমানবেরে একমাত্র সত্য ব'লে জানি,
অতিমর্ত্য তারই স্বপ্ন, বিশ্বপতি কল্পপুত্র তার।
সভ্যতার রক্তলিপ্সা হয়ে গেছে আজ কানাকানি,
আদর্শের দৈববাণী প্রতিধ্বনি প্রবৃত্তিগুহার॥

তাই মানুষের দিকে বারংবার মেলে দিই হাত,
আকস্মিক বিসংবাদে বারংবার হই পণ্ডশ্রম।
জানি নেই অন্য গতি; তথাপি সে-আহ্নিক আঘাত
সঞ্চারে উৎসাহে দ্বিধা, নিরুৎসুক হয় উপক্রম॥

কিন্তু কেন নাহি জানি এ-কুৎসিত, বৈরী প্রতিবেশে
তোমার সান্নিধ্যে ব'সে নৈর্ব্যক্তিক আলাপের মাঝে
অকস্মাৎ মনে হয় পৌত্তলিক, রিক্ত নিরুদ্দেশে
আমার অজ্ঞাতবাস ফুরাইল আজিকার সাঁঝে ॥

অথচ বলিনি কিছু, বলিবার কিছুই যে নাই ;
নাটকীয় মর্মবাণী করি নাই মোরা বিনিময় ;
আকর্ষি কালের ব্যঙ্গ জানাইনি পণের বড়াই ;
নয়নে নয়নে চাহি চারি চক্ষে জাগেনি বিস্ময় ॥

হয়তো বা তাই তুমি বহিরঙ্গ দৈন্য মম দেখে
অস্বীকার করিবে না মোর গুপ্ত মৌল আমিটিরে ;
চিনিবে সে-চিরঞ্জীবে, মরণের অন্তরালে থেকে
যে নমিবে জন্মক্রমে যুগে যুগে নিত্য পৃথিবীরে ॥

চিনিবে সে-আশুতোষে, এইমতো তূর্ণ সন্ধিক্ষণ
যার কাছে শ্রেয়স্কর আত্মনিষ্ঠ অনন্তের চেয়ে,
ধন্য হয়ে যায় যার অফুরন্ত বিচ্ছিন্ন জীবন
বিরল অমৃত যোগে সদ্‌ভাবের প্রতিভাস পেয়ে ॥

সম্ভবত এও ভ্রান্তি, মায়াময় তুমিও বুঝি বা,
হয়তো যাহারে দেখো, সেও নয় ছায়ার অধিক ;
তবু, যদি সত্য হও, মনে রেখো আজিকার দিবা
তোমারে করিল, বন্ধু, অন্তর্যামী প্রাণের প্রতীক ॥

৭ সেপ্টেম্বর ১৯৩৩

জাতিস্মর

নাথু-সংকটে হাঁকে তিব্বতী হাওয়া।
প্রাকৃত তিমিরে মগ্ন চুমলহরি।
ছন্দু-সায়রে কার বহিত্র বাওয়া
অপর্ণ বনে দিয়েছে বহুস ভরি॥

সুহৃদ আগুন নিবে গেছে গৃহকোণে;
শ্রান্ত সাথীরা স্বপনে আপনহারা;
আমি শুধু ব'সে তুষারিত বাতায়নে
প্রহরে প্রহরে গুণি খসে কত তারা॥

অঙ্গ তুহিন, তপ্ত আমার মাথা,
ক্লান্ত, তথাপি নিদ্রা আসে না ডাকে,
বাণীহীন কোন্ অনাদি বিষাদগাথা
গুঞ্জরে বিস্মরণের ফাঁকে ফাঁকে॥

হিমানীবিজন এই দুর্গম দেশে,
মনে হয় যেন, কে আমার অনুগামী;
হয়তো বা আমি ভুলে গেছি আজ কে সে,
কিন্তু ভোলেনি তারে অন্তর্যামী॥

বিগত জনমে, এই পর্বতশিরে,
এমনই নীরব প্রাগিতিহাসিক রাতে
শিকার সমাপি এসেছিনু ঘরে ফিরে
মৃগের বদলে তাহারে কি ল'য়ে সাথে?

মিনতি আমার প্রথমে ধরেনি কানে,
কুটিল ভ্রুকুটি মোছেনি ললাটে ত্বরা;
তার পরে কেন—তা কেবল সেই জানে—
অযাচিতে হল সহসা স্বয়ংবরা॥

চ্যুত বল্কলে নিবে গেল দীপখানি ;
বাহিরের হিম মুকুরিল ধ্রুব চোখে ;
হঠাৎ তাহার লঘু, ভাস্বর পাণি
খুঁজিল আমারে প্রাক্তন নিরালোকে ॥

আবার কি তার আদিম নিমন্ত্রণী
আহ্বানে মোরে অমৃতের অভিসারে ?
কাঁদে সেদিনের প্রণব প্রতিধ্বনি
প্রতন গিরির গহ্বরকারাগারে ?

পুরাণপুরুষ ছাড়া পাবে নিমেষে কি ?
মাটির মানুষ মিলিবে মাটির সনে ?
বিদগ্ধ প্রাণী, এ কি মরীচিকা দেখি ?
ফিরিব প্রভাতে পরিচিত পরিজনে ॥

মৌল আকৃতি মরমেই যাবে ম'রে ।
জনশূন্যতা সদা মোরে ঘিরে রবে ।
সামান্যাদের সোহাগ খরিদ ক'রে
চিরন্তনীর অভাব মিটাতে হবে ॥

বর্বর বায়ু চিরায়ু অচলচূড়ে
মুছে দিবে মোর অশুচি পায়ের রেখা ।
মার্জিতরুচি জনপদে, বহু দূরে,
ভিড়ে মিশে আমি ভেসে যাব একা একা ॥

৮ ফেব্রুআরি ১৯৩৩

নরক

অন্ধকারে নাহি মিলে দিশা ॥

দীর্ঘায়িত নিশা
বয়ঃক্রীত বারাঙ্গনাপারা
দুর্গম তীর্থের পথে হয়ে সঙ্গীহারা
ঘুমায়ে পড়েছে যেন আতিথেয় অজানার পাশে
দুর্মর অভ্যাসে।
কেশকীটে ভরা তার মাথা
লুটায় আমার কাঁধে, পরনের শতচ্ছিদ্র কাঁথা
বিষায় জীবনবায়ু সংকীর্ণ কুটীরে,
তাহার বিক্ষিপ্ত বাহু ধরিয়াছে মোর কণ্ঠ ঘিরে,
ক্ষণে ক্ষণে
অজ্ঞাত দুঃস্বপ্ন তার সন্ত্রস্ত কম্পনে
সঞ্চারিত হয় মোর জাতিস্মর অবচেতনায় ॥

অতন্দ্রিত চক্ষু কিছু দেখিতে না পায় ;
শুধু মোর সংকুচিত কায়া
অনুভব করে যেন নামহীন কাহাদের ছায়া
শিয়রে সংহত হয়ে উঠে ; —
কোন্ জাদুঘর হতে দলে দলে পাশে এসে জুটে
অবলুপ্ত পশুদের ভূত
কুৎসিত, অদ্ভুত।
অমূর্ত আকাঙ্ক্ষা হানি, নিরাকার লজ্জা অসন্তোষ,
অসিদ্ধ দুরাশা দম্ভ, নিষ্ফল আক্রোশ
কানাকানি করে অন্তরালে।
রন্ধ্রহীন বিস্মৃতির প্রত্ন পাতালে
অতিক্রান্ত বিলাসের, অস্থাবর প্রমোদের শব
অনুর্বর সাম্প্রতেরে করিবারে চায় পরাভব
যোগায়ে জীয়ানরস অপুষ্পক বীজে ॥

অয়ি মনসিজে,
কোথা তুমি কোথা আজ এই স্থূল শরীরী নিশীথে ?
তোমার অতল, কালো, অতন্দ্র আঁখিতে
তারকার হিমদীপ্ত ভ'রে
তাকাও আমার মুখে। অনাত্মীয় অসিত অম্বরে
এলাও অস্পৃশ্য কেশ সূক্ষ্ম, নিরুপম,
স্বপ্নস্বচ্ছ বরাভয়ে আত্মত্যাগী বেরেনিকে-সম।
হেমন্ত হাওয়ার নিমন্ত্রণে
অনঙ্গ আত্মারে মোর ডাক দাও নীহারশয়নে
দুস্তর নাস্তির পরপারে ;
দাঁড়ায়ে যে-নির্বাণের নির্লিপ্ত কিনারে
নিরুদ্বেগ নচিকেতা দেখেছিল অধোমুখে চাহি
সম্ভোগরাত্রির শেষে ফেনিল সাগরে অবগাহি
কষিতকাঞ্চনকান্তি নগ্ন বসুন্ধরা
তারই প্রলোভনতরে সাজায়িছে যৌবনপসরা
রূপে, রসে, বর্ণে, গন্ধে, কামাতুর রামার সমান
হে বৈদেহী, করো মোরে সেখানে আহ্বান ॥

পণ্ডশ্রম, নাহি মিলে সাড়া।
শূন্যতার কান্না।
অগোচর অবরোধে ঘিরে মোর আর্ত মিনতিরে ;
যতই পলাতে চাই অভেদ্য তিমিরে
মাথা ঠুকে রক্তপঙ্কে পড়ি,
অগ্রজের মৃতদেহ যায় গড়াগড়ি
ক্রিমিভোগ্য দুর্গন্ধে যেখানে,
চরে যেথা ক্ষয়স্তূপে ভোজ্যের সন্ধানে
ক্লেদপুষ্ট সরীসৃপ, স্বেদস্রাবী বক্র বিষধর,
পঙ্কিল মণ্ডূক আর মূষিক তস্কর,
রক্তনখ পেচক, বাদুড় ॥

বমনবিধুর
আমার অনাত্ম্য দেহ প'ড়ে আছে মৃন্ময় নরকে।
মৌন নিরালোকে
ভুঞ্জে তারে খুশিমতো গৃধ্নু নিশাচর।
দুস্তর, দুস্তর, জানি, শাস্তি মোর দুঃসহ, দুস্তর।
মনে হয় তাই
আত্মরক্ষা হাস্যকর, সুসংকল্প মৌখিক বড়াই,
জীবনের সার কথা পিশাচের উপজীবী হওয়া,
নির্বিকারে, নির্বিবাদে সওয়া
শবের সংসর্গ আর শিবার সদ্ভাব।
মানসীর দিব্য আবির্ভাব,
সে শুধু সম্ভব স্বপ্নে, জাগরণে আমরা একাকী;
তাহার বিখ্যাত রাখি,
সে নহে মঙ্গলসূত্র, কেবল কুটিল নাগপাশ;
মলময় তাহার উচ্ছ্বাস
বোনে শুধু ঊর্ণাজাল অসতর্ক মক্ষিকার পথে॥

অমেয় জগতে
নিজস্ব নরক মোর বাঁধ ভেঙে ছড়ায়েছে আজ;
মানুষের মর্মে মর্মে করিছে বিরাজ
সংক্রমিত মড়কের কীট;
শুকায়েছে কালস্রোত, কর্দমে মিলে না পাদপীঠ।
অতএব পরিত্রাণ নাই।
যন্ত্রণাই
জীবনে একান্ত সত্য, তারই নিরুদ্দেশে
আমাদের প্রাণযাত্রা সাঙ্গ হয় প্রত্যেক নিমেষে॥

ব্যাপ্ত মোর চতুর্দিকে অনন্ত অমার পটভূমি;
সবই সেথা বিভীষিকা, এমন-কি বিভীষিকা তুমি॥

৯ নভেম্বর ১৯৩৩

কুক্কুট

মেঘার্ত পাণ্ডুর শশী ; শঙ্কাকুল শ্রাবণশর্বরী ;
নির্নিগড় বিভীষিকা বিচরিছে গগনে গগনে ;
ব্যোমের পরিধি-'পরে ভ্রমিতেছে, শুনি, ক্ষণে ক্ষণে
জাগর নক্ষত্রদল, বৃত্তবদ্ধ কালের প্রহরী ॥

অতীত বৃষ্টির বিন্দু পুষ্পের কৃপণ মুষ্টি হতে
ঝরে শ্লথ পত্র-'পরে থেকে থেকে আপনা-আপনি ;
নিদ্রাতুর নীরবতা আচম্বিতে চমকি অমনই
রসস্তের ঘটাটোপ কীর্ণ করে প্রপন্ন জগতে ॥

নিস্পন্দ নিরিক্ত কুঞ্জ ; পরিত্যক্ত অচ্ছোদ সরসী ;
হৃতস্পর্ধা বনস্পতি পুঞ্জীভূত আতঙ্কে গম্ভীর ;
সন্ত্রান্ত বিহঙ্গবৃন্দ অপ্রতিভ, অবনতশির,
প্রহরের জপমালা আবর্তিছে স্তব্ধ শাখে বসি ॥

মুখর কলহালাপ, কুহরণ, কূজন, কাকলী
কখন হয়েছে মূক ; মণিকণ্ঠী, চন্দনা, ভারতী,
দোয়েল, পাপিয়া, শ্যামা, কলবিঙ্ক, কঞ্জল, কপোতী
দুর্দান্ত দুঃস্বপ্নে কাঁপে আশ্রয়ের দুয়ার আগলি ॥

বউ-কথা-কও কোথা দুরারোহ, তমিস্র তমালে
সভয়ে সংবরি আছে উচ্ছৃঙ্খল দ্বিস্বরা দীপক ।
সুদূর পারস্যে বুঝি বিরহী বুলবুল পলাতক
ফুটাতে সংরক্ত রাগ সোহাগিনী গোলাপের গালে ॥

ডাহুকী, সারসী, ক্রৌঞ্চ, চক্রবাক, কাদম্ব, কুলাল
নির্বিঘ্ন তিব্বতপানে নিরুদ্দেশ আসন্ন দুর্দিনে ।
চক্রধর চর্মচটী লুক্কায়িত দুশ্চর বিপিনে ।
প্রেতসঙ্কুলিত কক্ষে চিত্রার্পিত সারিকা বাচাল ॥

সংগীতের দিগ্বিজয়ে লব্ধকীর্তি শকুন্ত কুলীন,
কাংস্যক্রেংকারিত শিল্পী, বাগ্মী শুক, অনুলাপী পিক
আলোড়িত কলরবে মথিছে না সুপ্তিশান্ত দিক।
উদ্বিগ্ন, নির্বাত, খিন্ন রুদ্ধস্রোত কালের পুলিন॥

শূন্যগর্ভ নভস্তল অকস্মাৎ অম্বুনাদে ভরি
তরঙ্গিল সারা বিশ্বে, হে কুক্কুট, তোমার মাভৈঃ;
আশার অলকানন্দা বহায়িলে, অশুচি বিজয়ী;
বাধ্যয় উদ্ধার এল, প্রেতমুক্ত হল বিভাবরী॥

সে-জয়গাথায় মাতি মোর শঙ্কাস্তম্ভিত রুধির
দ্রুত-বিলম্বিত নৃত্য আরম্ভিল চমকিত হৃদে;
অহৈতুক কৃতজ্ঞতা গুঞ্জরিল, বাণী দে, বাণী দে;
রোমাঞ্চিত ধন্যতায় মুগ্ধ হল উদ্দীপ্ত শরীর॥

দেখেছি, পতিত, তব অতিমর্ত্য বিরাট মূরতি
অসংস্কৃত অন্ত্যজের চমৎকৃত, তীব্র পরিচয়ে।
রুচিগ্রস্ত সিদ্ধ কবি শুদ্ধ থাক আভিজাত্য ল'য়ে;
তুমি ধরো, হে অস্পৃশ্য, অধ্যাত্মের সহজ প্রণতি॥

৭ ভাদ্র ১০৩৫

ভাগ্যগণনা

শুনিলাম জ্যোতিষীর কাছে
শনির দশার মোর পঞ্চ বর্ষ আরও বাকি আছে;
তার পর
বিংশতি বৎসর
অকৃপণ বৃহস্পতি গূঢ় আশীর্বাদে
উদ্বাস্তু আত্মারে মোর রাজকীয় মর্মরপ্রাসাদে

সুপ্রতিষ্ঠ করিবে নিশ্চয় ;
মোর ব্যর্থ যৌবনের ক্ষিপ্ত অপচয়
হিরণ্ময় শস্যের আকারে
সে-দিন ফিরিবে নাকি অক্ষয় ভাণ্ডারে ;
বিলাসের কামধেনু দুয়ে,
রচি সে-ফেনিল দুগ্ধে শুভ্র শয্যা, তার 'পরে শুয়ে
নিশ্চিন্ত ঘুমের আগে যদ্যপি তখন
দৈবাৎ স্মরণ করি আজিকার উদ্‌ভ্রান্ত জীবন,
তবে মনে হবে
আমার অজ্ঞাতসারে কখন নীরবে
সুনিদ্রা এসেছে পাশে দুঃস্বপ্নের ছদ্মবেশ পরি –
যেন কোনও রঙ্গিলা নাগরী
রূঢ়তার ভানে
অন্তরঙ্গ সোহাগ বাখানে ॥

হেথা এসে
গণক গুটাল পুঁথি ; আমি ম্লান হেসে
বিদায় নিলাম তারে যথোচিত দক্ষিণান্ত ক'রে
কিন্তু মোর গভীর অন্তরে
জাগিল না প্রসন্ন প্রত্যাশা ;
শুধু পেল ভাষা
অন্তর্ভৌম যে-আশঙ্কা এতদিন উৎসবের ক্ষণে
সঞ্চার করেছে মোর জাগ্রত চেতনে
অহেতু বিষাদ আর অকারণ উদ্বেগ, কম্পন।
বুঝিলাম আচম্বিতে উদ্দীপ্ত যৌবন
ক্ষীয়মাণ সলিতায় অতঃপর পাবে না আশ্রয়।
বুঝিলাম মোর শত্রু নয়
দুর্হৃদ মানুষ কিংবা কুটিল দেবতা,
শত্রু নয় নিষ্ফলতা, শত্রু নয় আবশ্যিক ব্যথা ;

শত্রু শুধু নিরপেক্ষ কাল,
মহাকাল,!
ভয়াল, বিশাল ॥

বুঝিলাম আজ যাহা আছে,
সে-দিনও সে-সবই রবে ; — দুরারোহ গাছে
থাকিবে মন্দার ফুটে, কুহরিবে নন্দনের পাখী,
সর্বাঙ্গে পরাগ মাখি
প্রজাপতি শাখে শাখে বিতরিবে প্রাণ।
শুধু মোর দৃষ্টি, শ্রুতি, ঘ্রাণ
সে-ডাকে দিবে না সাড়া।
সুন্দরের প্রহৃত নাকাড়া
সে-দিনও ধ্বনিত হবে কামনার চিরন্তন বনে,
জিগীষার রুদ্র নিমন্ত্রণে
হৃদয়কন্দর মোর অনুনাদে ভ'রে যাবে, জানি ,
কিন্তু যে-অসভ্য প্রাণী
আজি সেথা বাস করে, সংস্কারের গুণে
সজীব ইন্ধন ঢালে যজ্ঞের আগুনে,
জয়যাত্রা আর তার সাধ্যে কুলাবে না।
তাই সে পাবে না
মর্মান্তিক অস্ত্রাঘাত নিষ্কবচ বুকে ;
দেখিবে না তাই সে সম্মুখে
সংরক্ষিত সভ্যতার জ্বালামুখ প্রাকারমণ্ডল।
কালস্রোতে ভেসে আসা পল, অনুপল
নির্গমের দুয়ারে তাহার
জঞ্জালের অবরোধ করিবে সেদিন স্তূপাকার ;
তার অন্তরালে
রুদ্ধশ্বাস বীর্য তার নিস্পন্দ কঙ্কালে
পরিণত হবে ত্বরা, প্রস্তরিত হবে অবশেষে ॥

সে-দিনেও ঊর্ধ্ব নিরুদ্দেশে
তাকাবে তোমার আঁখি ; সংকুচিত পায়ের তলায়
হুতাশী লুটায়ে রবে ; স্নেহের শলায়
জীর্ণ, দগ্ধ হয়ে
ত্যজিবে বিদ্রোহ সেও ; বিচ্ছিন্ন হৃদয়ে
ভাগ্যনির্ভরতা লেপে বিষান্বিত প্রদাহ জুড়াবে ;
বাঁধা প'ড়ে অনন্ত অভাবে
ভাবিবে জীবন মায়া, সত্য শুধু দুর্বার মরণ,
বস্তুবিশ্ব ক্ষণস্থায়ী, শূন্য সনাতন।
কিন্তু আমি রব না সেখানে ;
রানীরে দুর্জ্ঞেয় জেনে বাঁদীর সন্ধানে
ফিরিব অভীপ্সা ভুলে সমীকর আঁধারের নীচে।
তাই আর মোর পিছে পিছে
ভ্রমিবে না নিঃসঙ্গতা দিনান্তের ছায়ার সমান ॥

রবে বর্তমান
সে-দিনেও আজিকার মতোই জগতে
বুভুক্ষা, লাঞ্ছনা, ঈর্ষা ; পথে পথে
কণ্টকিত পরাজয় করিবে দমন
মানুষের অসাধ্যসাধন।
শুধু আমি দুঃখভীরু হব উঞ্ছজীবী ;
উদার পৃথিবী
শস্যসঞ্চয়নশেষে ফেলে যাবে সমভূমি-'পরে
জরাগ্রস্ত পশুদের তরে
যে-কটা উচ্ছিষ্ট কণা, তার ভাগ পেয়ে,
শূন্যে চেয়ে
বিধিরে জানাব কৃতজ্ঞতা।
সে-দিন ছোঁবে না মোরে তাই আর ব্যথা ও ব্যর্থতা ॥

বুঝিলাম বেলা চ'লে যায়,
দিগন্তের পটে আঁকা অস্থিসার হিম চন্দ্রমায়

সূর্যের অপরিহার্য তেজ
রচে শেষ শেজ ;
মৃগতৃষ্ণিকার প্রেত অলৌকিক মরীচিকারূপে
স্বর্গান্বেষী সোপানের ধ্বংসধূলিস্তূপে
কালের তাণ্ডবলীলা ঢেকে দেয় মায়ার প্রচ্ছদে,
প্রতি পদে
সিদ্ধির স্বয়ম্ভূ নেশা আমাদের মুগ্ধ চোখে ভ'রে
গুহারে শিখর ব'লে প্রতিপন্ন করে,
গুরু ব'লে লঘুরে চালায়।
বুঝিলাম মৃত্তিকার তলায় তলায়
যত দিন রক্ত বহে, যত দিন তার মর্ম হ'তে
ক্ষয়ের অক্ষয় বীজ মঞ্জরিয়া উঠে দুষ্ট ক্ষতে,
সৃষ্টির কুৎসিত স্ফীতি রূপরেখা-'পরে
যত দিন ব্যক্ত হয়, তত দিন ধ'রে
অনশ্বর জড়বিশ্বে জেগে থাকে মানুষী চেতন ॥

বৈকল্য এমনই ধ্রুব, এতই কি দুঃসাধ্য মরণ ?

২৭ নভেম্বর ১৯৩৩

মৃত্যু

কাল রাতে
এ-সংকীর্ণ সংসারের নির্বোধ সংঘাতে
চীর্ণ, দীর্ণ হৃদয় আমার
মৃত্যুর ঘনান্ধকারে খুঁজেছিল নির্বাণ উদার
কণ্টকিত শয়নীয়ে শুয়ে।
তার পরে কি জানি কখন গেল ছুঁয়ে
স্বপ্নবহ মলয় আমাকে ;
অনিদ্রার ফাঁকে

কখন পশিল চিত্তে মন্দারের অক্ষয় পরাগ ;
ঊষর বিরাগ
কখন বিকৃত হল সর্বশেষ প্রপঞ্চের ফুলে ॥

মনে হল জীবনের পঙ্কলিপ্ত মূলে
অভাব লেগেছে অকস্মাৎ ;
মরণের বজ্রাঘাত
পরবশ শরীরের অন্ধকূপ হানি,
উপেক্ষি সত্তার মর্মবাণী
স্বয়ম্ভর চৈতন্যেরে উড়ায়ে করেছে উচ্ছৃঙ্খল।
কী আনন্দ! অস্মিতির অখণ্ড মণ্ডল
নিরুপাখ্য কী আনন্দে ভরা!
এ-চির প্রস্তরা
সন্তপ্ত হবে না কভু সঙ্গিনীর শ্লিষ্ট সহবাসে।
বিতরি উন্মাত্র সিদ্ধি পাশব উল্লাসে
বৃংহিত গণেশ সেথা মিটাবে না জনতার তৃষা।
নিরঞ্জন, নিত্য মহানিশা
হারাবে না পবিত্রতা নৈমিত্তিক ক্রিমির প্ররোহে।
গৃধ্রের কলহে
শূন্যের নির্গুণ শান্তি টুটিবে না কখনও কিছুতে॥

আচম্বিতে প্রতর্কের পিশাচী বিদ্যুতে
উদ্‌ভাসিল স্বপ্নলোক ; সহস্রাক্ষ জিজ্ঞাসায় বেজে
শতচ্ছিদ্র রহস্যের স্বচ্ছ ঘটাটোপ
ঘুচে গেল মুহূর্তেকে ; অন্তিম দুরাশা পেল লোপ।
কোথা সে-অনন্ত অমা? রাগরিক্ত সন্ধিলগ্ন এ যে,
অনিশ্চিত প্রত্যাশার ঝিঁঝিঁরে চঞ্চল,
উন্মুখর বিনির্মোক আত্মার মর্মরে।
পলে পলে, প্রহরে প্রহরে
পশে এ-অশেষ রন্ধ্রে অশরীরী মানুষের দল

সঞ্চিত স্পৃহার কণা কুড়ায়ে যতনে
অনুপূর্ব পিপীলিকাবৎ।
উৎক্ষিপ্ত বায়ুর দৌত্যে ভেসে আসে হেথা ক্ষণে ক্ষণে
যুগপৎ
অট্টহাসি, দীর্ঘশ্বাস, অশ্রুর শীকর।
গতায়ুর অভিশাপ হেথা হতে বর্ষে নিরন্তর
নক্ষত্রের ঋষ্টিরূপে জীবঘন ধরিত্রীর শিরে॥

এই অরাজক রাষ্ট্রে ধর্মরাজ ফিরে
জনশ্রুত স্বৈরিতার অপ্রচল প্রকীর্তি আস্ফালি
জরাগ্রস্ত অধিকর্মাসম।
করতালি
নিষ্ঠুর, নির্মম,
বাজে তার চতুর্দিকে। অজর, অমর আত্মা যত
বৃদ্ধ শার্দূলের পাছে তরক্ষুর মতো
ব্যক্ত ব্যর্থতারে তার ব্যঙ্গ করে বাচাল চিৎকারে।
বহু ব্যবহারে
ক্ষয়িষ্ণু আজিকে তার তূণ ;
ভয়াল মৃগয়া তাই শব্দভেদী সায়কে দারুণ
সঞ্চারে না আর
আকস্মিক দুর্দৈবের সন্ত্রাস্ত সংহার
নিশ্চিন্ত অন্ধের বক্ষে, তরুণের নিঃশঙ্ক প্রমোদে।
শ্রান্ত পদে
আবর্জনাবাহকের প্রায়
অখ্যাত দিনের শেষে অলক্ষ্যে সে আসে আর যায়
প্রাণের উদ্বৃত্ত ক্লেদ আহরিতে চুপে
জনাকীর্ণ পথপার্শ্ব হতে॥

মৃত্যুর সৈকতে
মহত্ব কল্পনামাত্র। বল্মীকের সাম্যময় স্তূপে
নির্লিপ্তি, নির্বাণ, শান্তি কেবলই স্বপন।

প্রেতগণ
জটলা পাকায় হেথা বৈতরণীতীরে ;
জন্মান্তরের খেয়া ঘাটে ভিড়ে ;
পরপারে কপিসেনা করে সেতুবন্ধের সূচনা ॥

রব না, রব না
লুব্ধ, ক্ষুব্ধ বামনের এ-সমষ্টিবাদে।
তোমার প্রমাদে,
হে বসুধা, আবার ফিরায়ে লও মোরে।
হয়তো সেখানে আজও স্বতন্ত্রতা মিলে মাঝে মাঝে
নগণ্যের অভীপ্সারে প্রতিহত ক'রে
এখনও দিগন্তে সেথা পরিচ্ছিন্ন হিমাদ্রি বিরাজে ;
এখনও নিঃসঙ্গ অন্ধকার
সপ্তর্ষির আশীর্বাদে ধন্য হয় সেথা বারংবার ;
আজও থাকি থাকি
দিগ্বিজয়ী শঙ্খে সিন্ধু তুরঙ্গমী সেনানীরে ডাকি
মানুষের প্রগল্‌ভতা ডুবায় চকিতে
অভ্রংলিহ পরাক্রমে ;
আজও ভ্রমে
বর্বর সিমুম সেথা সাহারা-গোবিতে ;
সুমেরুর দুরাক্রম্য কূটে
রূপের শাশ্বত হাসি আজও ফুটে উঠে
অতিক্রমি সংকটের অহৈতুক ঘাত-প্রতিঘাত।
আজও তব অরণ্যে নির্বাত
নিভৃতে বিহরে যেথা নির্নিগড় শিবি,
সেথা মোরে স্থান দাও, হে পৃথিবী, পৃথুল পৃথিবী ॥

২১ জুন ১৯৩১

সিনেমায়

জনাকীর্ণ রঙ্গালয়। ধূমাঙ্কিত তরল আঁধারে
বাক্যহীন শুক্লগণ মাথা ঠুকে মরে চক্রাকারে
মাতাল অন্ধের মতো। অলক্ষিত, আতপ্তশরীর,
নাগরকীর্তনমুগ্ধ, বিদেশিনী প্রতিবেশিনীর
সবিরাম মৃঢ় হাস্য করিতেছে ইন্দ্রিয়গোচর
কামার্ত নারীর সত্তা। শুভ্র পটভূমিকার 'পর
আসে যায় জীবনের দ্বিরায়তনিক অনুকৃতি।
নিঃসার ছায়ার ছায়া, অকিঞ্চন মুহূর্তের স্মৃতি
বাস্তবেরে ব্যঙ্গ করে। দৈনন্দিন ব্যর্থতার শেষে
নপুংসক গড্ডলিকা আসিয়াছে রসালু আবেশে
সচিত্র স্বপ্নের রাজ্যে খিন্ন দেহে, সর্বভুক মনে।
ধ্রুপদী সংগতি, সত্য বিতাড়িত দূর নির্বাসনে
ও-বিপ্লবী চিত্র হতে। অর্বাচীন খেয়ালের সারি
উপক্রত হট্টমাঝে ফিরে যেন অবাধে চিৎকারি
অনভিজাতিক দম্ভে॥

অসংবদ্ধ তুচ্ছ আখ্যায়িকা
শেষ হয় অকস্মাৎ; জ্ব'লে ওঠে লক্ষ দীপশিখা
উদ্বেজিত গৃহমাঝে; ঐকতানে কাংস্য কোলাহল
দর্পভরে দাবি করে সম্রাটের ঐহিক মঙ্গল
আশ্রিত বিধির কাছে; ঘন ঘন দিয়ে করতালি
পরিতৃপ্ত প্রেক্ষণিক বাহিরায় মদনাগ্নি জ্বালি
আনগ্ন নাগরীসাথে। আমি শুধু সে-বাচাল ভিড়ে
স্বতন্ত্র দাঁড়ায়ে থাকি, শৈল যথা পরিচ্ছিন্ন শিরে
নিষ্প্রাণ, নির্লিপ্ত রহে উদ্বেল উর্মির আলিঙ্গনে॥

সহসা আমার অঙ্গ ভ'রে গেল দিব্য রোমাঞ্চনে;
ভেসে এল ছিন্ন হয়ে উতরোল জনস্রোত হতে
তোমার আননখানি নয়নের পিণ্ডীর সৈকতে,

হে চির অপরিচিতা। একবার তরল কৌতুকে
বাঁকায়ে উন্নত গ্রীবা, অপাঙ্গে তাকায়ে মোর মুখে
তিমিরে মিলালে তুমি দীপান্বিত দেহলী উত্তরি॥

অন্তর্গূঢ় প্রত্যাদেশে বেষ্টনীর বৈরিতা পাসরি
ছুটিনু পদাঙ্কে তব। সহসা সম্মুখে জুড়ে দ্বার
উন্মার্গবিবাগী কোনও সম্বশুদ্ধ সর্বরত্নভার
বয়স্থ বিশাল বপু বিস্তারিল বর্ধিষ্ণু বিচ্ছেদ
তোমার আমার মাঝে। অতিক্রমি সে-মণ্ডিত মেদ
দেখিনু বাহিরে আসি, পরিপূর্ণ রাজপথমাঝে
উত্তাল ঘূর্ণির মতো শূন্যকেন্দ্র জনতা বিরাজে;
শুধু তুমি অন্তর্হিত; ভ্রষ্ট লগ্ন; সমাপ্ত সুযোগ।
আবার নিষ্ফল হল আজন্মের বিরাট উদ্যোগ॥

২০ ভাদ্র ১৩৩৫

সমাপ্তি

বরষাবিষণ্ণ বেলা কাটালাম উন্মন আবেশে।
জনশূন্য হৃদয়ের কবাট উদ্‌ঘাটি
স্মরণের চলাচল করিলাম সহজ, সরল।
দৃষ্টিহারা নেত্রপাতে দেখিলাম সন্নত আকাশে
এইমতো আর এক দিবসের ছবি।
অবিশ্রান্ত বৃষ্টির বিলাপে
শুনিলাম সে-কণ্ঠের স্নেহসম্ভাষণ।
অর্গলিত বাতায়নে ঝটিকার নিরর্থ আক্রোশে
বিচ্ছেদবিধ্বস্ত হিয়া বাখানিল ক্ষুব্ধ অক্ষমতা
নির্বিকার, নিরুত্তর, রুক্ষ বিধাতারে॥

এল সন্ধ্যা রিক্তবরিষণ ;
দিনান্তের মুমূর্ষু বর্তিকা
প্রাক্‌নির্বাপণ দীপ্তি প্রজ্বলিত করিল সহসা
প্রাণের অন্তিম শক্তিব্যয়ে ;
তার পর অন্তরে, বাহিরে
অন্ধকার বিস্তারিল শবপ্রাবরণী ॥

মনে হল আশা নাই,
মনে হল ভাষা নাই পিঞ্জরিত ব্যর্থতা বলার।
মনে হল
সংকুচিত হয়ে আসে মরণের চক্রব্যূহ যেন।
মনে হল ব্রহ্মচারী মূষিকের মতো
শটিত জঞ্জালকণা কুড়ায়েছি এত কাল ধ'রে
কৃপণের ভাণ্ডারে ভাণ্ডারে ,
এইবার ফুরায়েছে পালা,
ঘাতক যন্ত্রের কারা অবরুদ্ধ হল অবশেষে ;
এইবার উত্তোলিত সম্মার্জনীমূলে
পিষ্ট হবে অচিরাৎ অকিঞ্চন উঞ্ছবৃত্তি মম ॥

৩০ জুন ১৯৩২

পরাবর্ত

১

ছুটেছে গৈরিক পথ নির্বিকার সন্ন্যাসীর মতো
নির্গুণ নির্বাণভরা, নিরাকার শূন্যের অন্বেষে ;
নিরাশ্রয় আঁখিপাখী নিশাক্রান্ত, অশক্ত, আহত,
ঘুরে মরে দিশে দিশে মরুময় অজানা বিদেশে ;

যে-বিরল পারিষদ ওই দূরে দিগন্তের পটে
চিত্রার্পিত করেছিল মানুষের বিরাট সাধন,
তাদের মৃন্ময় মূর্তি ধুয়ে গেছে বৃষ্টির ঝাপটে ;
পলাতক চক্রবালে উল্লসে ধুলার আবর্তন ;
সমুদ্যত ভবিতব্য জগদ্দল নৈঃশব্দ্যের ভারে
দলিছে দুর্বার দর্পে অতীতের চারণসংগীত ;
রুদ্রের নয়নদগ্ধ মদনের প্রেত বারে বারে
করে যেন বজ্রাগ্নিতে অনুতপ্ত ভ্রমের ইঙ্গিত ;
বিক্ষিপ্ত নৈরাশকণা পুঞ্জীভূত হয়ে ঘন মেঘে
হানিছে জীবনাকাশে বিরঞ্জন আঁধার সমতা ;
আত্মধিক্কারের ঘূর্ণি রিক্ত বক্ষে ধেয়ে আসে বেগে ,
ঝ'রে পড়ে লক্ষ ধারে ভারাতুর, নির্লজ্জ মমতা ॥

উষার মাহেন্দ্রক্ষণে, পৌত্তলিক প্রথম ফাল্গুনে,
ভাবিলি মনোজ্ঞা ব'লে যে-অচেনা অবগুণ্ঠিতারে
দূর থেকে দেখে শুধু, কেবল নিরর্থ নাম শুনে
ফিরিলি ছায়ার মতো এতদিন যার অনুসারে,
আজি সেই মোহিনীর জরাজীর্ণ, প্রচ্ছন্ন স্বরূপ
ব্যক্ত হয়ে থাকে যদি বিদ্যুতের নির্দয় আলোতে ;
বৈহাসিক অবিশ্বাসী ঢালে যদি বিষাক্ত বিদ্রূপ
স্বর্গচ্যুত কৈশোরের অভিব্যাপ্ত অরুন্তুদ ক্ষতে ;
তবুও কেমনে, কবি, অস্বীকার করিবি সুন্দরে ;
বলিবি অলীক পদ্ম, সত্য শুধু পঙ্কমূল তার ?
গরিমারে মিথ্যা জেনে নিঃসংশয়ে কহিবি কি ক'রে
লঘিমাই সনাতন, বস্তুবিশ্ব শুধু ধ্বংসসার ?
সংগীতের রসায়নে চেয়েছিলি করিতে নির্মাণ
সমুচ্চ সুবর্ণলঙ্কা ; আসুরিক সে-মহাপ্রয়াস
ধূমাঙ্কিত ব্যর্থতায় হয়ে থাকে যদি অবসান,
তবে ভস্মমসিপাতে স্বাক্ষরিত কর্ সর্বনাশ ॥

২

তুই মূঢ়, বয়েছিলি অনিশ্চিত-বক্রতা-বিহীন,
প্রাসাদনিবৃত্ত, ঋজু, স্থিরলক্ষ্য প্রশস্ত সরণী,
আদিম বক্রতা যার পূর্বগামী করিল মসৃণ,
যার হিংস্র প্রতিহিংসা বক্ষ পেতে রোধিল অগ্রণী।
কনককণিকা-খচা, চেয়েছিলি, সান্দ্র অবচ্ছায়া,
নিয়ন্ত্রিত শাল্মলীর মর্মরিত প্রবীণ বীথিকা,
মলয়বীজনস্নিগ্ধ, নিরাপদ প্রগতির মায়া,
পুষ্পের আশিস্-বৃষ্টি, বিহঙ্গের বন্দনাগীতিকা।
তুই চেয়েছিলি, লোভী, পথপার্শ্বে বিস্মিত নয়ন,
উৎসবের পীতাম্বর, করতালি কঙ্কণমুখর,
সম্মুখে মঙ্গলঘট, রক্তধ্বজ বিজয়তোরণ,
পশ্চাতে ধ্বংসের ধূলি, নির্জিতের ক্ষীণ কণ্ঠস্বর॥

আজি সে-সুখের নিদ্রা অকস্মাৎ টুটিল কি, কবি?
গোলাপী নেশায় ভরা রুদ্ধ আঁখি ফুটিল সহসা?
বিবর্ণ দিনের দীপ্তি মুছে দিল সে-চলন্ত ছবি,
ভাতিল দৈনিক দৈন্য, ঘুচিল সে-দয়ালু তমসা?
বুঝিলি কি আচম্বিতে সাঙ্গ তোর স্বপনপ্রয়াণ,
সে নহে তো শোভাযাত্রা, যৌবনের শবযাত্রা সে যে;
তাই নাই পুষ্পবৃষ্টি, বন্দীদের উচ্চ জয়গান;
নিরিক্ত প্রস্তরপথ দগ্ধ তাই স্পন্দমান তেজে?
সরল বিস্ময় টুটে অন্তর্দৃষ্টি ফুটিল কি চোখে;
বুঝিলি এ-বাটে যারা লঘু পায়ে গেছে তোর আগে,
তারা নয় অতিনর; আত্মহারা গড্ডলিকা তোকে
অভিযুক্ত ক'রে গেছে উদ্‌ভ্রান্তির মৌল দায়ভাগে;
তাই তোর বৈজয়ন্তী দর্শকের বিদ্রূপ জাগায়,
বিপ্রলব্ধ অনুযাত্র শঙ্খনাদে রহে নিরুত্তর;
প্রতীকীর অশ্বমেধ শুধু শূন্যে অধিকার পায়,
নিশ্চিন্ত স্বর্গের হাস্যে অপ্রতিষ্ঠ ত্রিশঙ্কু অমর?

৩

কোন্ জন্মান্ধের কাছে শিখেছিস, ওরে অন্ধ কবি,
ব্রহ্মাণ্ডনেমীর কেন্দ্র বৃত্তিবদ্ধ, বিকল মানুষ ;
প্রাণের প্রথম প্রৈতি তার মনোবাসনার ছবি ;
জন্মমৃত্যুপরম্পরা শুধু তার করুণা, পৌরুষ ;
উদ্দাম অভীপ্সা তার মূর্ত লক্ষ তারার কম্পনে ;
তার দীর্ণ দীর্ঘশ্বাস বাতাহত বেণুতে ফুকারে ;
তার আকস্মিক খুশি শ্রাবণের নৈশ বরিষণে ;
মুমুক্ষু বিদ্রোহ তার চৈত্রে স্তব্ধ জলদে হুংকারে ;
বেতস বিরহমূক সদা তার মুখস্পর্শ মাগে ;
লুটায় মানিনী যূথী, কণ্ঠাশ্লেষ না পেয়ে, ধুলায় ;
অনঙ্গের লক্ষ্যভেদে মধুমাসে সে যদি না জাগে,
বিধাতা প্রমাদ গণে, চরাচর ম'রে, ঝ'রে যায় ;
অব্যক্তির গর্ভ হতে রহস্যের নিত্য নিরুদ্দেশে
উধাও সে ধূমকেতু দীপ্র সেতুসংরচন করে :
এই মুগ্ধ মায়াবাদ কিনিতে কি নিঃস্ব হলি শেষে,
বোঝাই সোনার তরী রেখে এলি বিদেহনগরে ?

কুশের ফুৎকারজাত বুদ্বুদের স্ফটিকমণ্ডলে
বিচ্ছুরিত বর্ণচ্ছটা অন্তর্হিত হলে মহাকাশে
সনির্বন্ধ শিশু যথা ডুবে যায় অশ্রুর অতলে,
বিশ্বের বৈচিত্র্য খোঁজে আপনার ভাবালু বিলাসে ;
তুইও তেমনই, কবি, ভেবেছিলি চির চিরন্তন
কালাবর্তপরিস্ফীত, পরজীবী রঙের স্বপ্নেরে।
ফুরাল তাহার বেলা ; ঝেড়ে ফেলে সংহত ক্রন্দন,
ফিরে যা সংসারে পুন ক্রন্দসীর ঊষরতা ছেড়ে।
অজ্ঞাত সিন্ধুর মর্মে, জাদুকরী অপ্সরা যেখানে
উৎকর্ণ অর্ণবপোত ধ্বংস করে অপ্সরসংগীতে,
সেথা বাঁধি নিজ দেহ, মুদি চক্ষু, অবরুদ্ধ কানে
পারায়ে যা পরিচিতা সুন্দরীরে বরমাল্য দিতে ॥

৪

যদিও আত্মার ঐক্য অসম্ভব সে-জড়জগতে,
মূলত সমানধর্মী তবু সেথা নিরবধি কালে ;
আকর্ষণ, বিকর্ষণ তুল্যমূল্য সে-স্বতন্ত্র পথে,
সান্নিধ্য, দূরত্ব মিথ্যা, ভেদ নাই আকাশে পাতালে ;
ব্যতিক্রম, অপচার নিষিদ্ধ সে-নৈরাজ্যে নিশ্চয়,
পরিণতি স্বতঃসিদ্ধ. অনিবার্য স্বায়ত্তশাসন ;
সেথানে সম্পূর্ণ বৃত্ত, শুধু ভগ্ন কুটিলতা নয়,
অতীত অসার স্বপ্ন, ভবিষ্যৎ অসত্যভাষণ ;
সেথানে অনন্ত বাহ্য ; সে-অসীমে অণুও শ্রদ্ধেয়,
সংক্রান্তি সংক্ষিপ্ততম, অগ্রগতি অপচয়হীন,
ভ্রান্তি শুধু আপেক্ষিক, নির্বিকার প্রকৃতি প্রমেয়.
প্রলয় অভাবনীয়, সর্বনাশে নির্মিত নবীন।
শূন্য যেথা শূন্য নয়, ভারাতুর সংসক্ত তড়িতে,
প্রসার সহস্রমুখী, হরিহর মুক্তি আর কারা,
হয়তো একদা সেথা মণিময় অমারজনীতে
পাবি, কবি, অকস্মাৎ অজানিত দয়িতের সাড়া।
সেথা কি অগুরু গর্ভে সুকুমারী কোনও নীহারিকা
নিজের অজ্ঞাতসারে আগন্তুক দৈবেরে বহে না,
বেদে কিংবা ইতিহাসে নেই যার কোষ্ঠীপত্র লিখা,
শুধিবে যে-ক্ষেমংকর প্রবঞ্চিত মানুষের দেনা ?

কিন্তু তোর ভাগ্যগুণে সে-আশাও যদ্যপি না মেটে,
অহৈতুক অনিশ্চয়ে অবশেষে হারায় প্রমিতি ;
বিস্ফোটক বস্তুবিশ্ব যায় যদি বিপ্রকর্ষে ফেটে,
বিশৃঙ্খল বিসংবাদে ভ'রে ওঠে আবার অমিতি,
পরিব্যাপ্ত পরমাণু নিপাতন প্রচারে নিখিলে,
হিরণ্ময়ের ক্ষয়ে সীসকের পরমায়ু বাড়ে,
কেবল আদিম জাড্য প্রাথমিক মাৎস্যন্যায়ে মিলে,
সমষ্টির অভিসন্ধি নিঃসহায় ব্যষ্টিরে সংহারে ;

তবেই বুঝিবি ওই নিরপেক্ষ নক্ষত্রনিচয়,
নিপট কপট ওরা, শুধু নাম, জনশ্রুত নাম ;
মাটিই একান্ত সত্য, আর সব বৃথা বাক্যব্যয়,
সহস্র ইন্দ্রের শবে রত্নপ্রসূ এই মর্ত্যধাম।
হয়তো সে-শুভদিনে মরণের তুঙ্গ চূড়া হতে
সিদ্ধির ষোড়শ কলা কেড়ে নেবে বামন মানুষ ;
সুন্দরের পদরেখা ধরা দেবে ধুলাঢাকা পথে ;
আবার সপ্তম স্বর্গে স্থান পাবে ধর্মিষ্ঠ নহুষ ॥

৯ জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৫

বাক্য

আমার আনন্দ বাক্যে : অক্ষরের অপূর্ব ঝংকারে
নারদ বিতরে, শুনি, অমরার অব্যর্থ আহ্বান
নিক্ষিপ্ত মন্দারমাল্যে ; হিমানীর সংহত নির্বাণ
বিনাশি মদন আনে বাসন্তীরে কার্মুকটংকারে ;
ভাবের তরঙ্গভঙ্গ জেগে ওঠে স্রষ্টার ওংকারে
স্তম্ভিত কারণার্ণবে ; সুদূরের বিপুল বিষাণ
ডাকে স্তব্ধ কল্পনারে ; করিবারে ভর্তার সন্ধান
বিশুদ্ধ চেতনা সাজে মণিদীপ্ত দিব্য অলংকারে ॥

মূল্যহীন সোনা হয় তব স্পর্শে, হে শব্দ-অপ্সরী ;
দুরাপের মদগর্ব খর্ব করো পরশে নিষ্ক্রিয় ;
তোমার অবেদ্য গানে অব্যক্তির সতর্ক প্রহরী
বিমুগ্ধ নিদ্রায় লোটে, মুক্তি পায় অনির্বচনীয় ॥

তোমার আকাশবাণী জলে, স্থলে, পর্বতে, কাননে,
আনন্দে, ব্যথায়, রসে, রূপসীর পার্থিব আননে ॥

২০ ভাদ্র ১৩৩৫

প্রার্থনা

হে বিধাতা,
অতিক্রান্ত শতাব্দীর পৈতৃক বিধাতা,
দাও মোরে ফিরে দাও অগ্রজের অটল বিশ্বাস।
যেন পূর্বপুরুষের মতো
আমিও নিশ্চিন্তে ভাবি, ক্রীত, পদানত
তুমি মোর আজ্ঞাবাহী দাস।
তাদের সমান
মণ্ডূকের কূপে মোরে চিরতরে রাখো, ভগবান।
কমঠবৃত্তির অহংকারে
ঢাকো ক্ষণভঙ্গুরতা। তাদের দৃষ্টান্ত-অনুসারে
আমিও ধরাকে যেন সরা জ্ঞান করি।
মর্যাদার ছিদ্রিত গাগরি
জোড়ে যেন বারংবার ডুবে আত্মপ্রসাদের স্রোতে।
রৌদ্র জ্যোতি হতে
আবার ফিরাও মোরে তমসার প্রত্ন দায়ভাগে।
ঘুণধরা হাড়ে যেন লাগে
উঞ্ছপুষ্ট জ্যেষ্ঠদের তৈলসিক্ত মেদ;
মরে যেন উদ্বন্ধনে অপজাত হৃদয়ের খেদ॥

পিতৃ-পিতামহদের প্রায়
তোমার নামের গুণে জীর্ণ হয়ে দশম দশায়
মূঢ়, মূক গড্ডলেরে দিই যেন বলি
রক্তপিপাসিত যূপে।
বাচাল বিদ্রূপে
হুংকারিলে দুর্বৃত্তের উদ্ধত দন্তোলি
গুরুজনদের মতো করি যেন সাষ্টাঙ্গ প্রণাম
শক্তির উচ্ছল পায়ে; আর্তির সংক্রাম

কেটে গেলে কালক্রমে জনাকীর্ণ রাজপথ থেকে
স্ফীত বুকে অপ্রতিষ্ঠ পৌরুষেরে ঝেড়ে,
হাসিমুখে হাত নেড়ে
পলাতক সধর্মীরে ডেকে,
প্রমাণিতে পারি যেন সবই তব ইচ্ছা, ইচ্ছাময় ॥

এলে পরে লাভের সময়
সদসৎ-নির্বিচারে, সকলই তোমার দান ব'লে,
নিঃস্বের স্বেদাক্ত কড়ি হাতায়ে কৌশলে
আমিও জমাই যেন যক্ষসংরক্ষিত কোষাগারে।
শ্রুতিধর মান্ধাতার উক্তির উদ্ধারে
লুকায়ে ইন্দ্রিয়াসক্তি; অবিমৃশ্য জন্মের জঞ্জালে
বিষায়ে সংকীর্ণ সৌধ; জলে, স্থলে, নভে
বিরোধের বীজ বুনে; নিরন্তর, নিষ্কাম প্রসবে
ভগ্নস্বাস্থ্য গর্ভিণীর ক্লিন্ন অন্তকালে
তোমার প্রতিভূ সেজে উন্নরক স্বর্গের আশ্বাসে
সাধ্বীর সদ্‌গতি যেন করি।
ঊর্ধ্বশ্বাস উৎসবের উদ্বায়ী উচ্ছ্বাসে
তোমারে পাসরি,
দারুণ দুর্দিনে যেন পূজা মেনে বিস্ময়ে শুধাই,
"স্মরণে কি নাই,
"দয়াময়, আশ্রিতেরে স্মরণে কি নাই?"

ভগবান, ভগবান,
অতীতের অলীক, আত্মীয় ভগবান,
অভিব্যাপ্ত আবির্ভাবে আজ
আমার স্বতন্ত্র শূন্যে করো তুমি আবার বিরাজ।
শকুনির ক্ষুধানিবারণে
শস্যশ্যাম কুরুক্ষেত্রে মায়াবাদ ভ'নে

সূচ্যগ্রমেদিনীলোভী যুযুৎসুরে ক্ষমিতে শেখাও
অপরের অপঘাত। তুলে নাও
আমার রথাশ্বরজ্জু, হে সারথি, তুলে নাও হাতে।
স্বার্থের সংঘাতে
বিতর্ক বিচার হানো। মর্মে মর্মে, মজ্জায় মজ্জায়
জাগাও অন্যায়, শাঠ্য। হিংস্র অলজ্জায়
পুণ্যশ্লোক সগোত্রের তুল্য মূল্য দাও দাও মোরে।
অপ্রকট সততার জোরে
আমার অন্তিম যাত্রা অতিক্রমি সুমেরুর বাধা
হয় যেন নন্দনে সমাধা,
যেখানে প্রতীক্ষারত সুরসুন্দরীরা
সুকৃতির পুরস্কারে পাত্রে ঢেলে অমৃত মদিরা,
নীবিবন্ধ খুলে,
শুয়ে আছে স্বপ্নাবিষ্ট কল্পতরুমূলে॥

কিন্তু যেথা সর্পিল নিষেধ
স্বপুচ্ছের উপজীব্যে সাধে আত্মবেদ
প্রমিতির বিষবৃক্ষে, অমিতির অচিন্ত্য অভাবে;
অন্তরঙ্গ জনতার নিবিড় সদ্ভাবে
হয়নি বাসোপযোগী অদ্যাবধি যে-নিস্তাপ মরু;
পশুপতি বাজায়ে ডমরু
মোর গোষ্ঠীপতিদের নাচায়নি যার ত্রিসীমায়,
নিরালম্ব নিরালোকে যেথা
দেবদ্বিজপ্রবঞ্চিত ত্রিশঙ্কু ঝিমায়,
মৌনের মন্ত্রণা শোনে মৃত্যুবিপ্রলব্ধ নচিকেতা,
সেখানে আমার তরে বিছায়ো না অনন্ত শয়ান,
হে ঈশান,
লুপ্তবংশ কুলীনের কল্পিত ঈশান॥

১৭ জুন ১৯৩২

উত্তরফাল্গুনী

সুমন্ত্র মহলানবিশের

করকমলে—

শর্বরী

সহসা হেমন্তসন্ধ্যা রূপজীবী যুবতীর মতো
অবার্থ ক্ষয়ের ব্যাপ্তি ঢেকেছিল অত্যন্ত রঞ্জনে।
বিরহের অবরোধে হয়েছিল মিলন স্বগত ;
বাস্তববিবাগী আঁখি প্রেমাশ্রুর মায়াবী অঞ্জনে
আচম্বিতে সনির্বন্ধ, অচিরাৎ স্বপ্নজাগরূক।
ফলত নিশ্চিন্ত কণ্ঠে তাকে বলেছিলুম সে-দিন –
অঘ্রানের অত্যাচারে পাকা পাতা ঝরে তো ঝরুক ;
পথলুপ্ত কেলিকুঞ্জে পড়ে যদি পড়ুক তুহিন ;
শুষ্ক সরোজিনী ছেড়ে উড়ে যাক সপ্তসিন্ধুপারে
যাযাবর রাজহংস পুলকিত কুলায়ের খোঁজে ;
তবু কিছু হারাবে না। মরণের অমৃত বিকারে
স্মৃতির মিসরী বীজ মন্বন্তরে যথারীতি ম'জে
অপ্রমেয় পারিজাত কল্পলতাবিতানে ফোটাবে।
কাল বৈনাশিক বটে, কিন্তু সেও স্বরূপে বিশ্বাসী ;
তাই তার গুহাচিত্রে মৃৎপ্রদীপপরম্পরা পাবে
নিবাত, নিষ্কম্প দীপ্তি। ক্ষেমংকর সে-মহাসন্ন্যাসী
বৃত্তিবিবর্তিত শূন্যে চ'লে গেলে কর্মের প্রসাদে,
অভূতপূর্ব তীর্থযাত্রী যুগে যুগে পুণ্য পীঠে জ'মে
ধূমাঙ্কিত চিত্তচৈত্য ভ'রে নেবে বর্ণাঢ্য প্রবাদে॥

অনেক শতাব্দী কাটে। প্রকীর্তিত সে-কন্দরে ক্রমে
বাদুড় বানায় বাসা ; কালপেঁচা আনাচে-কানাচে
ইঁদুরের ধ্যান করে ; কোণে কোণে অর্ধভুক্ত শব
লুকায় হিসাবী শিবা ; ভূমিসাৎ বিগ্রহের কাছে
মহীলতা জোট বাঁধে ; মধ্যে মধ্যে তুষ্ট জরদ্গব
জুড়ায় অস্রের জ্বালা কণ্টকিত দ্বারদেশে ব'সে।
তাদের পুরীষে, ক্লেদে অতীতের সার্থক প্রতীক
চাপা পড়ে নিরন্তর ; নোনা লেগে চূর্ণলেপ খ'সে

হাসে অস্থিসার শিলা। সুখভ্রান্ত ধনী নাগরিক
কচিৎ সদলবলে আসে বনভোজনে সেখানে
পণ্যস্ত্রীর হাত ধ'রে; আহারান্তে রংমশাল জ্বেলে
ভিত্তিগাত্রে চেয়ে থাকে, কলঙ্কিত কবন্ধ যেখানে
দলে বৈদেহীর উরু; ছেঁড়া পাতা, ভাঙা টিন ফেলে
সায়াহ্নে শহরে ফেরে। প্রদোষের নির্বেদ বাড়ায়
বিক্ষিপ্ত অঙ্গার, ভস্ম, অতিক্রান্ত উৎসবের গ্লানি।
তার পরে হাওয়া ওঠে, শুকতারা হঠাৎ হারায়,
দুঃস্বপ্নের বিপর্যয়ে নিশি জাগে শুধু অন্ধ হানি॥

৮ এপ্রিল ১৯৩৭

সংশয়

রূপসী ব'লে যায় না তারে ডাকা;
কুরূপা তবু নয় সে, তাও জানি;
কী মধু যেন আছে সে-মুখে মাখা;
কী বরাভয়ে উদ্ধত সে-পাণি॥

খেলে না ফণী দোদুল বেণীমূলে;
চাঁচর চুলে ভ্রমর গুমরে না;
অলকে তবু মলয় যবে বুলে,
বেড়েছে, ভাবি, বিধির কাছে দেনা॥

ঝলে না কালো চপলা চল চোখে;
অগাধে তার জ্বলে না ধ্রুবতারা;
সে-দিঠি তবু রুচির কী আলোকে;
কী বাণী রহে রহসে ভাষাহারা॥

বাজে না বাঁশি বেহাগে তার স্বরে ;
গম্ভীরাতে মুরজ নাহি ফুটে ;
অসার কথা তথাপি সে-অধরে
বেদের চেয়ে গভীর হয়ে উঠে ॥

উদয়-রাঙা নির্ঝরিণীসনে
অতুলনীয় সে-ছল-ছাওয়া হাসি ,
বাসনা তবু, হঠাৎ আগমনে
চকিত খুশি সে-মুখে পরকাশি ॥

কান্না তার মুক্তামালাসম
গহন রঙে নহে তো ধূপছায়া ;
তথাপি চাহি উপেক্ষাতে মম
ভাস্বক লোরে বল্লাহত কায়া ॥

বক্ষে তার যুগল হেমগিরি
নির্বাসিত করেনি মৃণালেরে ;
আঁচল তবু অনাঘ্রা কলি পীড়ি
কী পরিমল সঙ্গে ফেরে ফেরে ॥

অতনুতরে করেনি রচনা সে
ত্রিবলি সিঁড়ি কুটিল কটিতটে,
সতত তবু ক্ষামার আশেপাশে
টংকারিত কুসুমধনু রটে ॥

মেখলা-ঘেরা পৃথুল শ্রোণিভারে
মরালসম নহে সে মদালসা ;
তথাপি ঋজু দেহের আড়ে আড়ে
ক্ষণে ক্ষণে চমকে কী লালসা ॥

কদম-রেণু-বিছানো সরণী তো
সুনাভি হতে ছুটেনি অভিযানে
কদলী-ঊরু-তোরণ-সুশোভিত
লব্ধকাম অমরাবতীপানে ;

বিজয়ী মন তথাপি সেথা থামি
মোক্ষ মাগে পরম পরাজয়ে।
ভালো কি তবে বেসেছি তারে আমি ?
বিজ্ঞ হিয়া শিহরে তাই ভয়ে ?

৬ মার্চ ১৯৩৩

ব্যবধান

তোমারে বোঝার বুদ্ধি আজও মোরে দেয়নি বিধাতা।
তাই যবে চন্দ্রকান্ত নয়নের কৃষ্ণপক্ষ্ম পাতা
বিস্ফারি তাকাও তুমি মাঝে মাঝে মোর মুখপানে,
আমি আত্মহারা হই, সে-নিগূঢ় চাহনির মানে
ধরিতে পারি না ; শুধু অনুষঙ্গে জাগে কত স্মৃতি :
কে কবে অমনই চেয়ে জাগতিক বঞ্চনার রীতি
আমারে শিখাল যেন ; অমনই পল্লবঘন আঁখি
অমৃতের আশা দিয়ে পারিজাতকুঞ্জে মোরে ডাকি,
অনিকাম বিসংবাদে বারংবার হল পণ্ডশ্রম
পলাতক সন্ধিলগ্নে ॥

একবারমাত্র ব্যতিক্রম
ঘটেছিল সে-বিধির : হেমন্তের ঊর্ধ্বশ্বাস সাঁঝে
উদ্ভ্রান্ত কালের পায়ে ঝিল্লীর মঞ্জীর যবে বাজে
আচ্ছন্ন মাঠের প্রান্তে, পরিব্যাপ্ত মৃত্যুর ছায়ায়
আগন্তুক অঙ্গিনী আপনারে অচিরে হারায়,

নিস্তৈল দীপের মতো মানুষের নিরাশ্রয় মন
আছাড়ি-বিছাড়ি নেবে, কোনও এক সন্ধ্যায় এমন —
যুগান্তে, জন্মান্তে যেন — শাপভ্রষ্ট কে এক উর্বশী
অন্তর্দীপ্ত উল্কাসম করপুটে পড়েছিল খসি
অধরায় মূক বার্তা মর্ত্যরজে করিতে সঞ্চার।
সে-দিনে মুহূর্তকাল অবচ্ছিন্ন শরীর আমার
অম্লান, অনন্ত বীর্যে উঠেছিল উচ্চকিত হয়ে ;
অনাহত ওংকারনাদে জেগেছিল প্রতন হৃদয়ে
চিরজীব পুরূরবা॥

কিন্তু কোনও কথা কহেনি সে,
বলেনি আপন নাম ; সনাতন অন্ধকারে মিশে
নিঃসংকোচ জৈব ধর্মে করেছিল মোরে সম্প্রদান
অনির্বচনীয় তনু। ব্যষ্টির প্রাকৃত ব্যবধান
তাই তীর্ণ হয়েছিল নির্বাণের অখণ্ড শান্তিতে ;
মোদের বিশ্লিষ্ট আত্মা জাতিস্মর দেহের ইঙ্গিতে
প্রাক্তন প্রবৃত্তিপথ খুঁজে পেয়েছিল অকস্মাৎ ;
অসম্ভূতির ঐক্যে ঘুচেছিল বহুর ব্যাঘাত॥

সে-দিব্য মিলনে তুমি অধিকার দাওনি আমারে।
তোমার বিশ্রব্ধ বাক্য তাই মোর রুদ্ধ চিত্তদ্বারে
বৃথা করাঘাত হানি নিরন্তর ফিরে ফিরে যায়।
তোমার সান্নিধ্যে তাই ব'সে থাকি আমি মৌনপ্রায়
সৌজন্যের ঘটাটোপে আপনারে পাকে পাকে ঘিরে,
যে-দিকে তাকাই দেখি নিরাশ্বাস বুদ্ধির তিমিরে
মোদের বিয়োগধর্মী চৈতন্যের চক্রচর কণা
স্বতন্ত্র জ্বালার কক্ষে নিরুপায়ে করে আনাগোনা।
তুমি চাও মোর মুখে, আমি তব মুখপানে চাই :
এই ভাবি বুঝিলাম, এই ভাবি কিছু বুঝি নাই॥

২ মে ১৯৩৩

প্রতিদান *

ওগো গরবিনী, সত্রে তোমার
যত উপবাসী নিত্য জুটে,
আমি তো তাদের একজন নই,
চাব না ভিক্ষা চরণে লুটে।
তা ব'লে ভেবো না ক্ষুধা নেই মম,
জানি না অভাব নিষ্ঠুরতম,
আশা-নিরাশার দোদুল দোলায়
নামিনি পাতালে, উঠিনি কূটে।
প্রতিদানহীন দান নিতে তবু
আসিনি লোভীর সঙ্গে জুটে॥

বহু বার বিধি বহু দিক হতে
বহু বঞ্চনা করেছে মোরে।
থনে থনে তবু অলোকের স্নেহে
জীবন আমার গিয়েছে ভ'রে।
কপট পাশায় পৃথিবীপতিরে
বনে পাঠায়েছে অবনত শিরে;
দ্বৈরথরণে তারই মাহাত্ম্য
দিয়েছে আবার দ্বিগুণ ক'রে।
শাপ ও আশিস্, সুধা আর বিষ
একত্রে বিধি বিতরে মোরে॥

যদিও আজিকে সম্পদহীন
পথে পথে ঘুরি মৌন দুখে,
তবু অরূপের অক্ষয় স্মৃতি
সঞ্চিত আছে আমারই বুকে।
আমি জানি কোথা কোন্ পল্বলে
সোনার সবিতা তিলে তিলে গলে,

বকুলবনের কোন্ কোণে শশী
দেখে মুখছবি মুকুরে ঝুঁকে।
তোমার মালার যে গণ্ডে প্রহর,
অতন্দ্রিত সে আমারই দুখে॥

যদিও আজিকে বীতনিঃশ্বাস,
দীর্ণ আমার মোহন বেণু,
তবু হয়েছিল সে-স্থরে সিদ্ধি,
যা শুনে ভ্রষ্ট কল্পধেনু
ফিরে আসে গোঠে গোধূলিবেলায়,
চপলতা জাগে রাধিকার পায়,
মধুমালতীর বন্ধ্যা শাখায়
উড়ে এসে লাগে স্বজনরেণু।
দেবতারা রাতে দীপ্র নয়নে
শুনে গেছে মোর দিব্য বেণু॥

যেই বিভীষিকা ছায়ার সমান
ফেরে অহরহ রূপের পাছে,
বহু বার তার আকার, প্রকার
ব্যক্ত হয়েছে আমার কাছে।
আমার মনের আদিম আঁধারে
বাস করে প্রেত কাতারে কাতারে।
প্রাক্‌পুরাণিক বিকট পশুর
দায়ভাগ মোর শোণিতে নাচে।
সমুখে মরুর মরীচিকা ডাকে,
প্রলয়পয়োধি গরজে পাছে॥

খিন্ন হলেও আমার নয়ন
দিব্যদৃষ্টি তাতেই রাজে।

আমি জানি কেন নিগূঢ় বেদনা
নবপ্রণয়ীর মরমে বাজে।
নির্মিত আমি পরশপাথরে ;
মৃন্ময়ী হয় সোনা মোর করে।
জানি উর্বশী চিরযৌবনা
কারে পরখিতে জরতী সাজে।
বুঝি আমি কোন্ নিগম অর্থ
ইতরের অপভাষায় রাজে॥

তোমার প্রাণের পরতে পরতে
যে-অনাম তৃষা গুমরি কাঁদে,
অনুকম্পায়ী জীববীণা মোর
ঝংকৃত আজ সে-অনুনাদে।
অচিন পথের দূতরূপে তাই
প্রতিদিন এসে দুয়ারে দাঁড়াই ;
অভাবনীয়ের আহ্বান নিয়ে
অবাক নয়ন তোমারে সাধে।
নিত্য জ্বালার কলুষকালিমা
জানি ; তাই হিয়া দরদে কাঁদে॥

নিয়ে যাব আমি তোমারে যে-পথে,
সে-পথে একাকী যায় না যাওয়া,
পদে পদে তার কাঁটার আঘাত,
পাকে পাকে হাঁকে পাগল হাওয়া ;
হিতবুদ্ধির তড়িৎ ভ্রূকুটি
দূর দিগন্তে উঠে ফুটি ফুটি ;
ভ্রমে আশেপাশে হিংসালু শিবি ;
পশ্চাতে আর যায় না চাওয়া।
সর্বহারার দুর্গম পথে
নিয়ামক বিনা যায় না যাওয়া॥

তবু পরিহরি বিত্তের মোহ
রিক্ত অয়নে দাঁড়াও নেমে।
তোমার ত্যাগের দাম ধ'রে দেব
অনির্বচন অমর প্রেমে,
নিয়ে যাব যেথা নেই দেশ-কাল,
নেই ব্যাধি-জরা, ক্ষয়-জঞ্জাল,
সত্য যেখানে স্বপ্নসুষমা,
ভেদ নেই যেথা সীমায় হেমে।
স্বার্থপরের অর্ঘ্যের লোভ
ত্যাগ ক'রে এসো নিভৃতে নেমে॥

মোদের সমুখে নন্দনবন
আগলমুক্ত আবার হবে,
ব'বে পদতলে অলকানন্দা,
ইন্দ্রধনুর তোরণ নভে।
শচি ফুলশেজ ছা'বে পারিজাতে
পীযূষপেয়ালা তুলে দেব হাতে।
উধাও মদন দ্যুলোকে-ভূলোকে
মোদের প্রেমের কাহিনী কবে।
মোর অসাধ্যসাধনে, মানবী,
নিশ্চয় তুমি সিদ্ধ হবে॥

২৮ জুলাই ১৯০০

মৌনব্রত

আজি ধুলা ঝেড়ে ঝেড়ে, পুরাতন পুঁথি খুঁজে দেখি
রচিলাম যত গান, সে-সকলই মিছে আর মেকী,
নিরুদ্দিষ্ট অতিকথা, নিরর্থক বাক্যের জঞ্জাল।
বিলুণ্ঠিত শবাধারে অসংহত, অনাম কঙ্কাল
পরিহরি অবজ্ঞায়, মহাকাল করেছে যে চুরি
প্রতীকের পরমার্থ, অবিকল পদের মাধুরী,
উপমার অন্তর্দীপ্তি, উৎপ্রেক্ষার নিগূঢ় আকৃতি।
কেমনে এখন ভাবি কোনও চিরসুন্দরের দূতী
পেয়েছিল এক দিন অসংবদ্ধ এই ধ্বংসস্তূপে
অমর আত্মার সাড়া ; উচ্চকিত প্রতি রোমকূপে
অকস্মাৎ জেগেছিল প্রাণদ, প্রণব প্রতিধ্বনি
এ-বিলগ্ন শব্দচয়ে , অন্ধ অবচেতনার খনি
বৈদ্যুতিক ব্যঞ্জনায় হয়েছিল ক্ষণেক ভাস্বর ?

নৈবাশ্যের নিরুদ্দেশে হারায় কি তাই কণ্ঠস্বর
যখনই বলিতে চাই আত্মকথা তোমারে, সুন্দরী ?
তোমার অগাধ দৃষ্টি থামে যেই মোর মুখোপরি
সনিবন্ধ জিজ্ঞাসায়, তৎক্ষণাৎ বুঝি মনে মনে
এ-বারেও যা গাহিব, যাযাবর কালের লুণ্ঠনে
অনর্থক প্রলাপে তা অচিরাৎ হবে পরিণত।
জানি, জানি সুনিশ্চয় এ-বারেও পূর্বকার মতো
আত্মপ্রকাশের চেষ্টা সর্বংসহা ধরিত্রীর ভাব
অনশ্বর অবস্করে পরিপুষ্ট করিবে আবার।
ব্যয় হবে বৃথা বাক্য, লজ্জাকর আত্মনিবেদনে
কাটিবে না ব্যাসকূট। তার চেয়ে তোমার আননে ,
এমনই অবাক চোখে চেয়ে থাকা শত বার শ্রেয়।—
সংক্ষিপ্ত ভাষার শক্তি, নীরবতা অক্ষয়, অমেয়।

১৩ এপ্রিল ১৯৩৩

নিরুক্তি

আমারে তুমি ভালোবাসো না ব'লে,
দুঃখ আমি অবশ্যই পাই ;
কিন্তু তাতে বিষাদই শুধু আছে,
তাছাড়া কোনও যাতনা, জ্বালা নাই ॥

জনমাবধি প্রণয়বিনিময়ে
অনেক বেলা হয়েছে অবসান ;
বেজেছে ফলে কেবলই বৃথা ব্যথা,
পারিনি কভু করিতে বরদান ॥

এ-ভুজমাঝে হাজার রূপবতী
আচম্বিতে প্রসাদ হারায়েছে ;
অমরা হতে দেবীরা সুধা এনে,
গরল নিয়ে নরকে চ'লে গেছে ॥

অযুত নারী, তাদের প্রতিশোধে,
জাগায়ে লোভ হেনেছে অবহেলা ;
সাহারা, গোবি ছেয়েছে ভাঙা পথে,
মরমহিমা হয়েছে ছেলেখেলা ॥

অসূয়া বুকে করেছে মাতামাতি
ঝড়ের রাতে বিজুলিঝলাসম ;
চিনেছি তাতে আপন নীচতারে,
টুটেছে মান, উঠেছে বেড়ে তম ॥

মিলনে ক্ষুধা মিটেনি কোনও কালে ;
কামনা শেষে মিশেছে এসে কামে।
অন্ধ আশা রুদ্র বিরহেরে
ভাববিলাসী করেছে পরিণামে ॥

হয়তো তাই তোমার অনাদরে
আজিকে আমি হই না বিচলিত ;
শিখেছি ঠেকে ব্যর্থ ভালোবাসা,
কালের কাছে অতনু পরাজিত ॥

হৃদয় তবু বিষাদে ভ'রে ওঠে
নিরুদ্দেশ শূন্যে যবে চাই :
পাই না ভেবে শান্তিতে কী হবে,
সাধনাতে যে সিদ্ধি হেথা নাই ॥

নন্দনের বন্ধ দ্বার, জানি,
যাবে না খুলে তোমার করাঘাতে ;
অমৃতযোগে প্রেতের কানাকানি ;
ঘুচাবে ভেদ তৃপ্তি-শোচনাতে ॥

তথাপি মিছে আত্মসমাহিতি ;
নিরাসক্তি আসক্তিরই ভেক ;
নাস্তি যার পৃষ্ঠে, পুরোভাগে,
সমান তার বিবেক, অবিবেক ॥

আত্মা সদা স্বগত, একা বটে,
তাই কি হেয় দেহের পরিচিতি ?
থাক না তাতে তৃষিত অচিরতা,
বাকি যা-কিছু, সবই যে অনুমিতি ॥

৮ এপ্রিল ১৯৩৩

অহৈতুকী

কিছুই হয়নি আজ। সে কেবল ছিল নিরুদ্বেগ
মোর ক্ষিপ্র পরশের চমৎকৃত নম্র নিবেদনে ;
অন্তর্গূঢ় আহ্বানের বৈদ্যুতিক রহস্যলিখনে
উঠেনি উদ্ভাসি তার নয়নের নির্বচন মেঘ ;
আসন থাকিতে পাশে সে-দিকে সে তাকায়ে দেখেনি ;
গাঢ় সদালাপে তার অবকাশ আসেনি বারেক ;
সংবৃত বক্ষের তলে নিঃশ্বাসের রুদ্র অতিরেক
পলকে পড়েনি ধরা, তার কাছে দুঃসহ ঠেকেনি ॥

কিছুই হয়নি আজ। তবু জাগে কী শোক মরমে :
অনাথ সাধ্বীর মতো ধরা যেন ধায় অধঃপাতে ;
নিহত সুন্দর শিব অনুচর পিশাচের হাতে ;
অরাজক চরাচরে উচ্ছৃঙ্খল বিভীষিকা ভ্রমে ॥

মনে হয় একা আমি ;—পরিত্যক্ত ভিটার জঞ্জালে
পুরস্ত্রীর প্রসাধনী ফেলে গেছে কারা যাত্রাকালে ॥

১২ জুলাই ১৯৩৩

মরণতরণী

মরণ, তোমার উদ্দাম তরী
লেগেছে কি ফের ঘাটে ?
শুনি কি তোমারই বিদেশী বাঁশরী
তেপান্তরের মাঠে ?
আজ যদি তুমি এসে থাকো ঠিক,
তুলে দেব সবই তোমায়ে, বণিক ;

প্রাণের পসরা ফেরি ক'রে আর
ফিরিব না ভাঙা হাটে।
মরণ, সোনার তরণী তোমার
ঠেকেছে কি মোর ঘাটে ?

এসেছিলে তুমি প্রথমে যে-বার,
ভারি ছিল মোর বোঝা ;
বুঝিনি তখনও জীবনের সার
কেবল তোমারে খোঁজা ;
লোভী পরমায়ু নরনারায়ণে
বেচেনি তখনও মুখচুম্বনে ;
জানিনি তখনও কত নিষ্ফল
ছায়ার সঙ্গে যোঝা,
জীবযাত্রার সধূম অনল
জ্বালেনি মানের বোঝা॥

ছিল যে তখনও আশা কতিপয়,
মিটেনি কর্মতৃষা ;
শিখিনি অন্তে পরিণত হয়
পরাজয়ে বিজিগীষা।
দেখিনি অপার দ্বৈপসাগরে
মর্ত্যমানুষ একা বাস করে ;
বৃথা প্রাণপণে খেয়াঘাট বাঁধা,
আঁধারে মিলে না দিশা ;
বুঝিনি সমান হাসা আর কাঁদা
স্বপ্ন অমৃততৃষা॥

আমার প্রেমের অর্ঘ্যপ্রদানে
অপারগ সেও, জানি ;
আমিও বুঝি না সে-মূক নয়ানে
লিখিত কী গূঢ় বাণী।

বাহিরে [illegible] তবু
চারিপাশে মোর [illegible] ধুধু ;
আমি অবলোকি তাঁর করপুটে
ফলহীন মালাখানি।
বকুলফোটানো সে-চরণে লুটে
ধূলাই মাখিব, জানি॥

পথে পথে ঘুরে ছেঁড়া থলি পূরে
যা-কিছু করেছি জমা,
তুমিই, উদার, দাম দিবে তার,
করিবে দীনতা ক্ষমা।
তাই আজি তব শুভ সমাগমে
পলাতক গান ফিরে আসে শমে ;
তাই মনে হয় মঙ্গলময়
নিরুদ্দেশের অমা।
চরণে শরণ মাগি, হে মরণ,
নাও, যা করেছি জমা॥

বন্ধু এবার বোলো না, বোলো না,
'ঠাঁই নেই ভরা নায়ে'।
দোলাও ঢেউয়ের দোদুল দোলনা
আমার অচল পায়ে।
নির্বাত পালে ঝড় ভ'রে দাও।
মাথার উপরে বজ্র জাগাও।
মুষলধারার কুশল ঝাপটে
ধূলা ধুয়ে দাও গায়ে।
পরিবৃত করি মহাসংকটে
তুলে নাও, সখা, নায়ে॥

৩০ জুলাই ১৯৩৯

অননুতপ্ত

জাগরূক বীর্যের বিস্ময়ে
ভুবনবিবাগী রথে শূন্যদিগ্বিজয়ে
যবে যাত্রা শুরু হ'ল যুগান্তের অলৌকিক প্রাতে,
সে-দিন আমার হাতে
মন্ত্রপূত অসি তুমি করোনি অর্পণ।
আমার জীবন
তাই কি নিষ্ফল হ'ল তীব্র পরাজয়ে,
ঊষর, ধূসর অপচয়ে ?

সে-সুদিনে জানিতাম যদি
জ্বালায়ে মঙ্গলদীপ তুমি নিরবধি
সন্ধ্যার তোরণতলে ব'সে রবে মোর প্রত্যাশায়
তাহলে কি উদ্ধত অন্যায়
লুটাত আমার পায়ে বেণুমুগ্ধ কালীয়ের মতো ?
কালের তস্করসেনা, পিশাচ, প্রমথ,
আমার অলক্ষ্যভেদে করিত কি সভয়ে বর্জন
স্বল্পপ্রাণ সুন্দরের সরণী নির্জন,
তরুণের তীর্থযাত্রা নিরাপদ হতই কি তাতে ?

তোমার সতর্ক রাখী যদি মোরে সে-দিন পরাতে,
হয়তো তাহলে
মোর দিব্য ঐরাবত সংগ্রথিত তৃণের শৃঙ্খলে
করিত না আজি কালপাত ;
মোর বজ্রাঘাত
আঁধির চক্রান্তে প'ড়ে তবে বারংবার
হারাত না লক্ষ্য আপনার।
অমৃতের ত্যাজ্যপুত্র পরবশ উত্তরাধিকার
আবার কি ফিরে পেত আপনার গুণে,
আমাদের দেখা হত যদি কোনও আদিম ফাল্গুনে ?

কী জানি, হয়তো হ'ত তাই।
অন্তত এমন স্বপ্নে মাঝে মাঝে নিজেরে লুকাই
বিরাট ব্যর্থতা যবে নৈশ ভূকম্পনে
অসংহত ধিক্কারবর্ষণে
উলঙ্গ আত্মারে মোর চায় নিষ্পেষিতে।
স্বয়ংবরসভামাঝে তুমি যদি মোরে মালা দিতে,
তবে—তবে—। কিন্তু থাক সে-নিরর্থ কথা;
কল্পনার কোষাগারে আজিকে যে এসেছে শূন্যতা
শতমুখ দুর্দিনের উৎকোচ জোগাতে।
আর মিথ্যা অনুশোচনাতে
অন্তিম ঐশ্বর্য মোর চাহিব না করিতে গোপন॥

যদি সেই অনবগুণ্ঠন
তোমার অসহ্য লাগে, করিব না তবু অস্বীকার
যে-পথে চলেছি আমি, সেই ছিল অভীষ্ট আমার,
কহিব না যত ভুল, সে সবই দৈবাৎ।
আমার অনাদি অমা হয় যদি আবার প্রভাত,
আপনার ভাগ্যনির্বাচনে
যদি শুধু মোর ইচ্ছা মান্য হয় নবীন জীবনে,
তবে আর বার
বরণ করিব, জানি, এ-দৈন্য দুর্বার,
এ-উন্মার্গ নিঃসঙ্গতা, উন্মুখর এই বিসংবাদ,
বিধ্বস্ত রূপের সেবা, অপক্ক প্রমাদ॥

আজ আমি জানি—
বুদ্ধির বন্ধুর পথে অগ্রগামী হানি, অন্ধ হানি;
তার সীমাশেষে এসে শান্তি পায় যারা
নিরিক্ত তাদের ঝুলি, পাংশু-ধূলি-ধূসরিত তারা,
পিপাসায় কণ্ঠহারা আমার সন্ধান।
ভগবান

তাদের করেছে ক্ষমা কিনা,
আমি তা জানি না।
কিন্তু তারা নিজেদের করেছে মার্জনা ;
যত আবর্জনা
পদে পদে দিয়েছিল বাধা,
ভুলেছে সে-সব তারা ; অভিযোগ হয়েছে সমাধা।
তাদের অন্তরে
বহিরাশ্রয়িতা নাই ; তাই তারা অষ্টম প্রহরে
চায়, পায় সুষুপ্তি যে-বলে,
সে নহে যোগ্যতা যার দুশ্ছেদ্য শৃঙ্খলে
মানবতা মরে অপঘাতে॥

যদ্যপি তোমার সাথে
দেখা হত সময় থাকিতে,
উন্মুদ্র উষার লগ্নে যদি তুমি আদরে রাখিতে
তোমার বিশ্বস্ত হাত মোর করপুটে,
সিদ্ধির অস্ফুটে
সোনার স্বর্গের দ্বার খুলিত না তবু,
মোর দুঃস্থ ভবিতব্য রূপান্তর ধরিত না কভু ;
তাহলেও আজ
ধূমকেতুসম আমি করিতাম নাস্তিতে বিরাজ,
স্বরচিত অন্ধকার চিরে,
অসার্থক অপব্যয়ে আপনারে ঘিরে॥

ভবিষ্য রহস্যে ঢাকা ; তুমি আমি জানি না কেহই
কী ঘটিবে কাল প্রাতে। কিন্তু আমি অনুতপ্ত নই
আর অতীতের লাগি, আবশ্যিক উদ্‌ভ্রান্তির তরে।
উচ্চাবচ বক্রপথে সারা বিশ্ব পরিক্রমা ক'রে
যে-জীবন তব পদে পেয়েছে বিরতি,
তার অসংগতি

নিশ্চয়ই নিতান্ত বাহ্য, তার ধর্ম অনুশান্ত নয়।
তাই পুন প্রাক্তন বিস্ময়
জেগেছে আমার মনে,
লেগেছে নয়নে
মায়ামুগ্ধ প্রসাদের সুস্নিগ্ধ কজ্জল,
দ্বেষ-দ্বিধা-দ্বন্দ্বহীন, অপ্রত্যাশী মোর অন্তস্তল
জগতেরে ক্ষমা ক'রে লভিয়াছে জগতের ক্ষমা,
আবার পেয়েছে খুঁজে নবজাত সৃষ্টির সুষমা॥

৫ নভেম্বর ১৯৩৩

প্রশ্ন

সত্য কি বাসো ভালো?
নয়নে তোমার দেখি যে-রুচির আলো,
জ্বালাবে কি তাতে আরতির দীপ আমার তরে
মৌন, বিজন, মৌল নিশার নিলাজ দ্বিপ্রহরে?

অতীত দিগ্বিজয়
আজি কি সহসা পরাভব মনে হয়?
মাঝে মাঝে সাঁঝে হৃত বিত্তের অন্বেষণে
শূন্যে কি ধায় উদাস হৃদয় চক্ষের বাতায়নে?

আমি এলে খোলা দ্বারে,
ভাবো কি বিগুণ সুনিপুণ সজ্জারে?
একা ঘরে ব'সে কথার সহিত গাঁথো যে-কথা,
দেখা হলে সে কি অক্ষম লাগে, সার্থক নীরবতা?

দাঁড়ায়ে আমার পাশে
তাকাও যখন তারাখচা মহাকাশে,

হয় না কি মনে বিধির আদিম চিত্রলেখা
যাখানে সহসা চিররহস্য, সনাতন দেয় দেখা ?

মোর প্রেমনিবেদনে
দগ্ধ ট্রয়ের কাহিনী পড়ে কি মনে ?
অদর্শনের নরকযাতনা জানাই যবে,
বেয়াত্রিচে-সনে একাসনে তুমি বসো কি সগৌরবে ?

আমি চ'লে গেলে দূরে,
রম্য ব'লে কি চেনো তুমি মৃত্যুরে ?
প্রলয়শেষের সংবাদহীন বিকর্ষণে
ছোটে কি তোমার বিশ্বজগৎ নিভৃত নির্বাপণে ?

সত্য কি বাসো ভালো ?
এলাও, এলাও তবে ও-কবরী কালো ।
অনাদি অমায় হোক ত্রিভুবন নিমেষে হারা ;
শুধু জেগে থাক নিবিড় নীরবে চারটি নয়নতারা ॥

৪ অগস্ট ১৯৩৩

দুঃসময়

মোদের সাক্ষাৎ হল অশ্লেষার রাক্ষসী বেলায়,
সমুদ্ভূত দৈবদুর্বিপাকে । —
আধো-জাগা অগ্নিগিরি আমাদের উদ্ধত হেলায়
সান্দ্র স্বরে কী অনিষ্ট হাঁকে ;
বিচ্ছেদের খর খড়্গ কোথা যেন শানায় অম্বরে,
তারই প্রতিবিম্ব হেরি মুহুর্মুহু আকাশমুকুরে ;
বজ্রধ্বজ প্রভঞ্জন রথ রাখি অলক্ষ্যে, অদূরে

ফুৎকারিছে দিগ্বিজয়ী শাঁখে ;
আসে নাই সন্ধিলগ্ন, অমা তবু কবরী এলায়
বৈধব্যের অকাল বিপাকে ॥

জানো না কি, নিঃসঙ্গিনী, যদিও বা সত্য হয় আজ
আমাদের অবোধ স্বপন,
যদিও মার্জনা করে ঈর্ষাপর ক্লীবের সমাজ
যুগলের অমর্ত্য মিলন,
তথাপি নিষ্ফল সবই ।—আমাদেরই দুর্মর অতীত
অতর্কিত ভূকম্পনে বিনাশিবে বিশ্বাসের ভিত ;
প্রেতাকুল ব্যবধানে সঞ্জীবনী বাহুর নিবীত
ছিন্ন, ভিন্ন হবে অনুক্ষণ ;
অহৈতুক অপব্যয়, অশুচিত অর্চনার লাজ
আস্ফালিবে স্তব্ধ দুঃস্বপন ॥

তবুও ফেরার পথ বন্ধ হয়ে গেছে একেবারে,
কায়-মনে তোমারেই চাই ।
জানি স্বর্গ মিথ্যা কথা, তথাপি অলীক বিধাতারে
রাত্রি-দিন মিনতি জানাই ।
উন্মথি হৃদয়সিন্ধু সৃজনের প্রথম প্রভাতে
অভুক্ষিত সুধাভাণ্ড অর্পিলাম মোহিনীর হাতে ;
মৃত্যুর মাধুরী কিন্তু বাকি আছে, এসো আজ তাতে
আমাদের অমরা সাজাই ।
অসাধ্যসিদ্ধির যুগ ফিরিবে না, জানি, এ-সংসারে ;
তবু রুদ্র ভবিষ্যতে চাই ॥

আঁধার ঘনায় চোখে, তুমি ছাড়া কেউ নেই পাশে,
অন্তরীক্ষে জমে বিভীষিকা ।
লুব্ধ ভবিতব্যতারে রুদ্ধ করো দৃপ্ত পরিহাসে,
হাতে হাত রাখো, সাহসিকা ।

তোমার মাভৈ শুনে হয়তো বা লজ্জিত নিয়তি
ফিরাবে, অভ্যাস ভুলে, ঐকান্তিক সময়ের গতি,
মৃত্যুর বিক্ষিপ্ত জাল দিবে বুঝি মোরে অব্যাহতি,
শাপমুক্ত হবে অহমিকা ;
নবজাত ভগবান বিরচিবে কৃতজ্ঞ উল্লাসে
আমাদের নব নীহারিকা ॥

১ অগস্ট ১৯৩৩

জন্মান্তর

আধখানা চাঁদ রূপার কাঠির পরশে
জাগায়েছে তার মুখে কী মদির কান্তি।
নিমেষনিহত স্বচ্ছ চোখের সরসে
ত্রস্ত্ তারকা সন্ধানে সংক্রান্তি।
রেশমী কেশের ঘন, কুঞ্চিত লহরে
ভর ক'রে আছে অনাদি অসীম রাত্রি।
নিরাশানিবিড় আয়ুর অন্ত্য প্রহরে
কেন এল আজ অনাহূত বরদাত্রী ?

আলাপন তার নিগূঢ় দ্বিধায় ব্যাহত,
তবু কী মমতা লীলায়িত ভুজভঙ্গে।
আমারই মতো সে বহু বঞ্চনে আহত,
মুগ্ধ মিনতি বিজড়িত তবু অঙ্গে।
সর্বহারা সে, হিয়া ভরা পীত স্মরণে,
বহির্বিমুখী, দিবসে উলূকী অন্ধ,
ডাকে অভিসারে আমারে অমোঘ মরণে,
তবু সে মূর্ত জীবনের নির্বন্ধ ॥

জানি না কী দিব, কী চাহিব তার সকাশে।
বহু বার ঠেকে হয়েছে আজিকে শিক্ষা—
অযাচিত দান দাতার দম্ভ প্রকাশে,
দীন ভিখারীর হীনতা বাখানে ভিক্ষা।
মর্ত্যের ক্ষুধা মিটে না মজুরি ব্যতীত,
স্বর্গের সুধা ইন্দ্রজিতেরই ভোগ্য,
মোর অসাধ্যসাধনের যুগ অতীত,
তবে আর কবে হব ও-প্রেমের যোগ্য?

নামুক অরতি অতএব মোর শরীরে,
কামনার বানে বাঁধ বেঁধে দিক ধৈর্য,
আত্মবোধের অন্তরতম অরিরে
হানুক মৃত্যু মহানিদ্রার স্থৈর্য।
হয়তো তবেই নব জনমের প্রভাতে
অমিত বীর্যে বিঁধে অগোচর লক্ষ্য
জিনে নেব তারে স্বয়ংবরের সভাতে,
সম্ভাবনায় হব তার সমকক্ষ॥

সে-দিনে তো আর হবে না অপব্যয়িত
কিশোর চাঁদের জাদুকর অভিসন্ধি;
চিরন্তনীর চিরাভিলষিত দয়িত
অনাহত ভুজে করিবে সতীরে বন্দী;
টুটিবে মেখলা, খ'সে যাবে তার কবরী,
তীব্র পুলকে ঘুচিবে সকল লজ্জা;
তুঙ্গী গ্রহেরা হবে বাসরের প্রহরী,
চ্যুত তারাদল বিরচিবে ফুলশয্যা॥

১ নভেম্বর ১৯৩৩

বিলয়

চিকন চিকুর তব হবে যবে তুষারধবল,
রজনীগন্ধার যষ্টি ওই ঋজু বরদেহখানি
তাকাবে ধূলার পানে, উবে যাবে রতিপরিমল ;
উত্তর হাওয়ার স্পর্শে ত্রস্ত হাতে অর্গল সন্ধানি
যে-দিন শুনিবে তুমি পাতা-ঝরা হিম নিরালোকে
ফেরে মাতামাতি ক'রে আগন্তুক মৃত্যু আর ক্ষয়,
সে-দিনে দু ফোঁটা অশ্রু গালায়ে কি নির্বাপিত চোখে
সহসা ফুরাবে তব সন্তাপের অন্তিম সঞ্চয় ?

বুঝিবে কি, হে সুস্মিতা, অতন্দ্রিত সে-অমানিশীথে—
যে তোমারে চেয়েছিল পূর্ণিমার প্রগল্‌ভ উচ্ছ্বাসে,
যদি তারে ক্ষণতরে তন্বী তনু উপহার দিতে
তিলার্ধ প্রভেদ তবু ঘটিত না শেষ সর্বনাশে ?
বুঝিবে কি সে-দুর্দিনে—উদাসীন বিধাতার কাছে
তুল্যমূল্য আমাদের ধৈর্য আর আত্মবিস্মরণ,
মৃন্ময় বিশ্বের চূড়ে নটরাজ অহর্নিশি নাচে,
চিরপ্রতিষ্ঠার শত্রু ভ্রান্তি নয়, অমোঘ মরণ ?

হেমন্তের প্রান্তে এসে বুঝিবে কি—উত্তরফাল্গুনী
উদেনি দিগন্তে তব আকস্মিক নির্ভার প্রমোদে ;
ইচ্ছা ছিল তার মনে আসঙ্গের ইন্দ্রজাল বুনি
সুন্দরের পদ্মবনে মত্ত কালহস্তীরে সে রোধে ;
সে জানিত সময়েরে শুধু গতি পরাজিতে পারে,
তাই তার মুগ্ধ দৃষ্টি হয়েছিল আবেগে উতল ;
সে জানিত বৃথা বাক্য, জগতের শূন্য অন্ধকারে
শরীরের রূপরেখা আমাদের অনন্ত সম্বল ?

নিবিদ ভাষায় যবে নিরাকার নাস্তি বাখানিবে
অনঙ্গ আত্মার ঋদ্ধি, বুঝিবে কি সে-দিন প্রথমে—

প্রণয়ের জয়স্তম্ভ ঠেকে গিয়ে যদিও ত্রিদিবে,
বদ্ধমূল ভিত্তি তার তবু কার্য-কারণ-কর্দমে ;
নিরাকৃত মানবাত্মা অঙ্গারিত সৌর তেজসম
নিঃস্বপ্ন নিদ্রায় মগ্ন ইন্দ্রিয়ের প্রাক্তন খনিতে,
উন্মুদ্র প্রবৃত্তিমার্গ পারে শুধু ভেদিতে সে-তম,
পারে শুধু দাহ্য দেহ দীপ্র বাণী তারে ফিরে দিতে ?

যবে কায়-মনে চাবে নিরুদ্দেশ বসন্তসখারে,
নিঃশেষিবে ক্ষীণ শ্বাস নাম, শুধু নাম উচ্চারণে ;
যাত্রার উদ্বেগে যবে ভাবিবে, সে খেয়াঘাটপারে
পরাবে মন্দারমাল্য তব গলে প্রেমাভিভাষণে ;
তখন স্মরণ কোরো সে জানিত কোনও খেয়া নাই,
ডুবে যায় মৃত্যুতরী জনহীন দ্বীপের সংঘাতে ;
জন্মপরম্পরামাঝে অমৃত সে খুঁজেছিল তাই,
স্থাপিতে পারেনি আস্থা নিরালম্ব, নশ্বর আত্মাতে ॥

১৩ নভেম্বর ১৯৩৩

মহানিশা

মরণ, তুমি তো আসিবেই এক দিন,
এসো তবে আজ বেগে।
দশমীর চাঁদ আকাশে তন্দ্রাহীন
ভর ক'রে আছে বীতবর্ষণ মেঘে ;
সুদূরের হাওয়া কোথা নারিকেলবনে
কার আহ্বান নিবিদ ভাষায় ভণে ;
রজনীগন্ধা রয়েছে কী প্রয়োজনে

প্রচুর পরাগে জেগে ;
শুধেছে বিধাতা চিরজীবনের ঋণ ;
এসো, হে মরণ, এসো আজ দ্রুত বেগে ॥

আজি প্রেয়সীর সুরভিনিবিড় কেশে
দেখেছি তোমার ছায়া ;
চিনেছি যে তার অযাচিত আশ্লেষে
কত বিমোহন তব বিরতির মায়া।
এখনও শ্রবণে ধ্বনিতেছে অবিকার
গাঢ় কণ্ঠের নিরুপাধি ঝংকার :
স্মৃতিসঞ্চিত ঘন চুম্বনে তার
এখনও শিহরে কায়া ;
এখনও জগৎ লুটে মোর পাদদেশে ;
ঘনাও, মরণ, এই বেলা তব ছায়া ॥

কী জানি, হয়তো, কেবলই স্বপন দেখি,
ফুরাবে সকলই প্রাতে।
প্রগল্‌ভ পণ অনাহত রহিবে কি
প্রতিদিবসের প্রচণ্ড সংঘাতে ?
দেবদুহিতার ধুলামাখা খেলাঘরে
ভাঙা পুত্তলি প'ড়ে রব অনাদরে,
তবু লোভী কাল দৈব কোপের ডরে
লবে না আমারে হাতে।
মদির নিশায় ভিক্ষুরে অভিষেকি,
অনুশোচনায় জ্বলিবে না সে কি প্রাতে ?

তার চেয়ে ভালো আজি তব রসায়নে
আদি ভূতে ফিরে যাওয়া,
শুক্ল শশীর শাশ্বত বিকিরণে
খোলা বাতায়নে সুপ্ত সে-মুখে চাওয়া,

মৃদুল মলয়ে বরতনুখানি ঘিরে
কম্র কামোদে কামনা জানানো ধীরে,—
ধূলিরেণু হয়ে ঢেকে সারা পৃথিবীরে
তারণ চরণ পাওয়া,
ঈর্ষা জাগায়ে পুরুরবাদের মনে
এ-মহানিশায় সনাতনে মিশে যাওয়া ॥

৩ আগস্ট ১৯৩৩

জাগরণ

মিলননিবিড় রাত্রি পরিকীর্ণ নিখিল ভুবনে,
বিরাজে প্রশস্ত কক্ষে তারই শান্তি, তারই নীরবতা ;
চাহি খোলা বাতায়নে, দেখি তারই অনাদি বারতা
মর্মরিছে মুহুর্মুহু স্বপ্নাবিষ্ট দেওদারবনে ॥

নাই সে-নিভৃত লোকে নগরের উগ্র উতরোল,
মর্মভেদী পরচর্চা বিষায় না যমকজীবন,
অলক্ষ্যে অলস নদী করে শুধু নৈশ সংকীর্তন,
কিংবা সে নিদ্রিত, শুনি দূরাগত কালের কল্লোল ॥

উদার অলকানন্দা হয়ে গেছে মহাকাশ পার
ছড়ায়ে নক্ষত্র-ফেনা ; বেঁধেছে অসংখ্য জোনাকিরে
রজনীগন্ধার গুল্ম ; সম্মিলিত তাদের ঝিঁঝিরে
মনে হয় অমাবস্যা সুদক্ষিণ, সজীব, নির্ভার ॥

তোমার চিক্কন দেহে বিজড়িত কী দিব্য কুহক ;—
ভাস্বর অলজ্জ কটি, দৃপ্ত কুচ, নিঃসংকোচ উরু,
অধরে সিতাভ হাসি, মুক্ত কেশে উথলে অগুরু,
সাবলীল আত্মদান স্নিগ্ধ চোখে এনেছে ঝলক ॥

দেখিতে পাই না কিছু। তবু যেন হয় অনুমান
অরূপ আনন তব চিত্রার্পিত অপূর্ব প্রসাদে,
প্রতি অঙ্গসন্ধিমাঝে নম্র ছায়া কত্র নীড় বাঁধে,
সঞ্চিত গভীরে তব নিঃশ্রেয়স, নিবৃত্তি, নির্বাণ ॥

তন্ময় আমার চিত্ত, প্রীত বুদ্ধি, তদ্‌গত শরীর,
তথাগত অন্তর্যামী আত্ম-পর সবারে ক্ষমেছে,
ব্যক্তিতার অবরোধ মুহূর্তেকে চূর্ণ হয়ে গেছে,
সার্বভৌম যৌবরাজ্যে প্রত্যাগত যযাতি স্থবির ॥

সাঙ্গ কি সহস্র বর্ষ ? গর্জে নিচে প্রচ্ছন্ন নরক,
পরশ্রীকাতর ইন্দ্র ঊর্ধ্ব হতে করে বজ্রাঘাত ;
চমকে নয়ন মেলি, তমিস্রার আবিল প্রপাত
ডুবায় স্বপ্নেরে মোর ; শুরু হয় ধৈর্যের পরখ ॥

সুপ্তিশান্ত গৃহদ্বারে হানা দেয় বিনিদ্র নগর ;
সচকিত নিঃসঙ্গতা বাহুপাশে হরে মোর শ্বাস ;
মন্থর কালের স্রোতে স্তূপীকৃত হয় সর্বনাশ ;
মোদের বিচ্ছিন্ন করে মৃত্যুপম ব্যবধি দুস্তর ॥

১৭ নভেম্বর ১৯৩৩

মাধবী পূর্ণিমা

দিনের দহনশেষে সাকীসম সিত সুরা ল'য়ে
মাধবী পূর্ণিমা যবে দেখা দেয় মোর বাতায়নে,
আত্মধিক্কারের জ্বালা শত গুণ হয় সে-সময়ে,
অবুঝ অন্তর মোর ব্যর্থতার জপমালা গণে ॥

বন্ধুরা বিস্ময়ে চাহে, প্রতিবাদ করে সমস্বরে ;
কেহ বা প্রকাশে উষ্মা ; সকৌতুকে শুধায় কেহ বা—
কবিত্ব আমার ধর্ম, তাই বুঝি কৌমুদীজাগরে
পেচকীয় দুঃখবাদ লাগে মোর এত মনোলোভা ॥

কেমনে তাদের বলি নই আমি অমরাবিলাসী,
মর্ত্যের সূচ্যগ্র কোণ একমাত্র অভীষ্ট আমার ;
ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, স্থিতি, সে-সবে এ-হৃদয় উদাসী,
উত্থান, পতন মম ক্ষণিকার নিষ্ঠায় অসার ॥

বিচ্ছেদ-বাদল-রাতে মিলেছিল যে-শেষ চুম্বন,
রাকারে বিফল করে আজও তার নশ্বর স্মরণ ॥

২৮ জুন ১৯৩২

ডাক

কোন্ কালে সেই চকিত চোখের দেখা
কী জানি সে এখন কোথায় থাকে ।
নিশীথ রাতে তারার চিত্রলেখা
তবু আমায় তার কাছে আজ ডাকে ।
হয়তো সে-দিন শুধুই দেহের টানে
তাকিয়েছিল আমার মুখের পানে ;
ফাগুন কেবল বাহ্য বরদানে
কল্পলতার কান্তি দিল তাকে ।
আজকে তবু আত্মা আমার একা ;
জানি না আর কোন্‌খানে সে থাকে ॥

বুঝেছিলুম সে-দিনে, আজ আবার
এই কথাটাই নূতন ক'রে বুঝি

ইচ্ছা ছিল তার কাছে যা পাবার,
সেই অমৃত করেনি সে পুঁজি।
তার ছিল যা, সব জীবেরই আছে;
সেই ঋজুতা য়ুকালিপ্‌টাস্‌ গাছে,
তেমনি ক'রেই মত্ত ময়ুর নাচে,
সেই প্রদাহ পশুর চোখেও খুঁজি।
যৌন জাদু নিমেষে হয় কাবার
বুঝেছিলুম সে-দিন, আজও বুঝি॥

তবু যখন মধুফুলের বনে
জড়িয়ে ভুজে অদৃশ্য তার কায়া
অতল, কালো, ডাগর সে-নয়নে
দেখেছিলুম তারার প্রতিচ্ছায়া,
জেগেছিল তখন আচম্বিতে
ভূমার আভাস যুগল বিপরীতে,
চিনেছিলুম অবাক সমাধিতে
মহাবিদ্যা যে, সেই মহামায়া।
ফাঁক রাখেনি কোথাও ত্রিভুবনে
সাধারণীর সামান্য সে-কায়া॥

বসন্ত আজ সুদূরপরাহত,
হেমন্ত ওই দোদুল অন্ধকারে;
চুকিয়ে দিয়ে পাওনা-দেনা যত
দাঁড়িয়ে আছি খেয়াঘাটের পারে;
চপল ভ্রমর অন্ধ নেশার ঝোঁকে
আর ফিরে না প্রলাপ ব'কে ব'কে,
মনের চাকের মধুর নিরালোকে
আজ সে ঘুমে অসাড় একেবারে।
দুগ্রহ সব তত্ত্ব ওতপ্রোত
এই নিরাকার, নিখিল অন্ধকারে॥

তবু আবার তারার প্রদীপ জেলে
আমায় প্রাচীন সংকেতে সে ডাকে।
এগিয়ে গেলে জ্ঞানের বোঝা ফেলে
তার দেখা কি পাব পথের বাঁকে?
আজ বুঝেছি সে-দিন ক্ষণিক ভুলে
উদ্বায়ী দান দিইনি তাকে তুলে,
তীর্থে যেতে রাজীবচরণমূলে
কাটাইনি কাল দৈবদুর্বিপাকে।
সত্য কেবল দেহের দয়ায় মেলে;
তাই সে আমায় ডাকে, আবার ডাকে॥

২৩ নভেম্বর ১৯৩৩

দ্বন্দ্ব

মনেরে বুঝায়ে বলি মৃত্যুমাত্র নিশ্চিত ভুবনে:
গ্রহ, তারা, নীহারিকা ধায় নিত্য বিয়োগের পথে;
বস্তুর দুর্দান্ত চিতা অনির্বাণ শূন্যের সৈকতে,
কালের অদৃশ্য গতি ব্যক্ত শুধু বিপ্লববর্ধনে॥

সালোক্য, সাযুজ্য, সঙ্গ, সে কেবলই সম্ভব স্বপনে;
বিসংবাদ, বিকর্ষণ আর্যসত্য জাগ্রত জগতে;
ছুটি মোরা মর্ত্যচর আত্মঘাতী আবর্তের স্রোতে,
ফেনিল সম্মোহে মেতে, লুপ্তকেন্দ্র নাস্তির শোষণে॥

হার মানে খিন্ন মন। দেহ কিন্তু অক্ষয় উৎসাহে
পরিব্যাপ্ত ব্যবধানে রচে সদা বাসনার সেতু;

তন্ময় মুহূর্তমাঝে অনন্তের আবির্ভাব চাহে ;
দেখে জন্ম-মরণেরে কণ্ঠাশ্লেষে বাঁধে মীনকেতু ।

আজিকে দেহের পালা ; রিক্ত শেজে শুয়ে তাই ভাবি
হয়তো বা তারই কাছে প'ড়ে আছে অমরার চাবি ।

৪ সেপ্টেম্বর ১৯৩২

প্রতিপদ

সমাপ্ত সংরক্ত রাত্রি । —শ্রান্ত দোলপূর্ণিমার শশী,
যৌবনের শিখিপুচ্ছে বিমণ্ডিত বৃদ্ধের সমান,
ঘুমে অভিভূত হয়ে করে যেন হঠাৎ প্রমাণ
আকাঙ্ক্ষার বাচালতা । জাতিস্মর উদ্বেগের মসি
প্রাগুষার পাণ্ডু মুখে অনর্থের অপপাঠ লিখে :
থমকে সে মধ্যপথে, তুলে ধ'রে নিবাত প্রদীপ
তাকায় গন্তব্যপানে ; নীড়ে নামে, দেখে, চতুর্দিকে
বাদুড়-পেঁচার ঝাঁক । অপুষ্পক ত্রিভঙ্গিম নীপ
দুঃস্বপ্নে প্রলাপ বকে, শব-শিবা-সর্পে পরিবৃত ।
সমাপ্ত সংরক্ত রাত্রি ; চূর্ণমুষ্টি ধূলিধূসরিত ॥

কষিত-কাঞ্চন-কান্তি, সুমধ্যমা কুমারী, অহনা,
আর ফিরে আসিবে না অলজ্জিত স্বচ্ছ শ্বেতাম্বরে
দীর্ঘল তনিমা ঘিরে, অরুণিম বরাভয়ে ভ'রে
নীলকান্ত সুধাভাণ্ড । বিমর্দিত ফুলের গহনা,
পর্যুষিত কারণের উগ্র গন্ধ উতল নিঃশ্বাসে,
সর্বাঙ্গে পাংশুল ক্লেদ, তন্দ্রাবিষ্ট পৃথুল পৃথিবী
নির্জন নৈমিষারণ্যে । ইতিমধ্যে সন্নত আকাশে
রুগ্‌ণ আলোকের বীজ, পুরাতন, শীত, পরজীবী,

উগ্র করে ধ্বংসকীট। আত্মহারা স্বয়ং সবিতা :
পৈতৃক প্ররোহে আজ পরিপ্লুত অজের ছুহিতা ॥

সুবর্তুল পুষ্করিণী পরিপূর্ণ কানায় কানায়
অচ্ছোদ সবুজ জলে, উচ্চকিত নবদূর্বাদলে
অবরুদ্ধপরিকর। চিত্রার্পিত মুকুরের তলে
দিগন্তের যুগ্মগিরি শোথসান্দ্র পীবরতা পায়
সূচ্যগ্র অণিমা টুটে। মায়াময় সে-ছায়ার কাছে
ভাসে এক মজ্জমান স্নাতকের শৈবালিত দেহ
হরিৎ হেলঞ্চে ঢাকা : নিরন্তর কাকে যেন যাচে·
অনিকেত চক্ষুদ্বয় ; সুতা-কান্তা-জননীর স্নেহ
অসপত্ন আচম্বিতে উৎকণ্ঠিত মুমূর্ষায় তার।—
পুরুজিৎ কুরুক্ষেত্রে উর্বশীর শেষ অভিসার ॥

শত শ্রেয় মরুভূমি—সম্মার্জিত সন্তপ্ত সিমূমে :
বন্ধ্যা ফণিমনসায় কণ্টকিত, বিষাক্ত, ধূসর ;
পরিত্যক্ত মীনরাজ্য, নিঃসলিল তরঙ্গে ঊষর :
নিরিন্দ্রিয় মহাশূন্য, উদাসীন উদ্বায়ী মর্মরে।
অতিকায় ক্রকলাস অস্থিসার রুদ্র পরিপাকে ;
প্রপন্ন অজ্ঞাতবাসে পাশবিক পুরাণপুরুষ ;
শিখরীর মন্ত্রগুপ্তি পঙ্গু করে মৃগতৃষ্ণিকাকে ;
উন্মুক্ত গগনে জাগে নিরঞ্জন নিত্য, নিরঙ্কুশ।
নির্বাণ সর্বতোভদ্র : প্রতিবেশী নীহারিকা যত
পলায় সংসর্গ ছেড়ে। অকস্মাৎ ত্রিশঙ্কু স্বগত ॥

৫ এপ্রিল ১৯৩৭

সংবর্ত

মুখবন্ধ

মহাকবিরা নাকি নিরবধি কাল ও বিপুলা পৃথ্বীর পোষ্যপুত্র ; এবং তাঁদের পাশে আমি শুধু উদ্বাহু বামন নই, এমনকি তাঁরা যদি রসস্রষ্টা হন, তবে রসজ্ঞ-উপাধিও আমাকে সাজে না। অন্ততপক্ষে আমার লেখায় আধুনিক যুগের স্বাক্ষর সুস্পষ্ট ; এবং ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আর যথাশক্তি অনুশীলনের ফলে আজ আমি যে-দার্শনিক মতে উপনীত, তা যখন প্রাচীন ক্ষণবাদেরই সাম্প্রতিক সংস্করণ, তখন না মেনে উপায় নেই যে আমার রচনামাত্রেই অতিশয় অস্থায়ী। কিন্তু অচির আর অনীহ একই বিশেষণের প্রকারভেদ নয় ; এবং বৌদ্ধদের মতো বৈনাশিক ব'লেই, আমি যেমন কর্মে আস্থাবান, তেমনই আমার বিবেচনায় স্বাবলম্বী কর্তা জগৎ-সংসারের মূলাধার।

সাহিত্যে উক্ত বিশ্বাসের প্রয়োগে প্রেরণা-নামক দায়িত্বহীনতার মর্যাদা-লাঘব অবশ্যম্ভাবী ; এবং তৎসত্ত্বেও কাব্যভুক্ত বিষয়ের নির্বাচনে বিষয়ীর স্বায়ত্তশাসন যৎকিঞ্চিৎ বটে, তথাচ প্রবৃত্তি ও প্রতিবেশ-প্রভাবিত প্রসঙ্গের প্রকাশ যেহেতু ঐকান্তিক সংকল্প তথা অবিশ্রান্ত অধ্যবসায়ের অপেক্ষা রাখে, তাই কবিতা-বিশেষের জন্মকালে পাঠকের প্রয়োজন নেই, তার পরিণত রূপই সাধারণের বিচার্য। অবশ্য মানুষের শ্রেষ্ঠ সিদ্ধিও অসম্পূর্ণ, এবং এমন শিল্পসামগ্রী বিরল যা আদ্যন্ত অনবদ্য অথবা যার শ্রীবৃদ্ধি অভাবনীয়। তাহলেও যে-কোনও সময়ে লেখকের তদানীন্তন প্রযত্নের সমস্তটা যে-লেখায় বর্তায়নি, তার প্রচার আমার মতে সাহিত্যসাধনার প্রতিকূল, এবং সেই জন্যে পদ্যরচনায় তারিখের উল্লেখ আমার চক্ষে আত্মশ্লাঘনের হাস্যকর প্রয়াসমাত্র।

অর্থাৎ সংস্কারসাধ্য জেনে, কোনও রচনাকে অপেক্ষাকৃত স্থায়ী আকার দিতে আমার বিবেকে বাধে ; এবং আমার দীর্ঘসূত্র স্বভাবে অনধ্যবসায়ের আধিক্যবশত গত পনেরো বছরের কোনও লেখাকে আমি এখনও গ্রন্থস্থ করিনি। কারণ দ্বিতীয় মহাসমরের কয় বৎসর আত্মশুদ্ধির অবসর মেলেনি ; এবং তার পরে অপ্রকাশিত রচনাবলী যথাসম্ভব শুধরেছি বটে, কিন্তু ইতিমধ্যে পারিপার্শ্বিকের পট এত দ্রুত বদলেছে যে সমসাময়িক ইতিহাসের কার্যকারণ-শৃঙ্খলা আজ হয়তো অনেকের মনে নেই। অথচ উক্ত যুদ্ধ যে-ব্যাপক মাৎস্য-

ন্যায়ের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম, তার সঙ্গে পরবর্তী কবিতাসমূহের সম্পর্ক অকাট্য; এবং স্থানাভাব-ব্যতিরেকে সেই অপরিমেয় পটভূমিতে এগুলোর উপস্থাপন দুষ্কর ভেবেই, প্রত্যেকটার কালক্রম অগত্যা সূচিত হল।

তৎসত্ত্বেও আমার কাব্যজিজ্ঞাসায় আধার আধেয়ের অগ্রগণ্য; এবং জীব হিসাবে আমি বহির্জগতের অধীন বটে, কিন্তু এ-বইয়ে অসামান্য অনুভূতির অভাব শোচনীয়। এমনকি কোনও বিশিষ্ট রীতির ক্রমবিকাশ পর্যন্ত এ-পুস্তকে লিপিবদ্ধ নেই; এবং বিশ বৎসর যাবৎ আমি যদিও জ্ঞানত গদ্য-পদ্যের নির্বিরোধ চাই, তবু এখনও আমার সাধ ও সাধ্য মাঝে মাঝে পরস্পরের বাধ সাধে। ফলত ছন্দোরক্ষার খাতিরে অথবা মিলের গরজে সাধু ও প্রাকৃত ভাষার সংমিশ্রণ, নামধাতুর বাহুল্য, বিভক্তিবিপর্যয়, ইত্যাদি বাংলা কাব্যের অনেক অভ্যাসদোষ একাধিক কবিতায় র'য়ে গেল; এবং ত্রুটিসম্পন্ন দেখেও, সেগুলোকে যেকালে ছাড়তে পারলুম না, তখন নিজের প্রতি যে-নিরাসক্তি সৎসাহিত্যের অনন্য লক্ষণ, তাকে আমার আয়ত্তে আনতে দেরি আছে।

সে যাই হোক, মালার্মে-প্রবর্তিত কাব্যাদর্শই আমার অন্বিষ্ট: আমিও মানি যে কবিতার মুখ্য উপাদান শব্দ; এবং উপস্থিত রচনাসমূহ শব্দপ্রয়োগের পরীক্ষা-রূপেই বিবেচ্য। ছন্দে শৈথিল্যের প্রশ্রয় না দিয়ে, লঘু-গুরু, দেশী-বিদেশী, এমনকি পারিভাষিক, শব্দও আচরণীয় কিনা, সে-অনুসন্ধানও হয়তো কোনও কোনও কবিতায় রয়েছে: এবং শব্দ ও ছন্দ উভয়ই যেহেতু পরজীবী, তাই বর্তমান শব্দবিন্যাস ও ছন্দোব্যবহারের ভূমিকা লেখকের ভাবনা-বেদনা যার বহিরাশ্রয় আবার ইদানীন্তন ঘটনাঘটন। কিন্তু একই মলাটের ভিতরে কতিপয় পুনর্লিখিত কৈশোরিক কবিতাও স্থান পেয়েছে; এবং সেগুলো জাতিতে এতই আলাদা যে এখানে লেখা-কটার অনধিকার প্রবেশ আমার লজ্জাকর মমত্ববোধের অপর নমুনা।

কারণ আমি যখন পদ্য লিখতে শিখছিলুম, সে-সময়ে যাঁরা কবিযশঃপ্রার্থীদের অনুকার্য ছিলেন, তাঁরা ভাবতেন সার্থক কাব্যের প্রধান গুণ স্বাচ্ছন্দ্য; এবং সেই জন্যে উচ্ছ্বাসসংবরণ যে সাহিত্যসাধনার আদ্যকৃত্য, এ-কথা বুঝতে বুঝতে আমার অর্ধেক যৌবন কেটে গিয়েছিল। পক্ষান্তরে তদানীন্তন অখ্যাতকুলশীলের ভাগ্যে লেখা ছাপানোর সুযোগ আসত কালে-ভদ্রে; এবং আমার প্রথম বই "তন্বী"-প্রকাশে রবীন্দ্রনাথের অনুমতি ১৯৩০ সালের আগে মেলেনি। সুতরাং সে-সংকলন থেকে আমার তরুণ বয়সের অনেক লেখা বাদ পড়েছিল; এবং

বছর-দুয়েক পূর্বে সমস্ত কবিতা একত্রে গাঁথার ইচ্ছায় পুরাতন খাতা-পত্র ঘাঁটতে ঘাঁটতে আমি অনুমান করেছিলুম যে সে-সকল রচনা কেবল আমারই অপকীর্তি নয়, তখনকার আদর্শও বেশ খানিকটা অপরাধী।

অন্তত এমন বিশ্বাস নিতান্ত অমার্জনীয় ঠেকেনি যে আজকের আবহে লিখতে বসলে, উক্ত আধো-আধো কবিতার দু-একটা হয়তো অল্প-বিস্তর উৎরে যেত; এবং আরম্ভে মনে হয়েছিল অর্বাচীন কল্পনার উদ্দাম উচ্ছ্বাস তাড়াতে পারলেই, যেগুলোতে বক্তব্যের কিছুমাত্র বৈশিষ্ট্য আছে, সেগুলোর উদ্ধার সম্ভবপর। কিন্তু কাগজ-কলম নিয়ে বসতেই দেখলুম যে ক্রোচে-প্রস্তাবিত উক্তি ও উপলব্ধির অদ্বৈত অক্ষরে অক্ষরে সত্য; এবং প্রত্যেকটার বেলায় যদিও যৎপরোনাস্তি প্রয়াস পেয়েছি যাতে মূল ভাব ও চিত্রকল্প, এমনকি সহনীয় মুদ্রাদোষ পর্যন্ত, অপরিবর্তিত থাকে, তবু ভাষার তারতম্যে, তথা আয়তনের সংক্ষেপে, লেখাগুলো যে-রকম বদলেছে, তার সঙ্গে বোধহয় অভিব্যক্তিবাদীর জন্মান্তরই তুলনীয়।

সমগ্র গ্রন্থাবলী প্রকাশের সুবিধা ঘটলে, এই নক্‌শগুলোকে হয়তো অন্যত্র সরানো যাবে; কিন্তু তত দিন অবধি নিত্য মুহূর্তের দিগন্তে এগুলো অতীতের মরীচিকা; এবং এ-কটাকে যথাসাধ্য শোধরাতে পেরেছি ব'লে, যখনই ভাবি যে অন্তত কলাকৌশলে গত ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছরে আমি অনেক দূর এগিয়েছি, তখনই মনে পড়ে যে প্রসঙ্গ ও প্রকরণের পার্থক্য যেহেতু অবৈধ, তাই, অভিজ্ঞতায় আমি প্রাগ্রসর হলে, ও-জাতীয় সংস্কারের প্রবৃত্তি কখনও আমার জাগত না। অগত্যা বৈনাশিক ক্ষণবাদেই বর্তমান মুখবন্ধের সূচনা ও সমাপ্তি; এবং সে-বিশ্ববীক্ষায় যেমন আত্মপ্রসাদের অবকাশ নেই, তেমনই তার মধ্যে প্রতিবিপ্লবী শ্রেণীস্বার্থের প্রত্যাদেশ খোঁজা পণ্ডশ্রম।

কলকাতা। ৩১ মে ১৯৫৩

নান্দীমুখ

তোমার যোগ্য গান বিরচিব ব'লে,
বসেছি বিজনে, নব নীপবনে,
পুষ্পিত তৃণদলে।
শরতের সোনা গগনে গগনে ঝলকে ;
ফুকারে পবন, কাশের লহরী ছলকে ,
শ্যাম সন্ধ্যার পল্লবঘন অলকে
চন্দ্রকলার চন্দনটিকা জ্বলে ।
মুগ্ধ নয়ান, পেতে আছি কান,
গান বিরচিব ব'লে ॥

তবু অন্তরে থামে না বৃষ্টিধারা :
আর্দ্র, ধূসর, বিদেহ নগর,
সংসর প্রেত-পারা,
প্রকৃতির লীলা আবরি কুহেলীকানাতে
ইঙ্গিতে যেন চায় অভিযোগ জানাতে ,
তন্ময় ধ্যান ভেঙে যায় তার হানাতে ।
প্রচ্ছদে ওই ছায়াপাত করে কারা ?
কী নাম শুধাই — উত্তর নাই ,
ঝরে শুধু বারিধারা ॥

মুখে এক বার তাকায়ে নির্নিমেষে,
শূন্যোদ্ভব দেব, না দানব,
আবার শূন্যে মেশে ।
বুঝি তারা শুধু কুজ্ঝটিকার চাতুরী :
তবু তুলনার ধন্দ জাগায় মাধুরীই ;
প্রতীকপ্রতিম তাদের কাস্তে, হাতুড়ি
ফসল মুড়ায়, মানমন্দির-পেষে ,
মূর্ত নিষেধ, মূক নির্বেদ
তাকায় নির্নিমেষে ॥

কখনও কখনও মনে হয় যেন চিনি—
বিদ্যুতে লেখা হেন রূপরেখা
চীনে পটে বন্দিনী।
স্পেনেও হয়তো অমনই অঙ্গভঙ্গি
চিত্রার্পিত অসং:ি ‍ন সঙ্গী ;
সেখানেও আজ নিভৃত বিলাস লঙ্ঘি,
পথে উপবনে পরদেশী অনীকিনী।
স্পেন থেকে চীন প্রদোষে বিলীন ;
অথচ তাদের চিনি॥

ভালোবেসেছিল তারাও, আমার মতো
সীমাহীন মাঠ, আকাশ স্বরাট্‌,
তারারাশি বাতাহত।
গড্ডলিকার সহবাসে উত্যক্ত
তারা খুঁজেছিল সাযুজ্য সংরক্ত,
কল্পতরুর নত শাখে সংসক্ত
শুক্ল শশীরে ভেবেছিল করগত।
নগরে কেবল সেবিল গরল
তারাও, আমার মতো॥

কিন্তু শূন্যে ছড়ায়ে ঊর্ণাজাল,
মধুমক্ষীরে উপবাসে ঘিরে
জাগ্রত মহাকাল।
জনপ্রাণীও পারে না তা থেকে পলাতে ;
পোড়ে মৌচাক আধিদৈবিক অলাতে :
নৈমিত্তিক সব্যসাচীর শলাতে
অপসৃত হয় গুপ্তির জঞ্জাল।
কানা মাছি উড়ে ; ত্রিভুবন জুড়ে
কালের ঊর্ণাজাল॥

তাই আমাদের সমাহিত অভিসারে
ঘটে দুর্গতি, মৌন অমতি
সংকেত প্রতিহারে ;
বিপ্রলব্ধ বিশ্বমানব বিষাদে
অঙ্গুলি তুলি, দেখায় অলথ নিষাদে ;
বুঝেও বুঝি না নিরাকার আঁখি কী সাধে,
প্ররোচিত করে ত্যাগে, না অঙ্গীকারে।
মাগে প্রতিশোধ, মানায় প্রবোধ,
অনিকেত অভিসারে ॥

তার স্বাধিকার আগে ফিরে দিতে হবে ;
নতুবা নগর, তথা প্রান্তর,
ভ'রে রবে বাসী শবে।
অশক্য পিতা ; বলীর কণ্ঠলগ্ন
মাতা বসুমতী ব্যভিচারে আজ মগ্ন :
ক্ষাত্র শোণিতে অবগাহি, জামদগ্ন্য
তবু পাতিবে না স্বর্গরাজ্য ভবে।
স্বীয় শক্তিতে হবে যোগ দিতে
মুক্তির তাণ্ডবে ॥

২৭ জুলাই ১৯৩৮

উপসংহার

সমাপ্ত সর্পিল পথ দিগন্তের পর্বতশিখরে ;
তার পরে অপার নীলিমা।
কী হবে উদ্দেশ খুঁজে ঊর্ধ্বশ্বাস নক্ষত্রনিকরে ?
এখানেই পৃথিবীর সীমা।

পশ্চাতেও কিছু নেই। লোকালয় – সে কেবল নাম।
সেথা শিবি নেই বটে, কিন্তু ক্ষুব্ধ শিবা সাথে সাথে
সিংহের ভুক্তাবশিষ্ট খোপে খোপে জমা ক'রে রাখে,
ভাঙে যৌথ অনুলাপে শ্মশানের একান্ত বিশ্রাম।
হেথা নাস্তি পৃষ্ঠে, পুরোভাগে :
মাঝে শুধু তুমি, আমি আর এ-আদিম অরণ্যানি ;
সমাধিনিমগ্ন কাল, অসম্ভৃত অমা একা জাগে,
পরাহত লুব্ধ কানাকানি ॥

ভিন্নভাণ্ড সর্বনাশ : অতিদৈব বিশ্বের দেউল :
প্রার্থনা বা অভিযোগ বৃথা :
প্রতিজ্ঞাবিস্মৃত কল্কি ; কিংবদন্তী শিবের ত্রিশূল ;
শূন্যকুম্ভ পুরাণ, সংহিতা।
অন্যোন্যসম্বল আজ ত্রিভুবনে আমরা দু জনে ;
আমাদের পটভূমি নিরপেক্ষ, নিষ্কল নৈমিষ।
অতীতের পক্ষাঘাত, ভবিষ্যের বাচাল কুলিশ
অনাথ দুর্গের ধ্বংস রটাবে না কপোতকূজনে :
অক্ষমের আবশ্যিক ক্ষমা
এখানে কীর্তিত নয়, বন্ধুত্বের বিডম্বনা নেই,
রাবণের দূতী-রূপে পতিসেবা করে না সরমা,
স্বাবলম্বী – মরে সে প্রাণেই ॥

প্রনষ্ট পৃথ্বীর প্রান্তে তমিস্রার লজ্জাবস্ত্রে আজ
এসো নগ্ন মনুষ্যত্ব ঢাকি।
রক্তে কিংবা অশ্রুপাতে নিষ্কলঙ্ক হবে না সমাজ।
কেন তবে তাকে মনে রাখি ?
মানবের অগ্রজেরা আমাদের মর্যাদা শেখাবে ;
ছায়া দেবে বনস্পতি ; শৈলশ্রেণী যোগাবে নির্ভর :
সভ্যতার অভিশাপে প্রস্তরিত অর্ধনারীশ্বর
স্বপ্নদুঃস্থ ক্লৈব্য থেকে অকস্মাৎ অব্যাহতি পাবে।

অতঃপর পরিণামী কুশ
অভ্যস্ত ভ্রান্তির বশে গড়ে যদি পুনশ্চ পুত্তলি,
সে-কুহকে ম'জে, যেন নৈর্ব্যক্তিক প্রকৃতি-পুরুষ
মাড়ায় না মর্ত্যের দেহলি।

২০ অক্টোবর ১৯৩৮

উজ্জীবন

কেন তুমি আসো না এখনও ?
ওই শোনো,
নির্জিতের নিরুপায় কণ্ঠস্বর, শোনো,
অতিদৈব দেউলের প্রতিধ্বনিপ্রহত গম্বুজে
উদয়াস্ত তোমাকেই খুঁজে,
অবশেষে ফিরে আসে আত্মঘাতী পরিহাস-রূপে।
সাংকেতিক যূপে
বিনা রক্তে হয়ে গেছে বলি
ইতিমধ্যে কত শত পরানপুত্তলি:
আর্তনাদ ছাড়া আজ নৈবেদ্যের যোগ্য কিছু নেই।

নিবর্তিত আশ্বাসের দ্বিরুক্তি শুনেই
জনশূন্য উন্মুখ গোপুর,
পিশাচী চমূর
অগ্রগতি নিষ্কণ্টক, পর্যুষিত পাদ্যার্ঘ্য-সহিত
দলে দলে প্রাক্তন ভক্তেরা উপস্থিত
সমুৎপন্ন সর্বনাশে অর্ধত্যক্ত পরস্ব কুড়াতে,
প্রতিবাতে
দুর্নিবার পতাকার প্রাগল্‌ভ্য কেবল
মুখরিত করে নভস্তল।

আসন্ন প্রলয় :
মৃত্যুভয়
নিতান্তই তুচ্ছ তার কাছে।
সর্বস্ব ঘুচিয়ে, যারা ব্যবচ্ছিন্ন দেহে আজও বাঁচে,
একমাত্র মুমূর্ষাই তাদের নির্ভর ;
প্রাণ আর জড়
আবার তাদের মধ্যে আশ্লিষ্ট অশ্লীল সহবাসে।
প্রত্যাগত প্রত্ন বিপর্যাসে
পরিপূর্ণ বিবৃত্তির অন্তিম মণ্ডল।
আখণ্ডল
নিরর্থক নামমাত্র : জরাগ্রস্ত সহস্রাক্ষে আর
পড়ে না নারকী কীট ; কুলিশপ্রহার
কম্পিত হাতের দোষে নির্দোষের মুণ্ডপাত করে॥

অস্পৃশ্য অম্বরে
তবুও অদৃশ্য তুমি ?
নিরঙ্কুশ, নিঃসন্তান, নিত্য মরুভূমি
আস্তিকের পুরস্কার – প্রতিশ্রুত ভূস্বর্গ তবে কি ?
এই পরিণতির লোভে কি
জন্মালে নারীর গর্ভে, আত্মবলি দিলে নরমেধে,
কণ্টককিরীট প'রে, বিনা ধনুর্বেদে
হলে দুঃস্থ ধূলির সম্রাট্,
মৃত্যুর কবাট
খুলে রেখে, চ'লে গেলে সার্বজন্য সুধার সন্ধানে.
আশ্রিতের কানে
সাম্য-মৈত্রী-তিতিক্ষার বীজমন্ত্র ঢেলে,
মিয়াদী প্রদীপ জ্বেলে
পণজীবী প্রতীক্ষার অনন্ত অভাবে ?

নিশ্চিহ্ন সে-নচিকেতা ; নৈরাশ্যের নির্বাণী প্রভাবে
ধূমাঙ্কিত চৈত্যে আজ বীতাগ্নি দেউটি,

আত্মহা অমর্ত্যলোক, নক্ষত্রেও লেগেছে নিবৃত্তি।
কালপেঁচা, বাদুড়, শৃগাল
জাগে শুধু সে-তিমিরে ; অগ্রসর রক্তিম মশাল
অমারে আবিল করে ; একচক্ষু ছায়া,
দীপ্ত-নখ, স্ফীত-নাসা, নিরিন্দ্রিয় বৈদ্যুতিক কায়া
চতুর্দিকে চক্রব্যূহ বাঁধে।
অপমৃত বিধাতার লক্ষ্যভ্রষ্ট প্রেত যেন কাঁদে
নিষেধের বহিঃপ্রান্তে কোথা॥

ওরা কার শ্রোতা?
পদধ্বনি — কার পদধ্বনি
হানে মৌনে অন্তর্নাদ? আগমনী —
কার আগমনী আজ আনে আচম্বিতে
অতিশ্রুতি অম্বরায় প্রত্যাশিত আকাশবাণীতে?
বিকল্পই তবে কি নিশ্চয়?
যে-পশুবলের কাছে হার মেনে তুমি মৃত্যুঞ্জয়,
এ-বারে কি তার উজ্জীবন?
অন্তর্ভৌম সমাধিতে ছিল সংগোপন
যে-মিসরী শব,
তুমি নও, আনে কি সে-অর্ধপশু, অর্ধেক মানব
সঙ্গে ক'রে দিগ্বিজয়ী মরু?
পুরাণ পুরুষ হত : বাজে বক্ষে আর্তির ডমরু॥

২৬ অক্টোবর ১৯৩৮

জেসন্

বহু কষ্টে শিখেছি সাঁতার ;
অন্তত স্রোতের সঙ্গে ভেসে যাওয়া শক্ত নয় আর।
নদীতেও নানা বাঁক আছে ;
সেগুলোর কোনওটাতে ঠেকে গিয়ে বাঁচে
এমন লোকেও যারা সাঁতারের স-টুকু জানে না।
সমুদ্র তো তাদের টানে না।
শরে বা শৈবালে
কিংবা মৎস্যনারীদের সবুজ চুলের উর্ণাজালে
জড়ায় না তারা কানা মাছির মতন ॥

বরঞ্চ ঘূর্ণির উন্মথন
তাদের নিক্ষেপ করে শরণসৈকতে।
বিষম দ্বৈরথে
জাগ্রত দৈত্যকে মেরে, অর্ধরাজ্য রাজকন্যাসহ
তারাই কুড়িয়ে পায় ; প্ররোহী আবহ
বাড়ায় তাদের বংশ ; অবশেষে ঘুমিয়ে এখানে,
স্বর্গের স্বাগত শোনে সচকিত কানে ॥

আমগ্ন তরণী ছেড়ে, ঝাঁপাতে পারি না তবু জলে।
বিফল কৌশলে
ভাঙা হাল ধ'রে থাকি ; ছেঁড়া পাল সযত্নে খাটাই ;
লুপ্তপ্রায় মানচিত্রে চাই।
ভুলে যাই একা আমি ; সঙ্গে ছিল যারা,
প্রলুব্ধ বন্দরে কিংবা পথকষ্টে আজ আত্মহারা,
কে কোথায় প'ড়ে আছে, জানি না ঠিকানা।
শূন্য মনে ভূতে দেয় হানা ;
প্রকীর্তির ছায়াচ্ছবি নিরাশ্রয় চোখে ফুটে ওঠে ॥

ক্ষের এসে জোটে
উজ্জ্বল অর্ণবপোতে স্বদেশের শ্রেষ্ঠ বীর যত ;
গুরুদীক্ষা, বাহুবল, সহায় দৈবত
তরায় সমূহ বিঘ্ন, নিরুদ্দেশে গন্তব্য চেনায়।
পুনরায়
স্বয়ংবরা পণ্ড করে মায়াবীর চক্রান্ত, চাতুরী ;
হাহাকারে ভরে রাজপুরী
তার উগ্র রিরংসায় ; অভিসারী ঝড়ে
সবিতার বলি লুটে, পলাতক তরীতে সে চড়ে

স্বৈরিণীর অনুকম্পা চোকেনি তাতেও।
অযাচিত সন্তানে সে দিয়েছিল আমাকে পাথেয়,
অপহৃত উত্তরাধিকার,
আমি নয়, সেই নিজে করেছিল নির্দয়ে উদ্ধার।
তবু তার গভীর মায়ায়
পারিনি তলিয়ে যেতে ; কৃষ্ণপক্ষ্ম চোখের ছায়ায়
সিন্ধুর উষর জ্বালা চাইনি জুড়োতে।
বিপরীত স্রোতে
সর্বনাশ নিশ্চিত জেনেও,
ভুলিনি শান্তির চেয়ে স্বধর্মই শ্রেয়॥

ফলত নিরবলম্ব, নিঃসন্তান, নিঃস্ব আজ আমি,
অন্তর্যামী
সাধ ও সাধ্যের ভেদ গোলায় কেবলই।
ঘটে অন্তর্জলি
শতচ্ছিদ্র তরণীতে ; কিন্তু ভাবি অকূল পাথারে
স্বেচ্ছায় চলেছি ছুটে ; বস্তুত জোয়ারে
ততটাই ফিরে আসি, যতখানি এগোই ভাঁটাতে।
অপ্সরীরা, ব'সে আঘাটাতে,

নিশ্চেষ্ট কৌতুক দেখে ; স্তব্ধপাখা
সাগরবলাকা
অধীর চিৎকার হানে সন্ধ্যার আকাশে ॥

তবে কী বিশ্বাসে
ভাঙা হাল ধ'রে থাকি, ছেঁড়া পাল সযত্নে খাটাই,
লুপ্তপ্রায় মানচিত্রে চাই,
মনে ভাবি
এ-কখানা জীর্ণ কাঠে অস্মিতার অসম্ভব দাবি
আবার প্রতিষ্ঠা পাবে সপ্তসিন্ধুপারে ?
তার চেয়ে নিঃশঙ্ক সাঁতারে
ব্যয় ক'রে নিঃশ্বাসের অন্তিম সঞ্চয়,
অগাধে সংকল্পসিদ্ধি একাধারে নিশ্চিন্ত, নিশ্চয় ॥

স্বপ্ন আজ ব্যর্থ বিড়ম্বনা ;
জরাবিগলিত দেহে আত্মঘ্ন যন্ত্রণা
বিজিগীষা।
যে-প্রাক্তন তৃষা
মেটাতে পারেনি সিন্ধু, হয়তো বা নির্বাণ হবে তা
জোয়ার-ভাঁটার সন্ধি নদীবক্ষে, যেথা
মুকুরিত মহাশূন্য, সমুদ্রের পিতা ও প্রতীক,
দুরতায়, স্বস্থ, প্রগতিক ॥

৩ ফেব্রুআরি ১৯৩৯

সংক্রাম

বিরহের খাতে সেতু ; অভিসার আজ পারংগম ;
বিয়োগান্ত ক্রৌঞ্চ আর আমাদের উপমান নয় :
তুমি, আমি একাকার ; বীতহার সাষ্টাঙ্গ সংগম ;
বিশ্রম্ভের ব্যাকরণ নিরব্যয়, আদ্যন্ত সাম্বয় ॥

অনাথ বিশ্বের ধ্বংসে মরুভূর নিত্য সমভাব ,
অবিবেকী অন্তর্যামী ; স্ত্রী-পুরুষ অন্যোন্যনির্ভর ;
নিতান্ত পশেনি আজও যে-নৈমিষে পিশাচী প্রভাব ,
সেথাও অনন্য সিদ্ধি উর্ধ্বশ্বাস প্রেয়সীর বর ॥

তবুও নিশ্চয় জানি ওমরের তত্ত্ব নিরর্থক । —
মানুষ ক্ষীণায়ু, কিন্তু চিরস্থায়ী অবদান তার :
প্রস্তরিত পদচিহ্নে ধরা পড়ে উধাও নর্তক ,
নিবিদ মর্মরে জ্বলে অঙ্গারিত আদিম কান্তার ॥

স্পৃষ্ট, দৃষ্ট ত্রিভুবন ব্যাজজীবি কালের কবলে :
পলায়ন শশবৃত্তি ; লুপ্তি, গুপ্তি পরিহাস, শ্লেষ ,
সে-উন্নিদ্র ত্রিলোচনে ভেদ নেই ধবলে শবলে ,
অনুজের গলগ্রহ অগ্রজের নিভৃত আশ্লেষ ॥

তাই কি বিচ্ছেদ ঘটে বারংবার বাহুর নিবীতে ,
প্রিয়সম্ভাষের ফাঁকে শোনা যায় দূর আর্তনাদ ;
সংকুচিত নিরালয় অবরোধ করে চারি ভিতে ,
আবহে বিষাক্ত বাষ্প ; সংক্রমিত স্বয়ং কণাদ ?

২৪ ফেব্রুআরি ১৯৩৯

কাস্তে

আকাশে উঠেছে কাস্তের মতো চাঁদ,
এ-যুগের চাঁদ কাস্তে।
ছায়াপথে কোন্ অশরীরী উন্মাদ
লুকাল আসতে আসতে ?
স্ফীত ধমনীতে ঘোরে অনামিক শঙ্কা ;
হৃদয়ারণ্যে বাজে বর্বর ডঙ্কা ;
ছাই হয়ে গেছে প্রতীকী স্বর্ণলঙ্কা
নির্বাণ সূর্যাস্তে।
হঠাৎ হাওয়ায় হাতুড়ির প্রতিবাদ :
এ-যুগের চাঁদ কাস্তে ॥

আকাশে উঠেছে কাস্তের মতো চাঁদ,
এ-যুগের চাঁদ কাস্তে।
বিপ্রলব্ধ প্রেতের আর্তনাদ
মানা করে ভালোবাসতে।
সংগমে মিছে খুঁজে মরি নিরাপত্তা ;
ক্রমায়াত ঋণে ন্যস্ত আমার সত্তা ;
আসে সে-বেতাল, তুমি যার বাগ্‌দত্তা,
দম্ভিল হাস্নি হাসতে।
চৈতী ফসলে শটিত শবের স্বাদ :
এ-যুগের চাঁদ কাস্তে ॥

আকাশে উঠেছে কাস্তের মতো চাঁদ,
এ-যুগের চাঁদ কাস্তে।
নিষ্প্রতিকার ধৈর্যের পাকা বাঁধ
বাধা দেয় বানে ভাসতে।
আমাদের জ্ঞান আপ্তবাণীর ভাষ্যে ;
শান্তি জীবন্মৃত্যুর ঔদাস্যে ;

স্বার্থসিদ্ধি সাক্ষীর স্মিত আস্তে
উচ্চ ঠাসতে ঠাসতে।
বিকল প্রেমিক আমাদের প্রভুপাদ :
এ-যুগের চাঁদ কাস্তে॥

আকাশে উঠেছে কাস্তের মতো চাঁদ,
এ-যুগের চাঁদ কাস্তে।
কল্পান্তের অনিকাম অবসাদ
ব্যাপ্ত স্বাস্থ্যাস্বাস্থ্যে।
শুক্ষ ক্ষীরোদসাগরে মগ্ন বিষ্ণু ;
নরপিশাচেরা পৃথিবীতে আজ জিষ্ণু
চিনেও চেনে না স্বাবলম্বী অসহিষ্ণু
সমবায়ী অপরাস্তে।
খণ্ডাবে কবে অমৃতের অপরাধ
কালপুরুষের কাস্তে ?

১১ মে ১৯৩৯

জাতক (১)

উন্মুক্ত আকাশে শুনি চমৎকৃত চিলের চিৎকার ;
দিগন্তবিস্তৃত মাঠে ডেকে ওঠে শিকারী নকুল ;
গুপ্ত ছত্রকের ফুলে সমাচ্ছন্ন শোণিত বকুল ;
উদ্‌গ্রীব ঝাবুকে জাগে থেকে থেকে সতর্ক শীৎকার॥

অপবৃত ভগবান ; অস্তাচলে রক্তাক্ত অঙ্গার ;
অরাজক চরাচরে প্রশ্ন প্রতিহিংসার প্রতুল :
অতিদৈব বিবর্তনে মনুষ্যই যেহেতু অতুল,
তাই সে আত্মহা আজ, তার ধর্ম আত্মীয়সংহার॥

অভিসার, অভিযান এ-আবহে নিতান্ত সমান ;
স্বসমুখ বিসংবাদ : কুরুক্ষেত্রে অগত্যা সংকেত ;
এখানে আর্তের লোভ শিবাভুক্ত শবের আয়ুধে।

অর্ধনারীশ্বর নয়, স্ত্রী-পুরুষ দ্বন্দ্বে ম্রিয়মাণ :
মিথুন নিমিত্তমাত্র, কর্মকর্তা প্রতিযোগী প্রেত :
তুমি, আমি সর্বস্বান্ত পৈশাচিক ঋণ শুধে শুধে।

২২ জানুআরি ১৯৪০

জাতক (২)

অথবা পিশাচ স্কন্ধ গৃধ্র্ ইতিহাসের খাতক ;
এবং সে-ইতিহাস নিত্য তথা বিকল্পস্বরূপ।
ফলত যদিচ তাকে পদে পদে লাগে অপরূপ,
তবু তা প্রকৃতপক্ষে পরিণামী প্রাক্তন পাতক।

অর্থাৎ কৈবল্য স্বপ্ন : জন্ম-মৃত্যু অন্যোন্যবাধক ;
অনুবন্ধী শান্তি-শাস্তি ; একান্তর উল্কা ও ধধূপ ;
নরকের প্রতি কীট বৈভাষিক স্বর্গের মধুপ :
পুণ্যাত্মারা পরকীয় দায়িত্বের সংক্রান্তিসাধক।

কারণ বিচারক্ষম নয় অন্ধ, অনাথ নিয়তি ;
তার অস্থ তুষ্টি-রুষ্টি যন্ত্রবৎ সমানুপাতিক :
প্রতিনিধি প্রায়শ্চিত্ত পুরস্কৃত গচ্ছিত ভূষণে।

সুতরাং নির্দ্বন্দ্বও নির্বন্ধের বিপরীত রতি :
বরঞ্চ দ্বৈরথ ভালো, গুপ্তহত্যা শুধু সাংঘাতিক :
আমাদের সার্থকতা জাতকের ব্যর্থ বিদূষণে।

২২ মে ১৯৪০

সংবর্ত

এখনও বৃষ্টির দিনে মনে পড়ে তাকে।
প্রাদেশিক শ্যামলিমা যেই পাংশু সাধারণ্যে ঢাকে,
অমনই সে আসে,
রেখারিক্ত ভাবচ্ছবি, অবচ্ছিন্ন স্মৃতির উচ্ছ্বাসে
লাক্ষণিক,—নেত্রসার, কপোলপ্রধান
প্রাক্‌প্রচ্ছদ নটী যেন। সঙ্গে সঙ্গে ঘোচে ব্যবধান
দৃশ্য ও দ্রষ্টার মধ্যে : ভুলে যাই
উত্তরচল্লিশ আমি ; উদ্‌গ্রীব হয়েও যদি চাই,
তবু গলকম্বলের থর
মুকুরের অধিকাংশ জোড়ে ; নতোদর
লুকায় পায়ের ডগা অধোমুখে কচিৎ তাকালে,
স্থানবিনিময় করে চাঁদিতে কপালে,
চুলের প্রলেপ ওড়ে নামমাত্র বাতাসে যখন।
বীমাই জীবন
বুঝি বটে, কিন্তু ঠিক মাসে মাসে কিস্তির যোগান
দিতে গিয়ে বাজারখরচে পড়ে টান।
অথচ ডাক্তারে বলে তন্তুক্ষয়
এ-বয়সে নিতান্ত নিশ্চয় :
পুষ্টিকর পথ্য বিনা অতএব গত্যন্তর নেই ;
এবং যেকালে আজও রয়েছি বেঁচেই,
তখন কী ক'রে মরি, মৌরসের উচ্ছেদ না হোক,
অন্তত চৌধুরীদের ভদ্রাসনক্রোক্
স্বচক্ষে না দেখে :
তাতে যদি দুলালেরা নম্রতা বা কাণ্ডজ্ঞান শেখে॥

বৃষ্টির বিবিক্ত দিনে ভুলি সে-সকলই ;
এ-বাড়ির অনুমিত গলি

মনে হয় অগ্রণীর পদপ্রার্থী পথ
যার প্রান্তে মূর্চ্ছিত জগৎ
স্ফূর্তির প্রতীক্ষা করে।
তখন থাকে না মনে – দিগন্তরে
উচ্ছিষ্ট উঞ্ছের বাটোয়ারা,
হিংসার প্রসারা.
স্থগিত মারীর বীজ শস্যশূন্য মাঠে ;
চ'ড়ে বসে নিহত বা নির্বাসিত স্বৈরীদের পাটে
প্রতিদ্বন্দ্বী সর্বেসর্বা যত ; নিরর্থক
পুষার একর্ষি নাম, অসূর্যের পুরাণ ঝলক.
হিরণ্ময় পাত্র ঠেলে ফেলে,
দেয় মেলে
অন্ধ তম অতিপ্রজ বল্মীকে বল্মীকে ;
বিমানের ব্যূহ চতুর্দিকে,
মাতরিশ্বা পরিভূ কবির কণ্ঠশ্বাস।
মূল্যহ্রাস
সর্বত্র সর্বথা
আবশ্যিক, – বোঝে না সে-সোজা কথা
শুধু যার ভূসম্পত্তি আছে ;
উদয়াস্ত ভেবে মরি, – খেয়ে. প'রে, নেহাৎ যা বাঁচে,
নির্ভয়ে তা খাটাতে পারি না।
অথচ প্রত্যহ শুনি চার্চিলের স্বেচ্ছাচার বিনা
অসাধ্য সাম্রাজ্যরক্ষা, অব্যর্থ প্রলয়.
এবং যে-ব্যক্তিস্বত্ব সভ্যতার সম্মত আশ্রয়,
তারও অব্যাহতি নেই অপঘাত থেকে :
একা হিট্‌লারের নিন্দা সাধে আজ বাধে কি বিবেকে ?

কিন্তু তার দিব্য আবির্ভাবে
প্রেতার্ত অভাবে

জাগে যেন প্রজ্ঞাপারমিতার অভয় ;
ক্লেদ-মেদ-খেদের-আলয়—
জঘন্য জান্তব দেহে দেশ-কাল-সংকলিত মল
সংসক্ত থাকে না আর , তন্মাত্রাসম্বল
হয় তনু আচম্বিতে ;
নির্বিকার স্বপ্নের নিভৃতে,
বিয়োগান্ত নাটকের উদ্যোগী নায়ক, আমি পাই
যৌবরাজ্য,—ব্যোমযান, কামান, পদাতি
যে-রাষ্ট্রের অঙ্গ নয় ; ন্যায়, ক্ষমা, মিতালি, মনীষা
যার মুখ্য অবলম্ব, জিজীবিষা
সামান্য লক্ষণ ;
শ্বাপদসংকুল নয় যেখানে কানন,
দুরাক্রমা নয় গিরিচূড়া,
পরিক্রতম্ম্যা
নিদাঘের অফুরন্ত দিন,
সুবর্ণধারার শষ্পশ্যামল পুলিন
উৎপিঞ্জর তারুণ্যের লাস্যময় লীলায় মুখর,
গন্ধবহসম্মার্জিত স্বরাট্ অম্বর
দেয় ফিরে
অবরোহী সন্ধ্যার শিশিরে
অনুপূর্ব মানুষের অভ্যুদিত চিত্তের প্রসাদ ,
জয়যুক্ত ষ্টেসেমান্-ব্রিয়াঁর সংবাদ ।

হয়তো তখনই
উপশয়ী সংবর্তের আড়ালে অশনি
লেলিহান করবালে ধার দিতে শুরু করেছিল ;
প্রবাদের ধুয়ো ধরেছিল
তৎপূর্বে অন্তত
মুসোলীনি যুদ্ধগামী বর্বরের মতো ;

এবং উদ্বাস্তু টুটুঙ্কি ইতিমধ্যে দেশে দেশান্তরে
ঘুরে মরেছিল, পুরাকালীন শহরে
গলঘণ্ট কুষ্ঠরোগী, যত তার সব বন্ধ দেখে,
যেমন নির্জনে যেত ভিক্ষাব্যতিরেকে।
কিন্তু তার
বভ্রু কেশে অস্তগত সবিতার উত্তরাধিকার,
সংহত শরীরে
দ্রাক্ষার সিতাংশু কান্তি, নীলাঞ্জন চোখের গভীরে
ভাচ্ছিল্যের দামিনীবিলাস ;
গ্যোটে, হোল্ডার্লিন্, রিল্কে, টমাস্ মানের উপন্যাস
দেওয়ালের খোপে খোপে, বাখের সনাটা
ক্লাভিয়েরে, শতায়ু ওকের পাটা
তেজস্ক্রিয় উৎকোণ পটলে ;
বায়ব্য অঞ্চলে
রক্ষিত মঙ্গলদীপ, অনাদিনগরী,
মালা জ'পে, কাটায় শর্বরী
স্বপ্নাবিষ্ট সভ্যতার নিশ্চিন্ত শিয়রে।—
লেগেছিল হাস্যকর স্বভাবত সে-সবের পরে
কূটাগার থেকে দেখা স্বস্তিকলাঞ্ছন
বালখিল্য নাট্‌সীদের সমস্বর নামসংকীর্তন
মশালের ধূমার্ত আলোকে :
বরঞ্চ বৃষ্টির দিনে স্তব্ধশোকে
নির্বাক বিদায়
স্মরণীয় স্বস্থ মর্যাদায়॥

অবশ্য বুঝেছি আজ এ-সিদ্ধান্ত নিতান্তই মেকী ;
কারণ অন্বয়ব্যতিরেকী
সত্য-মিথ্যা, ভালো-মন্দ, সুন্দর-কুৎসিত,
এবং সে-নিত্যবিপরীত

দ্বন্দ্বসমাসের সঙ্গে তুলনীয় মেকবিপর্যয়
বিকল্পস্বভাব ক্ষেত্রে। নিঃসংশয়
উপযুক্ত এও
বিশ্বামিত্র দস্যুরাই ব্যক্তিনামধেয়
যদিচ প্রাজ্ঞের মতে, তবু ব্যষ্টিসংকল্পের ঝোঁকে
প্রাগুক্ত দোলকে
কখনও বিলম্ব ঘটে, কদাচিৎ ত্রুটি।
তবে কেন ভোলে প্রতিশ্রুতি ?
বারোটা উত্তীর্ণ, কিন্তু টেলিফোন্ করে কই লীলা ?
অথচ রঙ্গিলা
নয় সে দীপ্তির মতো ; অন্তত সে জানে
সমাজের ঘুম নেই, শ্রুতি আছে দেওয়ালের কানে ;
গোপন সুযোগ
নিতান্ত দুর্লভ তাই, উপভোগ
পরিণামচিন্তায় ব্যাহত।
তাহলে কি অসময়ে ফিরেছে প্রমথ
নিন্দুকের প্রেরণায় ? এক দিনে সফল নতুবা
সে-বাচাল যুবা
যার পেশা কুস্ত্রীর সম্ভ্রমগ্লানি ?
ইচ্ছার সামর্থ্য নেই মানি ;
তথাপি টাকার আজ্ঞা প্রলয়েও লঙ্ঘনীয় নয় :
বন্ধকীর নিলামে বিক্রয়
মারোয়াড়ীদের গ্রাসে তুলে দেয় বাঙালীর দায়।
সুতরাং যে মাঝারীবয়সীকে চায়,
সে নিশ্চয় প্রকৃতিভিখারী,
নচেৎ বিকারী॥

বৃথা স্বপ্ন ; সংকল্প অক্ষম ;
মতিভ্রম

বৃষ্টির বিবিক্ত দিনে অসংলগ্ন স্মৃতির সংগ্রহে
কিংবা শুধু মৌখিক বিদ্রোহে
নিঃসঙ্গ জরার আর্তি তোলার প্রয়াস।
কিন্তু মানবেতিহাসে মাঝে মাঝে আসে মলমাস,
কর্মচ্যুত পৃথিবী যখন
উন্মার্গ ঘুমের ঘোরে. নাক্ষত্রিক সহযাত্রিগণ,
সে-অপচারীকে ভুলে, ছোটে লোকাতীতে ;
নির্বাণ নিশীথে
কারারুদ্ধ আয়ুর মিয়াদ,
রোমন্থ বিস্বাদ,
বিষায়িত ভবিষ্যের ধ্যান,
অভিজ্ঞান
শকুন্তের স্পর্শকলুষিত।
প্রমাবিরহিত
অন্ধ বিশ্বাসের বশে তখন মানুষ খোঁজে ফের
অশক্ত বা অসম্পৃক্ত অধিদৈবতের
পুরাতন পদপ্রান্তে সংগতি বা পৈতৃক অমিয়,
কার্যত যদিও
ঐকান্তিক শূন্য তাকে করে বিশ্বম্ভর,
কারণ তখন বায়ু অনিলে মেশে না. অবস্কর
ভস্মান্ত হয় না, অমুব্যবসায়ী ক্রতু
বোঝে সন্তাপেও ব্যাপ্ত ব্রহ্মাণ্ডের বীতাগ্নি বেপথু।
অন্তর্হিত আজ অন্তর্যামী :
রুষের রহসে লুপ্ত লেনিনের মামি,
হাতুড়িনিষ্পিষ্ট ট্রট্স্কি, হিট্লারের সুহৃদ্ স্টালিন্,
মৃত স্পেন, ম্রিয়মাণ চীন,
কবন্ধ ফরাসীদেশ। সে এখনও বেঁচে আছে কি না,
তা স্বচ্ছ জানি না॥

৩ সেপ্টেম্বর ১৯৪০

বিপ্রলাপ

হয়তো ঈশ্বর নেই : স্বৈর সৃষ্টি আজন্ম অনাথ ;
কালের অব্যক্ত বৃদ্ধি শৃঙ্খলার অভিব্যক্ত হ্রাসে ;
বিয়োগান্ত ত্রিভুবন বিবিক্তির বোমাঞ্চ বিলাসে ;
জঙ্গমের সহবাসে বৈকল্যের দুঃস্থ সন্নিপাত ॥

প্রবৃত্তির অবিচ্ছেদে তবু নেই পূর্ব বা পশ্চাৎ ;
বিজ্ঞানের বিবর্তন প্রপঞ্চের নিত্য অনুপ্রাসে ;
প্রতিসম বৈপরীত্য সম্পূর্ণের দুর্মর প্রকাশে ;
শক্তির অব্যয়ীভাবে তুল্যমূল্য ঘাত-প্রতিঘাত ॥

তাই আর্ত প্রার্থনার অপভ্রষ্ট আকাশদুহিতা
নাস্তিপ্রত্যাখ্যাত হয়ে, ফেরে গূঢ় দৈববাণী-রূপে,
বুঝি দুঃখ আবশ্যিক, দুরদৃষ্টে দোষার্পণ বৃথা,
করে প্রতিবিম্বপাত বৈকল্পিক মুক্তি অন্ধকূপে ॥

অচিরাৎ বিপ্রলাপে ডুবে মরে স্বগত সন্তাপ :
আমার শাস্তিতে, মানি, ক্ষান্ত তার অবরোহী পাপ ॥

২২ অগস্ট ১৯৪১

কঞ্চুকী

নাটকী নায়ক-রূপে আজীবন দেখেছি নিজেকে ;
ভেবেছি আমার সঙ্গে অদৃষ্টের দ্বৈরথসমর :
মর্ত্যের প্রতিভূ আমি, প্রতিপক্ষ সমস্ত অমর,
কাজেই নিস্তার নেই পরিণামী সর্বনাশ থেকে ;

তবু যবনিকাপাত দেবে ম্লান পরাজয় ঢেকে ;
প্রতিলোম অভিযানে লোকযাত্রা হবে অগ্রসর,
আমাকে হৃৎপদ্মে ধ'রে ; ব্যর্থ বীর্যে যীশুর দোসর,
আমি যাব আত্মোপম্য সমাহিত সন্তুতিতে রেখে ॥

উপস্থিত পঞ্চমাঙ্ক : প্রাক্‌নির্বাণ দীপের উল্লাসে
সমবেত পাত্র-পাত্রী করে স্ব স্ব বিধিলিপিপাঠ ;
নেপথ্যে আমার স্থান ; অন্ধকারে অধিকারী হাসে
সে রঙ্গরসিক ব'লে, আমি ভ্রান্তিবিলাসে সম্রাট্ ॥

কদাচ দৈবাৎ যদি বাস্তবিক ভূমিকায়ও ঢুকি,
কামাখ্যার ষড়যন্ত্রে সাজি তবে ঘুমন্ত কঞ্চুকী ॥

২৬ সেপ্টেম্বর ১৯৪১

সোহংবাদ

নিখিল নাস্তির মৌনে সোহংবাদ করেছি ধ্বনিত :
বলেছি আমি সে-আত্মা, যে উত্তীর্ণ দূরাস্ত তারায়
উধাও মনের আগে : মাতরিশ্বা নিয়ত ধারায়
ফলায় যে-কর্মফল, তা আমারই বুভুক্ষাজনিত ;

যেহেতু প্রশ্রয়ী আমি, তাই আজও নয় অপনীত
হিরণ্ময় পাত্র, তথা দুর্নিরীক্ষ্য পূষার কারায়
স্বরাট্ স্বরূপ লুপ্ত ; দেশ-কাল আমাতে হারায়,
অথচ অভীষ্ট তীর্থে, পলে পলে আমি অগণিত ॥

অতিক্রান্ত সন্ধিলগ্ন : শূন্য দৃষ্টি স্বতই স্বগত ;
অসহায় অন্ধকারে কিন্তু কোথা আত্মপরিচয় ?

গচ্ছিত জাড্যের ভারে অনিকাম জঙ্গম জগৎও ;
অবশ্য চক্রান্তে লিপ্ত অতীন্দ্রিয় ভাবনানিচয় ।

ক্ষেত্রনিরপেক্ষ প্রমা প্রতিকারী প্রমাদের গুণে ;
সংক্ষিপ্ত চেষ্টাই বটে অপৌরুষ বিবর্তের ভ্রূণে ।

২০ এপ্রিল ১৯৪৫

১৯৪৫

তুমি বলেছিলে জয় হবে, জয় হবে :
নাট্‌সী পিশাচও অবিনশ্বর নয় ।
জার্মানি আজ ম্রিয়মাণ পরাভবে ;
পশ্চিমে নাকি আগত অরুণোদয় ।
অন্তত রুষ বাহিনী বন্যাবেগে
কবলিত করে শোষিত দেশের মাটি ,
বিভীষণদের উচ্ছেদে ওঠে জেগে
স্বাধীন প্যারিস, যথারীতি পরিপাটী :
এ-বারে সমরে, শান্তিতে সহযোগী
মার্কিন্‌ ঢালে সমানে শোণিত, টাকা ;
ধনিক যুগের প্রধান ভুক্তভোগী
ইংলণ্ডেই সমাজতন্ত্র পাকা ॥

২

অবশ্য চীনে নেতারা স্বার্থপর,
সর্বথা জনশক্তির বাধ সাধে ;
স্থগিত ভারতে আপ্ত কালান্তর,
জিন্না যেহেতু বিমুখ গান্ধিবাদে ।

তাছাড়া আবার রুক্ষকে তক্ষকে
ভেদ ভোলে স্বচ্ছন্দ বেল্‌জিয়ামে ;
ইটালীর প্রতিবিপ্লবী পঙ্ককে
সম্মুখে রেখে, ত্রাতারা তারণে নামে।
তথাচ গ্রীসের ট্রট্‌স্কীয় বামাচারী
বিনষ্ট চার্চিলের বাক্যবাণে ;
ধরে তুরস্ক বিশ্রুত তরবারি ;
আর্জেন্টিনা প্রগতির রথ টানে ॥

৩

সত্য কি তবে সে-দিন তোমার মুখে
ভর করেছিল তুরুক্ষ দৈববাণী ?
ভূয়োদর্শনে ঢাকি অতিবস্তুকে,
তাই আমাদের অনুভবে শুধু হানি ?
হয়তো অমৃত ব্যর্থ মৃত্যু বিনা,
পাপ পুণ্যের মুকুরিত প্রতিরূপ,
ক্লীবের মারণ ভীষ্মের দক্ষিণা,
মুক্তির উৎপত্তি অন্ধকূপ,
ভূতের অগাধে নিহিত ভবিষ্যৎ,
অন্যায় আনে আস্থা ন্যায়ের প্রতি,
শক্রনিপাত মহামৈত্রীর পথ,
পরিশ্রমীর স্বধর্মে সদ্‌গতি ॥

৪

কিন্তু জীবন এতই বিকল কি যে
কেবল মরণে প্রমার সম্ভাবনা ?
প্রাণধারণের যে-দৃষ্টান্ত নিজে
রেখে গেছ, তা কি অন্ধ প্রবঞ্চনা ?
ক্ষমা, অহিংসা, মনীষা, বিবেকী দ্বিধা;
অত্যাচারের সঙ্গে অসহযোগ,

অসম্পৃক্ত ইষ্টের সদভিধা,
বিচারে বিশ্বমানবের বিনিয়োগ—
এ-সকলে আজ তুমি কি নিরুৎসাহ,
বুঝেছ সাধুর শাঠ্যেই মজে শঠ?
রাইনে জুড়ায় বার্সেলোনার দাহ,
স্পেনে নিষিদ্ধ যদিও ধর্মঘট!

৫

অতএব হোক আহ্লাদে আটখানা
বুদাপেস্তের ধ্বংসে হিসাবী চেক্:
কার্যকারণে ধার্য বিমানহানা,
ভার্শাও ড্রেস্‌দেনের পূর্বলেখ।
সমিতি বসুক লণ্ডনে লুব্লিনে,
যে যাবে, সে যাক সান্ ফ্রান্‌সিস্কোতে,
মিথ্যা মানুক আর্তেরা দুর্দিনে:
কর্মের ফল ফলবেই জোতে জোতে।
আজও নিমিত্তমাত্র সব্যসাচী;
মমতা অচল সাধারণ শুদ্ধিতে:
কৃপা খুঁজে মরে মোহজালে কানামাছি;
ব্যাহত বিধাতা ব্যক্তির বুদ্ধিতে॥

৬

তবু জানি যবে জয় হবে বলেছিলে,
চাওনি তখন তুমিও এ-পরিণাম:
শূন্যে ঠেকেছে লাভে লোকসানে মিলে,
ক্লান্তির মতো, শান্তিও অনিকাম।
এরই আয়োজন অর্ধশতক ধ'রে,
দু-দুটো যুদ্ধে, একাধিক বিপ্লবে;
কোটি কোটি শব পচে অগভীর গোরে,
মেদিনী মুখর একনায়কের স্তবে!

নির্বাণ নহে শুধু রাহুর গ্রাস ;
তুমি অনিকেত নির্বাক নাস্তিতে :
কে জবাব দেবে, নিখিল সর্বনাশ
কোন্ অবরোহী পাতকের শাস্তিতে ?

১০ এপ্রিল ১৯৬৪

যযাতি

উত্তীর্ণ পঞ্চাশ : বনবাস প্রাচ্য প্রাজ্ঞদের মতে
অতঃপর অনিবারণীয় ; এবং বিজ্ঞানবলে
পশ্চিম যদিও আয়ুর সামান্য সীমা বাড়িয়েছে
ইদানীং, তবু সেখানেই মৃত্যুভয় যৌবনের
প্রভু, বার্ধক্যের আত্মাপহারক। আশ্রুত তারক
অন্যত্রও অনাগত , জাতিভেদে বিবিক্ত মানুষ ,
নিরঙ্কুশ একমাত্র একনায়কেরা। কিন্তু তারা
প্রাচীর. পরিখা, রক্ষী, গুপ্তচর ঘেরা প্রাসাদেও
উন্নিদ্র যেহেতু, তাই ভগ্ন সেতু নদীতে নদীতে,
মরু নগরে নগরে। পক্ষান্তরে অতিবেল কারা
তথা সংক্রমিত মেরু ব্যক্তির ধ্বংসাবশেষে : দ্বেষে
পুষ্ট চীন থেকে পেরু ; প্রতিহিংসা মানে না সিন্ধুর
মানা। নৈশ হানা, আত্মঘাতী অঙ্গীকার, বিচারের
সম্মত বিকার বা স্বস্থ ধিক্কার এড়িয়ে যে যায়
ভাগ্যগুণে, চোখে চোখে রাখে তাকে অদৃশ্য শকুনে
প্রবাসেও অহরহ : যথাকালে অমৃতের দায়
সাশ্রু সন্ততিকে সঁপে, অন্তিম শয্যায় নিকামত
পারে না আশ্রয় নিতে ; ঊষর ধূলিতে নিষ্পিষ্ট সে,
ইতিহাসনিষ্ক্রান্তও বটে। অর্থাৎ কৃতান্ত আজ
ব্যক্ত সর্ব ঘটে ; এবং, প্রৌঢ়ের কেন, সকলেরই

কর্তব্য যেমন অরণ্যে রোদন, তেমনই সম্প্রতি
সাধা লোকালয়ে সে-বৃথা বিলাপ ॥

অবশ্য আমার
পক্ষে সংগত যে নয় অনুতাপ, সে-কথা স্বীকার
করি ; কারণ যদিচ মগ্ন শৈলে আমার মাতাল
নৌকা বানচাল হয়ে, বর্তমানে বিশ্লিষ্ট কঙ্কাল—
অপ্রাপ্তসংকার শব প'চে প'চে অস্থিসার যেন—
তথাপি যেকালে নিরুদ্দেশ যাত্রার সংজ্ঞায় হেন
দুরবস্থা শুধু সম্ভাব্যই নয়, অবশ্যম্ভাবীও
বটে, অশোভন তখন নির্বেদ। তাছাড়া স্বকীয়
সিদ্ধি প্রার্থনীয় নয় সূত্রধার গণেশের কাছে ;
অকূল পাথারে অযাচিত সাম্রাজ্য একদা বাচে
যারা জিতেছিল. অন্তত তাদের অনন্য সম্বল
ছিল প্রাণপাত পৌরুষ এবং রুদ্র কৌতূহল—
নিতান্ত নিরুপলক্ষ। তরল অনলে পরিণত
ঝলমল জল ; গলিত অম্বরতল ; অনুগত
দিগ্বধূর আঁখি ছলছল কষ্টকল্পনায় ; মেঘে
অন্তর্হিত চূড়া, পদান্ত ঊর্মির মুখর উদ্বেগে
প্রতিষ্ঠিত অস্তগিরি, ইত্যাদি বিবাদী লক্ষণের
অলৌকিক নির্বিরোধ তথা সে-সমন্বয়ের জের
স্মিত বিদেশিনীর অভয়ে, এবং সোনার তরী
তাদের ডাকেনি অজানার অভিসারে। হিংস্র অরি
বন্দরে বন্দরে, অবিশ্বাস্য অনুচর, অবহেলা
চরমে নিশ্চিত জেনেই, বেরিয়েছিল তারা ॥

ভেলা
আমি ভাসিয়েছিলুম একদা তাদেরই মতো, আজ
এটুকুই আমার পরম পরিচয়। আমাকেও
লক্ষ্যভেদী নিষাদের উল্বণ উল্লাস উদাসীন

নদীর উজানে দিয়েছিল অব্যাহতি মাল্লাদের
গুণটানা থেকে। গাঁঠ গাঁঠ বিলাতী বস্ত্রের ভার,
রাশি রাশি মার্কিনী গমের ভাবনা ও প্রতিযোগী
ব্যাপারীর বাদ-বিসংবাদ সঙ্গে সঙ্গে গিয়েছিল
চুকে ; এবং হঠাৎ অধোগতি অনুকূল স্রোতে
হয়েছিল অবারিত। অন্তরীক্ষ বিদীর্ণ বিদ্যুতে ;
ঊর্মি ; ভঙ্গ ; জলস্তম্ভ ; সমুখ প্রত্যূষ কপোতের
পক্ষবিধূনন ; সন্নত সবিতা বেগুনী শোণিতে
লুপ্ত রহস্যের বীভৎস প্রতীক ; স্ফটস্থ জল্লার
জালে জর্জরিত তিমি ; শেষনাগ শিথিলকুণ্ডলী,
মৎকুণের উপজীব্য ; অপ্রমেয় নির্বাতমণ্ডলে
বিধ্বস্ত সলিল ; ঊর্ধ্বশ্বাস বরুণের বিপরীত
রতি—সবই দেখেছিলুম আমিও, না দেখে দেখেছি
ব'লে ভাবিনি অথবা অস্বীকার করিনি দেখার
পরে ; এবং এখন স্বভাবের অনুমোদনেই
আমার অনন্য স্বপ্ন প্রাচীন প্রাকারে সুরক্ষিত
জনপদ, স্নিগ্ধ, সান্দ্র সন্ধ্যায় যেখানে খিন্ন শিশু
ভঙ্গুর তরণী-সহ মুকুরিত নিকষ গোষ্পদে॥

কিন্তু গত শতকেও উল্লিখিত গ্রামের সন্ধান
পায়নি স্বয়ং র‍্যাঁবো, সার্বজন্য রসের নিপান
মৃগতৃষ্ণানিবারণে অসমর্থ ব'লে, সে যদিও
ছুটেছিল জনশূন্য পূর্ব আফ্রিকায়, পরকীয়
সাম্রাজ্যবাদের প্রায়শ্চিত্তকল্পে যেন (সাকী আর
কবিতা সেখানে যেমন অভাবনীয়, মদিরার
অপর্যাপ্তি তেমনই দারুণ)। আমি বিংশ শতাব্দীর
সমানবয়সী ; মজ্জমান বঙ্গোপসাগরে ; বীর
নই, তবু জন্মাবধি যুদ্ধে যুদ্ধে, বিপ্লবে বিপ্লবে
বিনষ্টির চক্রবৃদ্ধি দেখে, মনুষ্যধর্মের স্তবে

নিরুত্তর, অভিব্যক্তিবাদে অবিশ্বাসী, প্রগতিতে
যত না পশ্চাৎপদ, ততোধিক বিমুখ অতীতে।
কারণ ভূতের নির্বন্ধাতিশয়ে, তথা ভবিষ্যের
নিষেধে, অধুনা ত্রিশঙ্কু এবং সে-খণ্ড বিশ্বের
মধ্যে দ্বৈপায়ন আমরা সকলে, জানি কি না জানি..
নাস্তিরই বিবর্তবাদ। এমনকি উপস্থিত গ্লানি
সম্ভবত অবাস্তব সুললিত সে-পদ্যের মতো,
যাতে রেণু, বেণু, কদাচ ধেনুও, মিলে, ক্রমাগত
অভিভাবে আত্মোপলব্ধির অভাব লুকিয়ে রাখে :
এবং অলীক ভেবে, উচ্ছ্বসিত স্বপ্নরচনাকে
যখন করেছি ত্যাগ, সেকালে স্বকপোলকল্পিত
সর্বনাশে হাহুতাশ অবৈধ ও সাফল্যবর্জিত॥

উপরন্তু, দেবযানী-শর্মিষ্ঠার কলহকলাপে
আমার অদ্বৈতসিদ্ধি পণ্ড হয়ে থাক বা না থাক,
অকাল জরায় আমি অবরুদ্ধ নই শুক্রশাপে ;
অজাত পুরুর সঙ্গে ব্যতিহার্য নয় দুর্বিপাক।
অর্থাৎ প্রকট ব'লে সম্ভোগের অনন্ত বঞ্চনা,
পঞ্চাশে পা না দিতেই, অন্তর্যামী নৈমিষে নির্বাক :
এবং রটায় বটে মাঝে মাঝে আজও উদ্ভাবনা
পরিপূর্ণ মহাশূন্য ভস্মীভূত জ্যোতিষ্কের প্রেতে,
প্রাক্তন অভ্যাসদোষে ভুলে যায় মৌনের মন্ত্রণা
উন্নীত অমর কাব্যে কাগজের সুকুমার খেতে ;
কিন্তু চিত্তবিক্ষেপেও অভিব্যাপ্ত বর্তুল সংসার
যেখানে আসক্তি, ঘৃণা ভিন্ন শুধু প্রাগ্বর্তী সংকেতে,
এবং চক্রান্তভুক্ত পূর্বাপর নিপাত, উদ্ধার
যেহেতু, আমাকে তাই অনুযোগ, শোচনা, ঈর্ষাদি
ক্ষেপাতে পারে না আর। চরাচরে নেতির বিস্তার
নির্বিকার, হয়তো বা নিরাকার ব্রহ্মের সমাধি :

অন্তত এ-পরিবেশে মানুষের প্রার্থনাসমূহ
জাতিস্মর অভিমন্যু ; তবু স্তব্ধ বিধাতাকে সাধি—
মেনে নিতে পারি যেন অপ্রতর অসীমের ব্যূহ,
স্বপ্নে, জাগরণে যেন মনে রাখি নয় কল্পতরু
ঊর্ধ্বমূল, অধঃশাখ, দুর্নিরীক্ষ্য সেই মহীরুহ,
যাকে কেন্দ্র ক'রে ছোটে দিগ্‌বিদিকে সমুদ্র—না মরু ?

১৮ মার্চ ১৯৭৩

উন্মার্গ

ঢেউ গুণে গুণে, কেটে যায় বেলা
সিন্ধুতীরে :
জানি পুনরায় ভাসাব না ভেলা
অবাধ, অগাধ, অপার নীরে।
তবে মাঝে মাঝে কেন মনে পড়ে
পালের স্ফূর্তি উদ্দাম ঝড়ে ;
উধাও তারার ইশারায় পথ
আবার নিরুদ্দেশে,
যেথা সর্বতোভদ্র জগৎ
সম্ভাবনার নিখিল নির্বিশেষে ?

অথবা নিবাত, নির্মল, নীল
দ্বিপ্রহরে
পরিণত মায়ামুকুরে সলিল
আকাশে, বাতাসে আলস ভরে :
স্তম্ভিত তরী যেন পটে আঁকা ;
অবাক বলাকা সংবৃতপাখা ;

অনাথ দ্বীপের বৃথা অধিবাস
বিলীন বিস্মরণে ;
অপ্সরীদের নিভৃত বিলাস
মুক্তাবিকচ রক্ত প্রবাল-বনে।

কখনও আবার বাদলে ব্যাহত
আলোর গ্লানি
চেতনাচেতনে ঘনায় নিয়ত
অজ্ঞাত দিনের অন্ধ হানি :
কিন্তু একদা সন্ধ্যার আগে
মৌসুমী মেঘ ভিন্ন দু ভাগে,
স্নানযাত্রার স্বর্ণ সরণী
মুক্ত মর্ত্যধামে :
দক্ষিণে ডোবে স্মিত দিনমণি,
পৌর্ণমাসীর চন্দ্রমা জাগে বামে।

তার পর প্রতি পলের অভেদ :
দিবা ও নিশা
আনে না কালের স্রোতে বিচ্ছেদ ,
এমনকি আয়ু হারায় দিশা।
নিত্য অন্তরীক্ষ ও জল,
অতৃপ্ত তৃষা তথা কুতূহল,
এবং দুরাপ, দূর দিগন্ত—
মূর্ত অসন্ধান ;
গ্রীষ্ম, বর্ষা, শীত, বসন্ত
সে-যবনিকার প্রতিভাসে ক্ষীয়মাণ।

তবু এসেছিল সহসা ব্যাঘাত
স্বগত ধ্যানে।
কঠিন মাটির অভিসম্পাত
বর্তেছিল কি অভিজ্ঞানে ?

অস্তত দিতে চেয়েছিল ঘুষ
মণি-কাঞ্চন-যোগে প্রত্যূষ ;
প্রশস্তি ব'লে হয়েছিল ভুল
শঙ্খচিলের হাসি ;
মায়াবী পুলিনে লোভের প্রতুল
দেখেই তরণী শূন্যে অবিশ্বাসী ।

অনাত্মীয়ের মুখ চেয়ে আছি
সে-দিন থেকে :
উঞ্ছ কুড়িয়ে অগত্যা বাঁচি
নিরুপার্জন নির্বিবেকে ।
দৃষ্টির সীমা মাপে হিমগিরি ;
পর্ণকুটীরে দুর্যোগে ফিরি ;
সৈকতে এসে বসি কদাচিৎ
অমার উপক্রমে ;
মহার্ণবের সামসংগীত
হয়তো বা শুনি শুক্তির মাধ্যমে ॥

১৪ এপ্রিল ১৯৫২

প্রত্যাবর্তন

গোধূলি উড়িয়ে, সন্ধ্যার হাওয়া যখন ওঠে,
নিষ্কলঙ্ক, নিঃস্ব নভস্তলে
নক্ষত্রের প্রাক্তন কারুকার্য ফোটে,
মহাসমুদ্র চকিত বাড়বানলে,
চিরপরিচিত জগৎ অন্নে অন্নে
পরিবর্তিত মুগ্ধ চিত্রকল্পে,
তটের জনতা নৌজীবীদের গল্পে
কান পেতে থাকে অলস কৌতূহলে,

তখন অপারে ফেরে বন্দরে,
কেবল সুখের ময়ূরপঙ্খী অকূলে ছোটে॥

২

বামে বিস্তৃত নারিকেলবীথি – বনচ্ছায়া
স্বচ্ছ বিরল গ্রামের ধবল লেপে ;
দক্ষিণে জল – শ্যাম লাবণ্যে মরীয়া মায়া,
প্রখর পিপাসা লক্ষ যোজন ব্যেপে।
নিমেষে নিমেষে গতিবেগ ক্রমতূর্ণ ;
স্থলের দর্প প্রবালপুঞ্জে চূর্ণ ;
অর্ধবৃত্ত অবশেষে পরিপূর্ণ ;
অনন্ত অপ্ ব্যোমের অবক্ষেপে।
বিশ্ব স্বাধীন : অম্বরে মীন ;
মাটির মমতা-মুক্ত তিমির পৃথুল কায়া॥

৩

মধ্যে মধ্যে শুভ্রমৌলী ইন্দ্রনীলে
পীত-হরিতের অচির আভাস লাগে ;
অজানা দ্বীপের বার্তা রটায় শঙ্খচিলে . .
শৈশবে শোনা রূপকথা মনে জাগে। –
হয়তো সেখানে অশোককাননে বন্দী
বৈদেহী সাধে বিধাতারই অভিসন্ধি ;
অন্তত বায়ু চন্দনে সৌগন্ধী,
স্বর্ণলঙ্কা রম্য অস্তরাগে।
রাম-রাবণের প্রত্ন রণের
জের তাহলেও ন্যস্ত বিশ্বামিত্র খিলে॥

৪

অসীম অমায় সহসা স্বরাট্ অনুপ্রভা
বুঝি বা পেনাং আবার সন্নিকটে।

মন্থর তরী — তরল রজতে সীতার শোভা ;
ডাকে অদৃশ্যে অপ্সরী ছায়ানটে।–
উদয়গিরির শিখরে সবুজ সূর্য
শর্বরীশেষে আকস্মিকের তূর্য ;
অবিশ্বাস্য উদ্‌ভিদে বৈদূর্য ;
অথচ কী উৎকণ্ঠা সর্ব ঘটে !
শিবি পলাতক , গুপ্ত ঘাতক
গুল্মে গুল্মে : আতঙ্কে আদি অটবী বোবা ॥

৫

প্রতিবিম্বিত উপসাগরের শান্ত নীরে
সরল শৈল টাইফুনে অবিচল,
প্রতীক্ষামাণ স্নেহে হংকং তরণী ঘিরে ;
পরিমণ্ডল আশ্রিতবৎসল।
কিন্তু তাকিয়ে দেখি সেই সংকীর্ণ
উপকূলে উদ্বাস্তুরা উত্তীর্ণ ;
তারা যেন নীলকণ্ঠের উদ্‌গীর্ণ
যুগান্তরের অজীর্ণ হলাহল।
স্রোত প্রতিকূল ; চীনে দিক্‌শূল ;
তাতারহানার পুনরুদ্যোগ অন্য তীরে ॥

৬

অণুবিদারণে শত সহস্র মানুষ হত,
ব্যক্ত অভিব্যক্তিবাদের ফাঁকি :
বেতালগ্রস্ত বিকলাঙ্গের দুষ্ট ক্ষত,
পরিত্যাজ্য হিরোশিমা, নাগাসাকি।
জিত ও বিজেতা অবশ্য প্রত্যক্ষে
সুপ্রতিষ্ঠ অনুকরণীয় সখ্যে ;
প্রত্যাখ্যান তবু সংবৃত চক্ষে,
কক্ষলগ্ন প্রকোষ্ঠে নেই রাখি।

উলঙ্গ রামা-সহ য়োকোহামা ;
বিদেশী নাবিক মাতাল এবং অপরিণত ॥

৭

প্রতিদ্বন্দ্বী কোটি মৈনাক দিগ্‌বিদিকে,
নিরর্থ নাম প্রশান্ত পারাবার :
গগনে গগনে বজ্র শাসায় জনান্তিকে ;
পদান্তে প্রাগ্‌জৈবিক হাহাকার।
আচম্বিতেই দক্ষিণমুখ রুদ্র—
বরাভয়ে পুন পূর্বাশা উন্মুদ্র ;
অন্তত সান্‌ ফ্রান্‌সিস্কোর ক্ষুদ্র
কুলায়ে নিখিল নাস্তির প্রতিকার।
আগলায় ভাট সোনার কবাট,
প্রবেশাধিকার দেয় না বিজাতি কাণ্ডারীকে ॥

৮

অর্ণবপোত ফলত উধাও নিরুদ্দেশে :
সুহৃদ্‌ পুলিনে উষ্মা নিয়ত বাড়ে ;
আঁধির নৃত্য রুক্ষ নগের সন্নিবেশে,
অন্তমিত ঘুণ পৃথিবীর হাড়ে হাড়ে।
যথাকালে ক্ষ'য়ে যায় সে-বাম ভূখণ্ড ;
দ্বৈপসাগরে স্বতন্ত্র মানদণ্ড·
পশ্চিমে সাম্রাজ্যের মার্তণ্ড ;
মাৎস্যন্যায় প্রাচীর স্বস্তি কাড়ে।
উর্ধ্বশ্বাস আয়ন বাতাস ;
অতলান্তিক উঠে গণ্ডির বাহিরে হেসে ॥

৯

আকাশে পাতালে উত্থান পাত একদা থামে,
কুয়াশায় ঢাকা টেম্‌সের মোহানায়,

যার নেপথ্যে লণ্ডন্ অভিষিক্ত ঘামে
নায়কের পাঠ বারে বারে ভুলে যায়।
রূঢ় মার্সেই বিকট প্রায়শ্চিত্তে;
নিঃস্ব নাপোলি অনুপার্জিত বিত্তে:
মরণাপন্ন আথিনে কুপিত পিত্তে:
স্টেপের প্রসারে লোকালয় নিরুপায়॥
আর্তে আর্তে, স্বার্থে স্বার্থে
সংঘাত তথা বিপ্রকর্ষ মর্ত্যধামে॥

১০

ইস্তান্‌বুল্ সাধে গম্বুজ, মিনার থেকে;
কৃষ্ণসাগর গর্জায় উত্তরে।
সুবিধাবাদের ক্লৈব্য বাচাল দম্ভে ঢেকে,
নাতিদূরে কারা সুয়েজের ধুয়ো ধরে?
আরবে ধর্মরাজ্য পাতার জন্যে
এডেন্ পূর্ণ য়িহুদির হৃত পণ্যে।
নৈর্ব্যক্তিক করাচির জনারণ্যে
ক্ষুধিত রক্ষ, হিন্দু, যা খুশি করে।
স্বপ্নচারিতা নিতান্ত বৃথা:
বাঁচে মাঝি, চেনা ঘাটের কাদায় নৌকা ঠেকে॥

২৩ মে ১৯৫৩

প্রাক্তনী

পুনর্লিখিত কৈশোরিক কবিতা

লগ্নহারা

তোমার-আমার বাড়ির মধ্যে যবে
ছিল শুধু সরু গলির ফাঁক,
চোখে চোখে চলত দেওয়া-নেওয়া,
বলার সময় জিহ্বা হতবাক্‌ ;

যখন তোমার বাতায়নে চেয়ে,
ভুলে যেতুম চার প্রহরের ভেদ ;
সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বললে তোমার ঘরে,
মিটত যখন আমার সকল খেদ ,

বহু যুগের ও-পার হতে যবে
প্রথম আষাঢ় পাঠাত মেঘদূত ;
সুযোগ যখন আসত ঘুরে ঘুরে,
বরণমালা হত না প্রস্তুত ;

সে-দিন তোমার মুখের মধু পেলে,
ফুটত না কি বকুল মরা ডালে ;
ভুলের পরে জমত কি ভুল তবু ;
পথ হারাত রথ কি চাকার টালে ?

এখন থাকি পৃথক্ পৃথক্ দ্বীপে ;
অশ্রুসাগর হুংকৃত মাঝখানে :
সেতু—সে তো দূরের কথা, হেথা
খেয়াঘাটও মিলে না সন্ধানে।

কাঁটার বেড়া গহন গুহার দ্বারে ;
চাই না আগন্তুকের ব্যাঘাত আমি।
তুমি জাগো পরের শয়নীয়ে ;
ঘুমে বিভোর তোমার অন্তর্যামী।

লগ্ন গত। কী হবে আর ভেবে
কবে ছিল কিসের সম্ভাবনা।
চর্মচক্ষু যবনিকায় ঢাকা ;
স্মৃতি থেকে মুছুক প্রস্তাবনা ॥

আদি রচনা : ১৮ চৈত্র ১৩৩০

অসময়ে আহ্বান

মরণ, আমারে দিয়েছ আজিকে ডাক।
নান্দীমুখেরও বহু বিলম্ব আছে ;
সকালে বাজায়ে সন্ধ্যাবেলার শাঁখ,
মিয়াদীরে বলো এখনই আসিতে কাছে ?
পাতা-ঝরা বনে তুষার গলেছে সবে।
কল্পতরুর সন্ধান নিতে হবে,
অন্তত ফুল ফুটুক অফলা গাছে ॥

ধ্যানে আজকাল প্রায়ই মানসীরে হেরি ;
পেয়েছি মূর্তিপূজায় প্রত্যাদেশ।
উজ্জীবনের যদিও অনেক দেরি,
তবু প্রতিমার কাঠামো হয়েছে শেষ।
ঘটুক মিলন সাধ্যে এবং সাধে ;
তার পর দিও দীক্ষা শূন্যবাদে,
তার পর মুখে তাকায়ো নির্নিমেষ ॥

দুর্মদ আজও রয়েছে উর্ধ্বশির ;
এখনও জগতে ব্যক্ত অত্যাচার ;
অবমানিতের অবল অশ্রুনীর
ঝরে ঘরে ঘরে ; দেশে দেশে হাহাকার।

স্বার্থ এখনও মরে নাই অপঘাতে;
রাজ্যদণ্ড বিরাজিত তার হাতে;
অপ্রতিহত মিথ্যার বিস্তার।

গতানুগতিক আশ্বাসে এত কাল
বিমুখ থেকেছি শাসননাশন ব্রতে;
কোষে নিবদ্ধ খরধার করবাল,
মোহন মুরলী খসেনি হস্ত হতে।
আজও অনুভবে নিহিত সম্ভাবনা,
নিরুদ্দেশের অসীম উন্মাদনা
উহ্য যেমন বন্দরে বাঁধা পোতে।

কান পেতে শুনি যেখানে দিগন্তরে
পুরাতন বাঁধ ভাঙে বিদ্রোহবানে;
দেখি ঝঞ্ঝার আয়োজন অম্বরে;
আমিও আহূত বুঝি মুক্তিস্নানে।
অনুমতি দাও আরও কিছু কাল থাকি
বিশাল বিশ্বে, বিস্ফারি দুই আঁখি;
ডেকো না, মরণ, এখনই সন্নিধানে।

আদি রচনা: ২৪ চৈত্র ১৩৩০

প্রত্যাখ্যান

আমার মনের বনের সংগোপনে
যেই পারিজাত ফুটে উঠেছিল স্বত;
অনিবারণীয় ঋতুপরিবর্তনে
যার মধুরিমা হয় নাই অপগত;

কালবৈশাখী-আরোহী রুদ্রপাণি
পথের ধুলায় পাড়িতে পারেনি যারে ;
রূঢ় নিদাঘের পিপাসাপীড়িত হানি
শোষণ করেনি যে-সৎ স্নিগ্ধতারে ;

ভরা বাদলের অনুচিত প্রশ্রয়ে
উথলেনি যার হৃদয় আচম্বিতে ;
চাহেনি যে ভাগ শরতের অপচয়ে ;
কীটের উদর ভরায়নি কভু শীতে ;

নব বসন্তে, নায়িকানির্বিশেষে,
দিইনি যে-ফুল কণিকার হাতে তুলে ;
সে-কুসুমে রচি অঞ্জলি অক্লেশে,
রাখিয়াছিলাম তোমার চরণমূলে।

এক বার তুমি তাকালে না তার পানে,
গন্ধে, পরাগে নিলে না নিজেরে ভরি ;
কর্ণিকাসার তাই সে দিনাবসানে ;
ত্রিসীমায় আর আসিবে না মধুকরী॥

আদি রচনা : ১৪ জ্যৈষ্ঠ ১৩৩১

প্রতিধ্বনি

নিষ্ফল খেদ, বৃথা নির্বেদ,
মিছে কাঁদা ;
যাচক হস্ত অনভ্যস্ত,
মৌনী বীণারে মিছে সাধা।

সান্দ্র আলসে কাটালেম দিনগুলি ;
উপভোগে গেছি বেদনার রীতি ভুলি ;
ভ্রষ্ট লয়ে ঝাড়িয়া যুগের ধূলি,
মিছে আজি তার বাঁধা।
অপটু যন্ত্রী, ছিন্ন তন্ত্রী ;
ব্যর্থ প্রয়াস, বৃথা কাঁদা ॥

নিভৃত নিশীথে জাগিবে না চিতে
সান্ত্বনা ;
করিবে না মিড় নিরাসক্তির
নম্র মহিমা-বিরচনা।
তীব্র নিখাদে হবে না সহসা মূক
বিরূপ সভার প্রগল্‌ভ কৌতুক ;
অনুকম্পায় মহাকাশ জাগরূক,
দিবে না উদ্দীপনা।
সংগীতশেষে অফুরান রেশে
জাগিবে না আর সান্ত্বনা ॥

একদা প্রভাতে কঠোর আঘাতে
বীণাখানি
অজস্র সুরে সমে ঘুরে ঘুরে,
পেয়েছিল খুঁজে ধ্রুব বাণী।
আজি অপরের দূরাগত রাগালাপে
শিথিল তন্ত্রী মুহুমুহু শুধু কাঁপে
কভু অভিমানে, কখনও বা পরিতাপে,
মূর্তমূর্তি হানি।
দুঃখের ভয়ে ধরিনি হৃদয়ে,
তাই হতবাক্ বীণাখানি ॥

আদি রচনা : ১৬ অগ্রহায়ণ ১৩৩২

অনিকেত

আজিকে মেঘাবচ্ছিন্ন প্রথম আষাঢ়ে
অনাহূত কে অতিথি অবরুদ্ধ দ্বারে
হানি মৃদু করাঘাত, করিতেছে দাবি
প্রণিধান মোর অন্তমনে ? কে মায়াবী,
আকাশে অঙ্গুলি তুলি, বলে কানে কানে
নিশ্চিন্তে পাঠাও মেঘদূতেরে সেখানে,
আজন্মবাঞ্ছিতা যেথা, শুক্লাম্বরে ঢাকি
কৃশ তনু, ব'সে আছে একবেণী, আঁখি
ন্যস্ত দিগন্তরেখায় ? সজল মল্লারে
কে ঘোষিছে শ্রীচরণ রাখিয়া কহ্লারে,
আসিবে শারদলক্ষ্মী, ঝরায়ে শেফালী,
অঞ্চলে নবীন ধান্য ; বিরহের কালি
মিলনের পূর্ণিমায় রহস্য ঘনাবে ?
অতীতেও অনুকূল ঋতুর প্রভাবে
প্রতারক দুরাশারে দিয়েছি প্রশ্রয়
বারংবার ; তবু আজ তোমার অভয়
পুলক জাগায় দেহে, ভোলায় জিজ্ঞাসা।
দু কূল ছাপাতে চায় যবে কর্মনাশা
নিঃসঙ্গ ঝড়ের রাতে, অর্গলিত ঘরে
কলঙ্ককিরীট দীপ ভয়ে কেঁপে মরে,
তামসীরে ব্যক্ত করি, অমনই সুদূরে
তোমার চরণধ্বনি বাজে দিব্য সুরে ॥

শীতে, গ্রীষ্মে, প্রাবৃটে, শরতে আমি শুনি
পাতা-ঝরা প্রতিবেশে, হে নিত্য ফাল্গুনী,
তুমি আসো ; দ্বন্দ্বযুদ্ধে তুষি কিরাতেরে,
আনো পাশুপত অস্ত্র, কুচক্রীর ফেরে

ধর্মরাজ্য বিপন্ন যখনই। হিংসা যবে
পুষ্ট হয় অভ্রভেদী মিথ্যার খাণ্ডবে,
তখন ভিক্ষুর বেশে সত্যবৈশ্বানর
তোমারে জানায় ক্ষুধা; হে গাণ্ডীবধর,
তুমি তার পারণ করাও। জ্যোতিঃস্রোতে
নামে দূর, দুর্নিরীক্ষ্য নীহারিকা হতে
তোমার আকাশবাণী, হৃদয়বেতারে
স্বতঃস্ফূর্ত অবেদ্য সংগীত। বিজেতারে
খুঁজে পাই চেতনার অতলে অমনই;
বসন্তের উগ্র মদে উদ্বুদ্ধ ধমনী
ব্যাপ্তি চায় অমেয় জগতে; মনোরথ
অবাধে সম্মুখে ছোটে, যেথা ভবিষ্যৎ
লব্ধকাম হেমন্তের সুবর্ণসম্ভারে
শোভমান, এবং মৃত্যুর পরপারে
শান্ত, শিব, সুন্দরের অসীম সুষমা,
অম্বিষ্ট নির্বাণ আর সর্বদর্শী ক্ষমা—
বীতশোক তথাগত সাঙ্গ কর্মফল,
তন্মাত্রের অঙ্গীকারে পুনরবিকল॥

খেদ এই ক্ষণস্থায়ী তুমি: আসো, যাও
খুশিমতো; যাচকের নির্বন্ধ এড়াও;
দুর্গম সংকেতে ডেকে, বিপ্রলব্ধ করো;
শূন্য থাকে মনের মন্দির; মূর্তি ধরো
নীরদের নিয়ত বিকারে; পরিচয়
দাও না সম্পূর্ণ হতে; ঘোচে না সংশয়
তোমারে নেহারি কি না প্রসারিত মাঠে
প্রত্যূষের কুয়াশায় ঢাকা—খেয়াঘাটে
গৃহগামী কৃষকেরা যবে সন্ধ্যাবেলা
জটলা পাকায়; তোমারই প্রচ্ছন্ন খেলা

একাগ্র কর্মীর অভীষ্ট অসিদ্ধ রাখে—
অবদান অর্শায় অলসে ; নগ্ন শাখে
প্রতিভাতি পলাশের উচ্চকিত শোভা,
পথিকের গন্তব্য ভোলাও ; কখনও বা
অগোচর কদম্বের তীব্র গন্ধোচ্ছ্বাসে
বিঘ্ন আনো বৈরাগীর শ্মশানবিলাসে।
মানি তুমি আশ্বাসে কৃপণ নও ; তবু
অন্তর্ধানব্যতিরিক্ত আবির্ভাব কভু
তোমার স্বভাব নয়। নিষ্ফল সন্ধানে
ফুরায় সামর্থ্য তাই, বিরল আহ্বানে
সর্বদা জাগে না সাড়া, ভাবি মাঝে মাঝে
তুমি স্বপ্ন, ধ্রুব সত্য প্রপঞ্চে বিরাজে॥

আদি রচনা : ৪ আষাঢ় ১৩৩২

পথ

অন্ধগ উত্তর হতে পলাতক দক্ষিণের পাছে
ছুটেছে একাগ্র পথ, দুর্নিবার, নির্ভীক, উৎসুক,
অবিশ্রাম। লঙ্ঘি গিরি, অতিক্রমি নদী, দ্বিখণ্ডিত
করি শ্বাপদসংকুল অরণ্যানি, শত নগরীর
প্রলোভন উপেক্ষি নির্দয়ে, প্রাগ্রসর ঋজু পথ,
যেন বিশ্বমানবের কার্যক্ষম করে ঊর্ধ্বরেখা—
অনুকূল দৈবের স্বাক্ষর। জাতিগত চেতনার
কুহেলীগুণ্ঠিত প্রাগূষায়, স্বপ্নোত্থিত কৃষ্টি যবে
মৌল জিগীষায় উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতিরে চেয়েছিল
আয়ত্তে আনিতে, হানি তার নিষ্কবচ বুকে শেল,

গদা, পরশু, প্রভৃতি প্রাগৈতিহাসিক অস্ত্র, সেই
অক্রিয় বশীকরণের অলজ্জিত অভিজ্ঞান
এই রক্ত পথ, প্রগল্‌ভ প্রবাদ উৎকীর্ণ সকল
দেহে, কী বলে নিবিদে ?

মনে হল ও-মহাপথের
সঙ্গে আমি পরিচিত জন্মপরম্পরাসূত্রে ; ওর
ধূলিকণায় নিহিত যে-অস্থিতি, পূর্বপুরুষেরা
আমারে বসায়ে গেছে সে-জঙ্গম উত্তরাধিকারে ।
উড্ডীন মৈনাকে করেছিল অভীপ্সাসঞ্চার তারা ;
তাদেরই জিজ্ঞাসা ঐকান্তিক পদচিহ্ন এঁকেছিল
রিক্ত নিরুদ্দেশে ; চক্রব্যূহ রচেছিল, মরীচিকা
দিয়ে, আত্মম্ভরি মরুতে তারাই ; রথের নেমীতে
অরাতির পঞ্জরাস্থি নিয়ত নিষ্পেষি, এনেছিল
সংহতি কর্দমে, অনাগত ভবিষ্যতে সন্তানের
অশ্বমেধ যাতে না পায় ভৌতিক বাধা । অকস্মাৎ
কালের প্রবাহ ছুটিল পশ্চাৎ মুখে, প্রত্যক্ষের
সীমা উত্তরিল শাশ্বত সংবিৎ, ইন্দ্রিয়নিচয়
যেন পাসরিল অধিকারভেদ ॥

উৎকর্ণ নয়নে
দেখিলাম, শুনিলাম অনিমেষ কানে এশিয়ার
আমেরু বিস্তারে ইতস্তত অপদেবতার লীলা
প্রায় অবসিত ; গতানুগতিক শ্রমে মোহ্যমান
জনতার ঘুম উপক্রুত অকারণ অসন্তোষে ;
বিষম বিরাম ব্যক্ত একাধিক বার একতান
নিঃশ্বাসে-প্রশ্বাসে ; নিষিদ্ধপ্রবেশ হৃদয়ের দ্বারে
করাঘাত, অবিবেকী প্রণয়ীর মন্ত্রণা যেমন
কুমারীর আদিষ্ট কুণ্ঠায় ; অনাদি তুষার—অজ,

অন্ধ অসূর্যের পুরাণ প্রতীক — তাতে মলয়ের
দৌড়ো মুহুর্মুহু সংক্রান্ত সিন্ধুর — রৌদ্রসমুজ্জ্বল,
ইন্দ্রনীল, সচল সিন্ধুর — উন্মুখর আমন্ত্রণ ;
সমষ্টি গর্ভিণী প্রাতিস্বিক প্রাণের প্ররোহে ; যৌথ
অনীহায় উহ্য উৎক্রম, উদ্দেশ ॥

সহে না, সহে না
আর দিনগত পাপের ক্ষালনে নিত্য অনুতাপ ;
বদ্ধমুষ্টি পৃথিবীর উচ্ছিষ্ট কুড়ায়ে সধর্মীর
সঙ্গে বিপ্রলাপ ; গোঠে বা শিকারে উদয়াস্ত বৃথা
কায়ক্লেশ ; বুভুক্ষু প্রদোষে ফেরা পৈতৃক কারায় ;
মিটাতে বংশের দাবি মধ্য রাত্রে অভ্যস্ত আশ্লেষ ।
শুধু মুখ-চেনা বান্ধবের সুলভ সহানুভূতি
রোগে, শোকে, দুর্বিপাকে অনন্য সহায় ; আশ্রিতের
উৎকণ্ঠায় অনিরুদ্ধ মৃত্যুর প্রস্তুতি দুর্বিষহ
লাগে । দীপাধারে পশুর দুর্গন্ধ মেধ ; বিষায়িত
কুটীরের ভিড়ে একাকার সন্নিধির নিরালোক
জ্বালা ; বিশ্বামিত্র অর্গল কবাটে । শত শ্রেয় ঝড় ;
তাণ্ডবে উৎক্ষিপ্ত হিম দ্বারের বাহিরে ; জড়ে জীবে
দ্বন্দ্বযুদ্ধ, স্বতন্ত্র উভয়ে ॥

অনুন্নত আকাশের
ষড়যন্ত্রভাগী, যে-তুঙ্গ পর্বতশ্রেণী মানবের
স্ফূর্তিরোধ করে সংকীর্ণ ক্ষিতিজে, তার পরপারে
সমভূমি মমতার বিনিময়ে স্বোপলব্ধি চায়
সমর্পিতে । সুপ্ত পুত্র-কলত্রের মুখ, দুর্দিনের
পরিপন্থী জঞ্জালের বোঝা, জ্যোতিষীর অনুমতি,
মানা মুছে যাক মন থেকে নিশিশেষে দুঃস্বপ্নের
মতো । অথবা বিরহ নিতান্তই নিগূঢ় অন্তরে

যদি জাগে, তবে যেন সে-শূন্যকেন্দ্রিক বহ্নি তাপ
তথা আলোক বিতরে পরাবর্তহীন সর্বনাশে।
কক্ষচ্যুত ধ্রুবতারা ; নেই কালপুরুষ শিয়রে ;
অন্ধকারে দুষ্পাঠ্য ললাটলিপি ; অশ্লেষা-মঘায়
কতিপয় মরীয়া মানুষ অজানার অভিসারে
বদ্ধপরিকর॥

হ্রেষারব সহসা স্বাগত মৌনে।
তার পরে দুরুদুরু—সে কি হৃৎস্পন্দ, না ক্ষুরধ্বনি
তুষারঘূর্ণিতে ? কোথা সহযাত্রীরা সকলে ? পাশে
কে অপরিচিত, অতিকায় জন্তু, না দানব ? শীত,
শীত, নিখিল নাস্তির শীত সংক্রমিত ধাবমান
দেহের উষ্মায়। গিরিগাত্রে সম্পাতের ভয় ; প্রতি
পদে নিমজ্জন আবক্ষ গহ্বরে ; এবং সানুতে
প্রতিকূল বায়ুর শীৎকার অতিষ্ঠ, অপৌরুষেয়।
সেখানে প্রত্যুষ উষার নিষ্ঠুর বিড়ম্বনা, শ্বেত
দংষ্ট্রা অপ্রতর শিখরসমূহ, এবং পাতাল
প্রগতির অভিমুখে, অতিক্রান্ত সোপানে সোপানে।
অবশেষে অন্বিষ্ট সংকটপ্রাপ্তি সংকল্পের গুণে,
কণ্ঠাগত প্রাণে অবরোহ বিমুখ বাহন-সহ,
এবং বিশ্রাম, শৈলমূলে অমেয় বিশ্রাম॥

বুঝি
যুগান্তরে সূর্যোদয় তীর্ণ বৈতরণীর সৈকতে।
সঙ্গে সঙ্গে তৃষিত বল্লমে শোণিতের প্রতিশ্রুতি ;
লোলবল্গা তুরঙ্গের গতি কোষবদ্ধ কৃপাণের
মুমুক্ষা-শিঞ্জিত ; তূর্যে তূর্যে দিগ্বিজয় ; বর্বরের
বিধ্বস্ত পত্তন প্রজ্ঞার আহুতি অভিযানে ; বনে
বা গুহায় পৌত্তলিক অন্ত্যজের অক্ষম কল্পনা
নির্বাসিত ; অরাজক অন্তরীক্ষ ধ্বনিত সোহহমে।

তার পর ? যবনিকাপাত ; চূড়ান্তের প্রাক্কালেই
প্রস্থিত নায়ক ; সূত্রধার পর্যন্ত নির্বাক ; ভূমা
অকস্মাৎ অনেকান্ত সংসারে শতধা ; জীবন্মৃত
অমৃতের আত্মজ সন্ততি ; নির্জন পথের শেষ
চক্রবালে বিন্দুপরিমাণ ; ভবিতব্যে ভবিষ্যৎ
লুপ্ত পুনর্বার ; রাত্রি প্রত্যাগত ॥

দাঁড়াও, দাঁড়াও,
আদি পিতা ; নতুবা নেপথ্য থেকে করো নিবারণ
আত্মজের ন্যায্য কৌতূহল। দিগ্‌বেদে ঘটেনি ভুল
যবে চতুঃসীমার সন্ধিতে দিশারীর সান্ধ্য সভা
বাদ-বিতণ্ডায় হয়েছিল বিভক্ত হঠাৎ ? ফলে
এক দল গিয়েছিল অস্তাচলে, মর্ত্যের মহিমা
একর্ঘিরে যেখানে প্রত্যহ টানে ; এবং অন্যেরা,
অনন্তযৌবন ধরিত্রীরে মৃত্যুর উৎকোচ ভেবে,
প্রাচ্যেও নির্বাণ খুঁজেছিল প্রাতঃসন্ধ্যা জ'পে। কোন্
পথ উপনীত পূর্ণের সকাশে ? না কি উভয়ত
সমাপ্ত সমস্ত চেষ্টা আত্মপ্রদক্ষিণে ? অকারণে
পৃথগন্ন ভ্রাতৃদ্বয় ? নষ্টমোহ ব'লে অবিচল
গন্তব্যের উপান্তে পথিক ? কৈবল্য কোথাও নেই ?
জগৎ অন্বয়ব্যতিরেকী ?

কিন্তু নিরুত্তর তুমি ;
হাওয়ার দমকে খুলেছিল যে-গবাক্ষ অতীতের
প্রত্ন অন্ধকূপে, বন্ধ তা আবার ; চক্রচর প্রতিহারী
জিজ্ঞাসুরে বিতাড়িত করে প্রতিবেশী অটবীতে,
যেখানে গোষ্পদে কৃষ্ণসার আপনার প্রতিচ্ছবি
দেখে আর ভাবে গৌরব জটিল শৃঙ্গে, লজ্জা তথা
দুর্গতি চরণে। বৈজয়ন্তী ঘিরে শিবিরের নৈশ

সন্নিবেশ আদিগন্ত প্রান্তরের শ্যাম সমারোহে
কিংবদন্তীমাত্র আজ প্রাকারবেষ্টিত জনপদে ;
কুরুক্ষেত্র সূচ্যগ্র মেদিনী ; পরিচ্ছিন্ন ভূমণ্ডল
স্বদেশে বিদেশে, জাতিভেদ সমাজে সমাজে ; গৃহী
ও বিষয়ী সাধে সার্বভৌম প্রব্রজ্যার বাধ ; পথ
অনাত্মীয় ; অন্তর্হিত বজ্রজ্বালাকিরীটী পুরুষ।
অচিন্ত্য পুনরাবৃত্তি নিরপেক্ষ কালের প্রবাহে ॥

আদি রচনা : ৫ চৈত্র ১৩৫৪

প্রতিধ্বনি

ইন্দিরা ও সুশীলকুমার দে-র

করকমলে—

ভূমিকা

আমার মতে কাব্য যেহেতু উক্তি ও উপলব্ধির অদ্বৈত, তাই আমি এও মানতে বাধ্য যে তার রূপান্তর অসম্ভব; এবং ইংরেজীর ব্যাকরণস্বাচ্ছন্দ্য, গুণবাচক শব্দের প্রতি ফরাসীর মোহ, অথবা জার্মানের অন্বয়, তথা সমাসবাহুল্য, যদিচ বাংলাতে একেবারে দুর্লভ নয়, তবু ওই ভাষাত্রয় আর বঙ্গবাণীর মধ্যে আকাশ-পাতালের প্রভেদ বিদ্যমান। অন্ততপক্ষে ভুক্তভোগীরা জানেন যে পাশ্চাত্যের কোনও কোনও সদর্থক বক্তব্য যেমন আমাদের বোধগম্য হয় নেতির সাহায্যে, তেমনই আমরা এমন অনেক কথা প্রত্যহ ব্যবহার করি যা পশ্চিমে বাগাড়ম্বরের পরাকাষ্ঠা; এবং সেই জন্যে, "ম্যাক্‌বেথ্"-এর জনৈক সাম্প্রতিক অনুবাদকের মতো, আমি বলতে পারি না যে পরবর্তী পদ্যরচনা বিবিধ বিদেশী কবিতার আক্ষরিক তর্জমা তো বটেই, এমনকি ছন্দের দিক থেকেও যথাযথ অনুকরণ। অনুরূপ চেষ্টা আসলে অনর্থের বিড়ম্বনা; এবং ভাব ও ভাষার অবিচ্ছেদ্য সমীকরণই যে কবির একমাত্র কর্তব্য, এ-সত্যে পৌঁছতে আমার অর্ধেক জীবন কেটে গেলেও, অপরীক্ষিত আত্মবিশ্বাসের প্রথম যুগেই আমি বুঝেছিলুম যে বঙ্গানুবাদ যখন বাঙালীদেরই পাঠ্য, তখন তার বিচারে বঙ্গীয় আদর্শের বিধি-নিষেধ অকাট্য। অর্থাৎ বাংলা অনুবাদের ছন্দে ইংরেজী পঞ্চপার্বিকের একান্তর ঝোঁক উপস্থিত কিনা, তা আপাতত বিবেচ্য নয়: আমাদের কানে ভালো না লাগলে, তার বৈচিত্র্য নিতান্ত অসার্থক; এবং চিত্রকল্পের বেলাতেও মাছি-মারা কেরানী রসাভাস ঘটায়, অভীষ্ট আবেগ জাগিয়ে, দর্শকের সাধুবাদ পায় না।

পক্ষান্তরে বাংলা জীবন্ত ভাষা; এবং সেই জন্যে, গ্রামে জন্মেও, শুধু সংস্কৃত কেন, আরবী, ফারসী, হিন্দী, উর্দু, পর্তুগীজ্, ফরাসী, ইংরেজী প্রভৃতির কাছে নিঃসংকোচে হাত পেতে, সে আজ নগরেও অল্পবিস্তর লব্ধপ্রতিষ্ঠ। সুতরাং তাকে ভাবনার নূতন প্রণালী শেখানো অপেক্ষাকৃত সহজ, এবং তার ব্যঞ্জনা বাড়ানোর অন্যতম উপায় অনুবাদ। অবশ্য স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের ধর্ম-নিরূপণে একদা যৎপরোনাস্তি হঠোক্তি করেছিলেন; এবং বাংলার পরিপাক-শক্তি কতখানি, সে-বিষয়ে নিরুক্তির সাহস আর যার থাক, আমার নেই। কিন্তু এ-সিদ্ধান্তে বোধহয় অনেকে সায় দেবেন যে যীশুর জীবনী লিখতে এখন যেমন অনূদিত বাইবেলের আক্ষরিক রীতি অনাবশ্যক, তেমনই অনাবশ্যক

ক্রীস্‌মাসের পরিবর্তে জন্মাষ্টমীর ব্যবহার ; এবং তার পরে এমন একটা সাধারণ নিয়ম হয়তো গ্রাহ্য যে ভাবচ্ছবির তারতম্যেও অভিপ্রায় যেখানে বদলায় না, সেখানেই পরিচিত, বা সার্বভৌম, প্রতীক প্রয়োজ্য, অন্যত্র নয়। কারণ, শোচনীয় শোনালেও, না মেনে উপায় নেই যে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের যাঁরা প্রকৃত উৎসাহী, তাঁদের চিন্তায় পশ্চিমের প্রভাব প্রাচ্যের চেয়ে বেশী ; এবং কেবল তাঁরা নন, এ-দেশের জনগণ সুদ্ধ পাশ্চাত্ত্য লোকযাত্রার একাধিক উপসর্গে উপক্রত। ফলত সাম্প্রতিক বাঙালী লেখকের পক্ষে তর্জমা আর মূল রচনার সমস্যা সমান, এবং যিনি চর্বিতচর্বণে সন্তুষ্ট নন, আপন মনের কথা মাতৃভাষায় ফুটিয়ে তুলতে বদ্ধপরিকর, তিনি যে-উপায়ে আত্মপ্রকাশের চাহিদা মেটান, অনুবাদের সাফল্য তারই ইতর-বিশেষ।

অর্থাৎ অনুভূতি ও অভিব্যক্তির অনৈক্য এ-ক্ষেত্রেও পণ্ডশ্রমের সাক্ষ্য ; এবং স্বরচিত কবিতায় ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষের যে-স্থান, কবিতার অনুবাদে সে-আসন আপাতত মূলের প্রাপ্য। অবশ্য বহির্বিশ্ব আর অন্তর্লোকের মধ্যে কার্যকারণের সম্বন্ধ স্থূল বুদ্ধিরই আবিষ্কার, এবং কাকতালীয় ন্যায়ে এক বার আস্থা হারালে, শুধু এই পর্যন্ত স্বীকার্য যে উভয় জগৎ সমান্তরালবর্তী। কিন্তু একটু ভাবলে, নিঃসংশয় জড়বাদীও অগত্যা মানবেন যে সাহিত্যসৃষ্টি নির্বাচনসাপেক্ষ ; এবং কাব্যে হয়তো নিষ্কর্ষিত অভিজ্ঞতারও প্রবেশ নিষিদ্ধ : দেশকালগত উপলব্ধি অবচেতনে তলালে, মানসে যে-আলোড়ন শুরু হয়, রসাত্মক বাক্য বুঝি বা তারই শেষ। অনুবাদের বেলা সংবেদনার পরোক্ষ প্রতিক্রিয়া নামে আদ্য অনুভবের ভূমিকায় ; এবং পরে যা ঘটে, তার সঙ্গে কবিতারচনার একমাত্র পার্থক্য এই যে এখানে আদিভূতের বিষয়ে মতান্তরের অবকাশ অল্প। তাহলেও এমন সার্থক লেখা বিরল যার অভিপ্রায় যুগে যুগে বদলায় না, অথবা যাতে পাঠকবিশেষের ব্যাপক বোধশক্তি প্রশ্রয় পায় না ; এবং সেই জন্যে একই কবিতার একাধিক তর্জমা যেমন স্বভাবসিদ্ধ, তেমনই একই অনুবাদকের চোখে তা চিরদিন এক রকম দেখায় না। অন্ততপক্ষে পরবর্তী অনুবাদসমূহের বর্তমান সংস্করণে প্রথম খসড়ার এক বর্ণও অবশিষ্ট নেই ; এবং বারংবার পরিবর্তনের পরেও কোনওটা মূলের ত্রিসীমানাতে পৌঁছতে পারেনি বটে, তবু এগুলো যে-মহাকবিদের প্রতিধ্বনি, তাঁদের সঙ্গে আমি নিরন্তর সংশোধনের ফলেই একলব্যের সম্পর্ক পাতিয়েছি।

উদাহরণত উল্লেখযোগ্য শেক্‌স্‌পীয়র থেকে অনূদিত সনেট্‌গুচ্ছ ; এবং একই

কথা হাইনে-র সম্বন্ধেও সত্য। বিশ-বাইশ বছর আগে যখন এঁদের প্রতি প্রথম মন দিই, তখন কলম বেশ দ্রুত চললেও, ইংরেজী বা জার্মান দশ অক্ষরে আঠারো অক্ষরের বাংলা লাইন ভরানো এত শক্ত লেগেছিল যে কেবল পাদ-পূরণের গরজে সর্বনাম ও ক্রিয়াপদের সাধু রূপ গ্রহণ ও বর্জন, তথা আরও অনেক সুবিধাবাদী প্রকরণ, এড়িয়ে যেতে পারিনি; এবং তৎসত্ত্বেও যেখানে মাত্রাগণনায় কম পড়েছিল, সেখানে অগত্যা যে-পুনরুক্তি বা বিশেষণবাহুল্যের শরণ নিয়েছিলুম, তাতে ওই কবিযুগলের মতিগতি প্রকাশ পায়নি, ফুটে উঠেছিল তদানীন্তন বাংলা কাব্যের মুদ্রাদোষ। অবশ্য বর্তমান অনুবাদেও পূর্বসূরীদের স্বাক্ষর অস্পষ্ট; এবং এই অসিদ্ধির দায় আমারই নয়, প্রাগুক্ত ভাষাত্রয়ের অনুচিকীর্ষা বাংলার ধর্ম-বিরুদ্ধও বটে। তথাচ কুড়ি বৎসরে গ্রন্থভুক্ত পদকর্তাদের বিষয়ে আমি যে-অভিজ্ঞতা জমিয়েছি, তা হয়তো এখানে অপেক্ষাকৃত সুপ্রকট; এবং সেই জন্যে, পরবর্তী পদ্য আমার লেখা হিসাবেই বিচার্য জেনেও, প্রত্যেক রচনার নিচে আদিকবির নাম আর বইয়ের শেষে মূলের আদ্য পঙ্‌ক্তি লিপিবদ্ধ করেছি। তালিকা থেকে বাদ গিয়েছে শুধু তিনটি কবিতা; এবং যে-পুস্তক-তিনখানায় হিউ মেনাই, সীগ্‌ফ্রিড্‌ সসুন্‌ ও হান্‌স্‌ কারোসা-র লেখা-কটি প্রথম দেখেছিলুম, সেগুলি যেহেতু দ্বিতীয় বার হাতে আসেনি, তাই উপস্থিত সংস্করণে মূলের চিহ্নমাত্র আছে কিনা সন্দেহ।

সত্য বলতে কি, যখন বিদেশী কবিতার অনুবাদ আরম্ভ করি, তখন আমার মনে কোনও মতের বালাই ছিল না, কর্মপ্রবর্তনা পেয়েছিলুম সাময়িক ভালো লাগা থেকে; এবং সে-মৌল সারল্য যে-পর্যন্ত ফুরয়নি, সে-পর্যন্ত যদিও সংশোধনের প্রয়োজন বুঝিনি, তবু সংস্কারকার্য এগিয়েছে ছন্দের শৈথিল্য, শব্দের অপপ্রয়োগ, বাক্যের জড়তা, চিত্রকল্পের অসংগতি ইত্যাদি মীমাংসা-নিরপেক্ষ ত্রুটি-বিচ্যুতির প্রতিবিধানে। এ-দিক দিয়ে দেখলেও, পরবর্তী রচনাবলী আমারই দোষ-গুণের নিদর্শন; এবং এমন ভাবা ভুল যে উদ্‌ভাবনাশক্তির অভাববশতই আমি এই পরকীয় লেখাগুলোর পিছনে এত সময় কাটাতে পেরেছি। কারণ উক্ত পরিশ্রম আসলে অপচয় নয়; এবং অনুবাদে বৈশিষ্ট্যের অবকাশ যতই থাক না কেন, তার সুপরিমিত সীমা যেহেতু স্বেচ্ছাচারের পরিপন্থী, তাই তার চর্চা স্বায়ত্তশাসনের নামান্তর। অন্ততপক্ষে আমাকে অনুবাদ পরীক্ষা-নিরীক্ষার যে-সুযোগ দিয়েছে, নিজের বক্তব্যে তার অর্ধেকও মেলেনি; এবং সেই জন্যে যে-উদ্যমের প্রস্তাবনা নিছক ভালো লাগায়, তার পরিণতি দুরূহের দারুণ আকর্ষণে।

পক্ষান্তরে অন্য কোনও ক্রমবিকাশের ইতিবৃত্ত এ-বইয়ে নেই ; এবং রকম রকম লেখার তর্জমায় রীতির ঐক্য তো অরক্ষণীয় বটেই, উপরন্তু, বিভিন্ন কালে অনূদিত ব'লে, একই কবির একাধিক কবিতার বৈষম্যও অপ্রতিকার্য্য। তবে অনুবাদক সর্বত্রই অদ্বিতীয় ; এবং এর ফলে বৈচিত্র্যের অনটন অনিবার্য জেনেও, কোথাও কোথাও কথ্য ও শিষ্ট ভাষার সন্ধি ঘটিয়েছি ভেকবদলের বৃথা চেষ্টায়।

কলকাতা ॥ ১১ জুলাই ১৯৫৪

. . . .

প্রদীপ

বনবীথি জনশূন্য নিশীথে,
শঙ্কিত শিখা বক্ষোদীপে,
সুদূরের বাঁশি ডাকে অভিসারে;
পিছনে কে চলে পা টিপে টিপে;
পথের দু পাশে ভূতের জটলা
স্মৃতি-বিস্মৃতি উজাড় করে;
চিত্রার্পিত পুরাণ কাহিনী
নক্ষত্রের ঘুণাক্ষরে;
চক্রী পবনে গূঢ় কানাকানি,
প্রতিবাদে জাগে প্রতিধ্বনি;
বনস্পতির নিবিড় রটায়
অবোধ হৃদয়ে কী আগমনী,
অনাদি কালের চির রহস্য
ত্রস্ত শরীরে বেপথু হানে,
সৃজননেমীর ঘূর্ণাবর্ত
ভ্রাম্যমাণেরে কেন্দ্রে টানে;
বিশ্বপিতার হাতে হাত রেখে,
শিশু ধরিত্রী আচম্বিতে
দোলা ছেড়ে ওঠে, টলমল পদে
ক্রান্তিবলয়ে টহল দিতে;
স্তম্ভিত কভু হয় না সে তবু,
যদিও পলক পড়ে না চোখে;
শুধু আনন্দবেদনার সাড়া
পায় মাঝে মাঝে মানসলোকে॥

নিশীথে বিজন বনবীথি যবে,
শঙ্কিত শিখা বক্ষোদীপে,
নিরুদ্দেশের যাত্রী তখন
আপনার ছবি নিরখে নীপে ;
প্রথম প্রাণের পরম প্রণবে
সার্থক তার মর্মবাণী ;
অভিসারিকার নূপুরে সে-স্বর,
সে-তালে দোদুল অরণ্যানি ;
অগ্নিগর্ভ গুল্মে আবার
পুরাণপুরুষ আবির্ভূত ;
কাণ্ডে কাণ্ডে ধরা পড়ে যূপ
আত্মবলির মন্ত্র-পূত ;
যুগান্তরের সঞ্চিত খেদ
নিবেদন করে মৌন তারে ;
মৃত্যুদণ্ডে নতশির যীশু
তারই অগ্রিম কপটাচারে ;
দর্শক আর দৃশ্যের দ্বিধা
ঘুচে যায় তার সংগোপনে ;
থাকে না প্রভেদ শ্রুতিতে শ্রোতাতে,
প্রবর্তকে ও প্রবর্তনে ;
প্রেমেও যেহেতু নিষ্কাম, তাই
নির্বিকার সে দুঃখে, সুখে ;
আত্মীয়-পর সরূপ যমজ,
পক্ষপাতের আপদ চুকে ;
নৈশ পাখীর স্বগত কূজনে
পূরে আরব্ধ কাব্যকলি ;
জানে সে কোথায় মাধুরী জমায়
অন্ধকারের অতলে অলি ;
চটকের চ্যুতি দেখে সে যেমন,
তেমনই মুগ্ধ উল্কাপাতে ;

ভাস্বর বনবীথিকা যখন
দীপ্রহৃদয়, নিভৃত রাতে ॥

দূর থেকে দূরে যায় সে একাকী,
নিঃস্ব, অথচ পৃথিবীপতি ;
অদ্বিতীয় সে অনুকম্পায়,
ত্রিভুবনে তার অবাধ গতি ;
মন্দাকিনীর অমৃতশীকর
থেকে থেকে তার মাথায় ঝরে ;
অধরার বরমালা গলায়,
সৃষ্টির চাবি মুক্ত করে,
সে আসে যেখানে বন্দী অরূপ
যক্ষজাগর পাতালে কাঁদে,
পাবাণে বনের নৈশ নিবালা
বক্ষোদীপের আশীর্বাদে ॥

– হিউ মেনাই

আদি রচনা : ১৮ অগস্ট ১৯৩১
পরিমার্জনা : ২৬ জুলাই ১৯৭৩

মাধুরী

শূন্য মাঠে সূর্যোদয়, গিরিশৃঙ্গে সূর্যাস্ত দেখেছি,
গম্ভীর সৌন্দর্যে শান্ত সনাতন গায়ত্রীর মতো ;
মাধবের সমাগমে অতসীর পরাগ মেখেছি ,
প্রত্যক্ষ করেছি তৃণ নব জলধারায় উদ্‌গত ॥

ফুলের খেয়াল আর সমুদ্রের ধ্রুপদ শুনেছি ;
পাল-তোলা তরী থেকে তাকিয়েছি কত দূর দেশে ;

কিন্তু সে-সমস্তে নয়, বিধাতার প্রসাদ শুণেছি
তার বাঁকা বিম্বাধরে, কণ্ঠস্বরে, দৃষ্টিপাতে, কেশে ॥

— জন্ মেস্‌ফীল্ড

আদি রচনা : ২৫ মার্চ ১৯৩২
পরিমার্জনা : ১৩ জুন ১৯৫৪

প্রদোষ

প্রদোষ : বিলীয়মান দূর বনরাজী,
কানে আসে কাকের কলহ,
শৈলমূলে কুয়াশা ও একাধিক দীপ ;
সর্বোপরি একমাত্র গ্রহ ;
চাষীরা ফসল মাড়ে ওই যে-খামারে,
থেমে গেছে ওখানে গুঞ্জন।
প্রদোষ : সখার সঙ্গে পরিচিত পথে
পুনরায় করি বিচরণ ॥

যারা মৃত, এক কালে প্রিয় ছিল যারা,
ভাবি সেই বন্ধুদের কথা :
মৃত আজ সে-সুন্দর বন্ধুরা, যদিও
ক্ষণস্থায়ী মৃত্যুর ক্ষমতা ;
তাদের সুন্দর দৃষ্টি অশুচি ধূলায়,
একে একে, নিবে গেছে কবে ;
সুন্দরহৃদয় তারা প্রচুর প্রসাদ
এনেছিল আমার শৈশবে ॥

— জন মেসফীলড

আদি রচনা : ২৫ মার্চ ১৯৩২
পরিমার্জনা : ১৬ জুন ১৯৫৪

স্বপ্নপ্রয়াণ

চেয়ে দেখেছিলে আমাকে নিবিড় সুখে,
বিচ্ছেদে আজ খেদ, ক্ষতি নেই তাই ;
যেখানেই থাকো, সেখানে, দীপ্র মুখে,
স্বপ্নকে দিও আঁধার শয়নে ঠাঁই ॥

ঘুমে বুজে আসে তোমার তরুণ আঁখি,
বিবশ রসনা মানে না তথাপি মানা ;
মিলনে যে-কটি কথা রয়ে গেল বাকী,
অবাধ হয়েছে বিরহে তাদের হানা ॥

ঘুমাও, ঘুমাও, আরামে ঘুমাও ভরে,
আমার আশিসে তোমার শিয়র পূত ;
সংবৃত তুমি অধুনা যে-গৌরবে,
আমি সে-রহসে নিয়ত আবির্ভূত ॥

কৃপণ গানের অমৃত সঞ্চয়নে
ব্যক্ত তোমার অনুপম পরিচিতি,
বাসা বেঁধেছিলে আজ যে-আলিঙ্গনে,
তাতে বার বার ফেরাবে তোমাকে স্মৃতি ॥

— সীগ্‌ফ্রিড্ সস্থন

আদি রচনা : ১৭ অগস্ট ১৯৩১
পরিমার্জনা : ৩০ জুন ১৯৪৮

কালতরী

গম্ভীর গিরির ভালে ক্ষীণ ইন্দ্রধনুর তিলক —
এ-পারে তুমি ও আমি — ব্যবধান দন্তোলিপ্রহত —
অবরোহী পাদদেশে ছত্রভঙ্গ শ্রমিকের দল,
অসিত স্থাণুর মতো, বদ্ধমূল সবুজ গোধূমে ॥

আমার ঘনিষ্ঠ তুমি, অনাবৃত চরণযুগল —
বিরঞ্জন বাতায়ন মাঝে মাঝে উদ্গীরণ করে

উলঙ্গ কাষ্ঠের ঘ্রাণ ; সে-উগ্র গন্ধের ফাঁকে ফাঁকে
ভেসে আসে চেতনায় উচ্ছ্বসিত কেশের সুরভি —
চটুল চপলা খসে আচম্বিতে নভস্তল থেকে।

হরিতাভ হিমবাহে দেখা দেয় মসীকৃষ্ণ তরী,
সন্নিহিত শর্বরীর অগ্রদূত যেন — গতি তার
কোন্ নিরুদ্দেশে ? — নিরুত্তর নির্লিপ্ত আকাশে হাঁকে
বজ্র নিরন্তর — ভয় নেই, তবু ভয় নেই ; আজ
এই উদ্যত দুর্যোগে, আমার সম্মুখে তুমি, আমি
আছি তোমার পাশেই — দিগম্বর বিদ্যুতের জ্বালা
নির্বাপিত পুনরায় চমকিত শূন্যের অগাধে —
নাস্তিসাক্ষী আমাদের দৃষ্টি বিনিময় — চরাচরে
অনাত্মীয় আর যা সমস্ত কিছু : মগ্ন কালতরী ॥

— ডি-এইচ্ লরেন্স্

আদি রচনা : ১৭ অগস্ট ১৯৩১
পরিমার্জনা : ২৮ জুলাই ১৯৫৩

উত্তর

"চাঁদ কী রকম ?" শুধালে কেউ, বোলো,
"এমনইটি ঠিক," দাঁড়িয়ে ছাদের 'পরে।
দেখিও মুখের দীপ্র সমারোহ,
"সূর্য কেমন ?" — প্রশ্ন যদি করে।
জানতে যে চায় কিসের গুণে যীশু
প্রাণ পুনরায় জাগিয়েছিল শবে,
তার কপাল ও আমার অধর ছুঁয়ো
চুম্বনে -- সব সহজ, সরল হবে ॥

— সি-ফীল্ড্-কৃত জালালুদ্দীন রুমি-র ইংরেজী অনুবাদ

আদি রচনা : ১৫ ফেব্রুআরি ১৯৩১
পরিমার্জনা : ১০ অক্টোবর ১৯৫৩

পুত্রেষ্টি

তোমার সদ্‌গুণে যদি ভ'রে ওঠে আমার কবিতা,
তবে তার বস্তুনিষ্ঠা মেনে নেবে কে আগামী কালে ?
অথচ, ঈশ্বর সাক্ষী, এ-প্রসঙ্গে যা লিখি, তা বৃথা ;
তোমার বিভূতি প্রায় অদৃশ্য এ-চৈত্যের আড়ালে।
সামর্থ্যে কুলাত যদি ও-চোখের সৌন্দর্য-বর্ণনা,
অথবা কীর্তনসাধ্য হত যদি তোমার প্রসাদ,
তাহলে রটাত লোকে এ কেবলই কপোলকল্পনা :
কে কবে পেয়েছে মর্ত্যে অমৃতের সাক্ষাৎ সংবাদ ?
আমার রচনা তাই ভবিষ্যতে বিদ্রূপই কুড়াবে,
সেই বৃদ্ধদের মতো, হ্রস্বসত্য, দীর্ঘজিহ্বা যারা ;
কবির উচ্ছ্বাস ব'লে, কনিষ্ঠেরা তোমারে উড়াবে,
ভাবিবে তোমার প্রাপ্য প্রশস্তির প্রচলিত ধারা।
কিন্তু যদি সে-সময়ে থাকে তব পুত্র উপস্থিত,
তোমারে দ্বিজত্ব দিবে তবে সে ও আমার সংগীত ॥

— উইলিয়ম্ শেক্‌স্‌পীয়র

আদি রচনা : ২৫ জানুআরি ১৯৩৪
পরিমার্জনা : ৪ এপ্রিল ১৯৫৪

ফাল্গুনী

বসন্তদিনের সনে করিব কি তোমার তুলনা ?
তুমি আরও কমনীয়, আরও স্নিগ্ধ, নম্র, সুকুমার :
কালবৈশাখীতে টুটে মাধবের বিকচ কল্পনা,
ঋতুরাজ ক্ষীণপ্রাণ, অপ্রতিষ্ঠ যৌবরাজ্য তার ;
অলোকের বিলোচন কখনও বা জ্বলে রুদ্র তাপে,
কখনও সন্নত বাষ্পে হিরণ্ময় অতিশয় ম্লান ;
প্রাকৃত বিকারে, কিংবা নিয়তির গূঢ় অভিশাপে,
অসংবৃত অধঃপাতে সুন্দরের অমোঘ প্রস্থান।

তোমার মাধুরী কিন্তু কোনও কালে হবে না নিঃশেষ :
অজর ফাল্গুনী তুমি, অনবদ্য রূপের আশ্রয় ;
মানে না প্রগতি তব মরণের প্রগল্‌ভ নির্দেশ,
অমৃতের অধিকারী যেহেতু এ-পঙ্‌ক্তিকতিপয় ।
মানুষ নিঃশ্বাস নেবে, চোখ মেলে তাকাবে যাবৎ,
আমার কাব্যের সঙ্গে তুমি রবে জীবিত তাবৎ ॥

— উইলিয়ম্‌ শেক্‌স্‌পীয়র

আদি রচনা : ২১ জানুআরি ১৯৩৪
পরিমার্জনা : ১৭ জানুআরি ১৯৫২

নিত্য সাক্ষী

ওরে সর্বভুক কাল, খর্ব কর সিংহের নখর ;
ধরার জঠর ভরা তারই যত স্বরূপ সন্তানে ;
উপাড়ি ব্যাঘ্রের দন্ত, হান তার জিঘাংসা প্রখর ;
অচিরে মরুক ডুবে রক্তবীজ নিজ রক্তবানে ।
যা তুই, উচ্চল কাল, ইচ্ছামতো ছড়া গে জগতে
সুসময়, দুঃসময় নির্বিচার ঋতুচক্র থেকে ;
মাধুরীর অপমান হয় যদি, হোক পথে পথে,
আমার বারণ শুধু একটি পাপের অতিরেকে :
পুরাতন লেখনীতে কোনও দিন চাসনে অঙ্কিতে
আমার প্রিয়ার ভাল প্রহরের কুটিল রেখায়,
তোর পঙ্কস্রোত যেন সে পারায় ময়ূরপঙ্খীতে ;
সৌন্দর্যের সাক্ষ্য ব'লে, নিত্য যেন প্রতিষ্ঠা সে পায় ।
না, তোরে সাধি না, কাল ; দেখি তোর ক্ষমতা কেমন :
আমার কবিতা দিবে প্রেয়সীরে অনন্ত যৌবন ॥

— উইলিয়ম্‌ শেক্‌স্‌পীয়র

আদি রচনা : ২৫ জানুআরি ১৯৩৪
পরিমার্জনা : ১৬ জানুআরি ১৯৫২

মিতভাষী

সেই কবিদের মতো ক্ষিপ্র নয় আমার কল্পনা,
চতুরার অঙ্গরাগে পরাশ্রীর স্বপ্ন যারা দেখে,
অতিমর্ত্য উপাদানে রচে যারা ভাকের গহনা,
সৌন্দর্যের প্রতিযোগে নষ্ট করে স্বার্থ একে একে,
ধুলার ধরায় যারা কোনও কালে নয় বদ্ধমূল,
পেড়ে আনে জ্যোতিষ্কেরে, মন্থে যারা সিন্ধু মণিময়,
অম্লান যাদের মাল্যে ফাল্গুনের আশুক্লান্ত ফুল,
বিজড়িত বাহুপ্রান্তে নীলকান্ত বায়ুর বলয়।
প্রেমে সত্যসন্ধ আমি, অপলাপে ফুরাব না মসী,
মানো মোর নিবেদন—অন্য কোনও মনুষ্যদুহিতা
আমার প্রিয়ার চেয়ে নয় বটে অধিক রূপসী,
তথাচ রুচিরতর অমরার হৈম দীপান্বিতা।
প্রবাদবিলাসী যারা অতিকথা তাদেরই মানায়:
আমি তো পসারী নই, গুণগানে আমার কি দায়?

—উইলিয়ম্ শেক্স্পীয়র

আদি রচনা: ২৬ জানুআরি ১৯৩৪
পরিমার্জনা: ২৬ জানুআরি ১৯৫২

বিনিময়

মুকুরে নেহারি ছায়া করিব না বার্ধক্যস্বীকার,
সমানবয়সী রবে যত দিন তুমি ও যৌবন;
হেরিব কালের লিপি কিন্তু যবে কপালে তোমার,
তখন মানিব সাধ্য মরণেই জীবনশোধন।
ঢেকে আছে তোমারে যে-সৌন্দর্যের দিব্য প্রাবরণী,
সে আমারই বাসসজ্জা; বিনিময়ে আমার হৃদয়
যেমন তোমাতে ন্যস্ত, তুমি স্থিত আমাতে তেমনই:
তোমার বার্ধক্য বিনা জরা নেই আমারও নিশ্চয়।

থেকো সদা সাবধান অতএব আমার মঙ্গলে,
আমিও তোমার হিতে আপনারে পালিব নিয়ত,
বিপদে তোমার আত্মা রক্ষা পাবে আমার অঞ্চলে,
সতর্ক ধাত্রীর হাতে সমর্পিত শিশুদের মতো।
আমার হৃদয় যদি মরে, তবু পেও না প্রয়াস
ফিরে নিতে সে-হৃদয় যার স্বত্বে আমি অবিনাশ॥

—উইলিয়ম্ শেক্‌স্‌পীয়র

আদি রচনা : ২৬ জানুআরি ১৯৩৪
পরিমার্জনা : ৫ এপ্রিল ১৯৫৪

শান্তিনিকেতন

বিশ্রব্ধ নিদ্রার লোভে ত্বরা লই আশ্রয় শয়নে,
শ্রান্ত অঙ্গ-সমুদয় পথকষ্ট পাসরিতে চায় ;
কিন্তু চিত্ত অচিরাৎ বাহিরায় বিদেহ ভ্রমণে,
শরীরের কর্মচ্যুতি মানসের কর্তব্য বাড়ায়।
তখন আমার চিন্তা, পরিহরি সুদূর প্রবাস,
দুর্গম তীর্থের পথে নিরন্তর সন্ধানে তোমারে ;
ভারানত নেত্র, তবু নেই তাতে তন্দ্রার আভাস,
আজন্ম অন্ধের মতো, অনিমেষে তাকাই আঁধারে।
শুধু সে-বীভৎস অমা একেবারে নিরালোক নয়,
জ্বলে, মণিদীপসম, তার কেন্দ্রে ছায়ামূর্তি তব ;
হানে সে-ভাস্বর রুচি নিশীথের নিবিড় সংশয়,
রূপ দেয় তমিস্রারে, জরতীরে করে অভিনব।
দিবা কাটে কায়ক্লেশে, বীত নিশা মনস্তাপে তাই :
তত দিন শান্তি নাই, যত দিন তোমারে না পাই॥

—উইলিয়ম্ শেক্‌স্‌পীয়র

আদি রচনা : ২৬ জানুআরি ১৯৩৪
পরিমার্জনা : ২১ জানুআরি ১৯৫২

দুর্দিনের বন্ধু

ভাগ্যের ভ্রূভঙ্গে আর মানুষের তিরস্কারে জ্ব'লে,
অপাঙ্‌ক্তেয় আত্মা যবে নির্বাসনে করে পরিতাপ :
যদিও বধির বিধি, তবু শূন্য ভরে উচ্চ রোলে ;
নিজের দরদী নিজে, অদৃষ্টেরে দেয় অভিশাপ ;
যখন মাৎসর্য জাগে অপরের আতিশয্য দেখে,
সমান সৌষ্ঠব যাচি, যাচি তুল্য বান্ধবমণ্ডলী ;
যা কিছু আজন্ম প্রিয়, সে-সমস্ত দূরে ঠেলে রেখে,
পরের সুযোগ সাধি, হতে চাই পরবলে বলী ;
সে-ধিক্কৃত দুঃসময়ে কিন্তু যদি দুঃস্থ চিন্তা মম
পায়, বন্ধু, দৈবক্রমে, লক্ষ্য-রূপে বারেক তোমায়,
তবে চিত্ত আচম্বিতে, নিশান্তের ভরদ্বাজ-সম,
মৃন্ময় কুলায় ছেড়ে, স্বর্গদ্বারে মাঙ্গলিক গায়।
তোমার প্রেমের স্মৃতি মাধুর্যের উৎস অফুরান ;
সে-ঋদ্ধির পাশে তুচ্ছ চক্রবর্তী রাজার সম্মান ॥

— উইলিয়ম্‌ শেক্‌সপীয়র

আদি রচনা : ২৭ জানুআরি ১৯৩৪
পরিমার্জনা : ১৬ জানুআরি ১৯৫২

সান্ত্বনা

যেমনই বিক্ষিপ্ত চিত্ত মৌন হয় মাধুর্যের ধ্যানে,
দণ্ডসত্রে তৎক্ষণাৎ ডেকে আনে অতীতের স্মৃতি :
ফেলি নব দীর্ঘশ্বাস দুর্লভের প্রত্ন উপাখ্যানে ;
নষ্ট সময়ের লাগি হাহুতাশ করি যথারীতি ;
যে-অমূল্য সুহৃদেরা অন্তর্হিত অব্যয় নির্বাণে,
তাদের উদ্দেশে জমে অশ্রুকণা অনভ্যস্ত চোখে ;
ঘুচে গেছে যে-যাতনা প্রাক্তন প্রেমের অবসানে,
অদৃশ্য যে-অপচয়, কাঁদি সেই সংক্রান্তির শোকে ;

অনির্দিষ্ট অভিযোগ পীড়া দেয় আমারে আবার ;
গণি, অপমানাসম, একে একে যত দৈন্যবোধ ;
পূর্ব পরিতাপ জুড়ে, জের টানি দুঃখতালিকায় ;
যে-ঋণ চুকেছে, চাই পুনরায় তার পরিশোধ।
কিন্তু যদি দৈবক্রমে মনে পড়ে তখন তোমায়,
তবে, বন্ধু, কষ্ট কাটে, সব ক্ষতি লাভে লয় পায়।

– উইলিয়ম্ শেক্সপীয়র

আদি রচনা : ২৭ জানুয়ারি ১৯৩৪
পরিমার্জনা : ১০ জানুয়ারি ১৯৫২

উত্তরাধিকারী

তোমার মহার্ঘ বক্ষে বর্তমান তাদের হৃদয়,
যাদের সাড়া না পেয়ে, মৃত ব'লে হয়েছিল মনে,
ভস্মীভূত বান্ধবেরা ও-রাজত্বে নিয়েছে আশ্রয় ;
সেথা যুবরাজ প্রেম, পরিবৃত প্রিয় পরিজনে।
ফেলেছে আমার কাছে যে-পবিত্র অশ্রুর প্রণামী
প্রণয়ের পুরোহিত গতাসুর প্রতিনিধি-রূপে,
সেই অপহৃতে দান বৃথা নয় জানি আজ আমি,
সমস্ত তর্পণবারি সন্নিবিষ্ট ওই পুণ্য কূপে।
তুমি সে-উৎকীর্ণ চৈত্য অনঙ্গের বিভূতি যেখানে
সংরক্ষিত চিরতরে সমুদয় বৈজয়ন্তী-সহ ;
অনুপূর্ব দয়িতেরা রেখে গেছে স্বাক্ষর সেখানে ;
সংগত তোমার ঐক্যে যত খণ্ড স্বার্থের কলহ।
তাদের অভীষ্ট মূর্তি নিরন্তর তোমাতে নেহারি :
আমার সকল তুমি, সর্বস্বের উত্তরাধিকারী।

– উইলিয়ম্ শেক্সপীয়র

আদি রচনা : ২৮ জানুয়ারি ১৯৩৪
পরিমার্জনা : ২২ জানুয়ারি ১৯৫২

সৌর ধর্ম

দেখেছি অনেক বার স্বেচ্ছাচারী বালার্ক বিতরে
রাজকীয় অনুগ্রহ অনুগত পর্বতের কূটে,
সুবর্ণ চুম্বনে তার শস্পশ্যাম প্রান্তর শিহরে,
নদীর পাণ্ডুর জল রসায়নে হৈম হয়ে উঠে,
আবার মুহূর্তমধ্যে নীচ মেঘ পায় অনুমতি
সে-স্বর্গীয় মুখচ্ছবি আবরিতে কলুষকালিতে ;
পশ্চিমের নিরুদ্দেশে দিনমণি ধায় গূঢ়গতি,
ধরারে বিধবা ক'রে, অপমানে আত্মবলি দিতে।
মোর ভাগ্যসবিতাও এক দিন উষার উদ্যোগে
সর্বজিৎ আশীর্বাদ ঢেলেছিল দীনের মস্তকে ;
কিন্তু দণ্ড-দুই মাত্র সে-প্রসাদ এসেছিল ভোগে,
সমস্ত গৌরব আজ লুপ্ত ঘনঘটার স্তবকে।
তথাপি আমার প্রেম অপারগ অবজ্ঞিতে তারে :
কলঙ্ক সূর্যের ধর্ম, কি আকাশে, কি মর্ত্যসংসারে ॥

—উইলিয়ম্ শেক্‌স্‌পীয়র

আদি রচনা : ২৪ জানুআরি ১৯২৪
পরিমার্জনা : ৩১ মার্চ ১৯৫৪ ?

দুঃসময়

উদার, উদ্দীপ্ত দিন তুমিই তো দেবে বলেছিলে,
উত্তরীয়ব্যতিরেকে এনেছিলে রিক্ত পথে ডেকে।
কুৎসিত দুর্যোগে আজ কেন তবে আমারে ঘেরিলে,
জঘন্য জলদজালে কেন রাখো বরাভয় ঢেকে ?
এখনও, বিদারি বাষ্প, কদাচিৎ মুখে চাও বটে,
ঝঞ্ঝাহত ভাল হতে মুছে নাও বাদলের কণা ;
সকলই বিফল তবু : সে-স্নেহের অখ্যাতিই রটে,
যার গুণে ক্ষত সারে, কিন্তু বাড়ে ক্ষতের লাঞ্ছনা।

তোমার লজ্জায় নেই আমার শোকের প্রতিকার ;
যদিচ সন্তপ্ত তুমি, তৎসত্ত্বেও সর্বস্বান্ত আমি :
ঘাতকের সান্ত্বনায় সহনীয় হয় না সংহার ;
বঞ্চিতের মর্মপীড়া জানে শুধু একা অন্তর্যামী।
তাহলেও ও-প্রেমাশ্রু মুক্তাসম দুর্মূল্য, দুর্লভ,
ওরে পেয়ে ভুলে যাই যত তব অপরাধ, সব ॥

—উইলিয়ম্ শেক্স্পীয়র

আদি রচনা : ১৯ জানুয়ারি ১৯৩৪
পরিমার্জনা : ১০ জানুয়ারি ১৯৫২

নির্বিকার

উপলসংকুল তটে ধায় যথা চলোর্মি সতত,
আমাদের পরমায়ু ছুটে তথা সমাপ্তির পানে :
দিনক্ষণপরম্পরা স্থানপরিবর্তনে নিরত,
ক্রমান্বয় উপক্রম প্রত্যেকেরে অগ্রে টেনে আনে ;
উষার কনকচ্ছটা উষসীরে মুকুটিত করে,
সে-স্বরাট্ সমারোহে নিত্য নামে কুটিল আঁধার ;
একদা স্বহস্তে কাল যে-দুর্লভ ঐশ্বর্য বিতরে,
নিজেই ফিরায়ে নেয় আবার সে-উত্তরাধিকার ;
যৌবনের উচ্ছ্বাসেরে হানে সদা কালের ত্রিশূল,
আঁকে সমান্তর রেখা সুন্দরের উন্নত ললাটে ;
তপস্যার উপলব্ধি কালান্তরে মারাত্মক ভুল,
মিলে না এমন মাঠ কাল যার ফসল না কাটে।
তথাপি তোমার স্তুতি মুদ্রাঙ্কিত মোর কবিতায়,
কালের কবল-মুক্ত দুরাশার কীর্তিস্তম্ভ-প্রায় ॥

— উইলিয়ম্ শেক্স্পীয়র

আদি রচনা : ২৭ জানুয়ারি ১৯৩৪
পরিমার্জনা : ১৬ জানুয়ারি ১৯৫২

গুপ্ত প্রেম

আমার মৃত্যুর দিনে যত ক্ষণ রোষরুক্ষ স্বরে
রটাবে বিরস ঘণ্টা, পরিহরি ঘৃণ্য নরলোক,
প্রবিষ্ট হয়েছি আমি ঘৃণ্যতর কীটের কোটরে,
চাও তো, আমার জন্য তত ক্ষণ কোরো তুমি শোক।
না, তখন এ-কবিতা দৃষ্টিপথে দৈবাৎ এলেও,
এ যে কার হস্তাক্ষর, স্মরণে তা রেখো না, কারণ
তোমারে এমনই আমি ভালোবাসি যে বিস্মৃতি শ্রেয়,
ভবিষ্যের সর্বনাশ সাধে যদি ভূতের মারণ।
আমার মিনতি মেনো — মিশে যাব মৃত্তিকায় যবে,
বর্তমান পদাবলী দেখো যদি তুমি সে-সময়,
তাহলে আমার নাম এমনকি জোপো না নীরবে;
এ-প্রাণের সঙ্গে সঙ্গে ক্ষয় যেন তোমার প্রণয়।
নচেৎ তোমার খেদে খুঁজে পাবে অভিজ্ঞ সংসার
বিদ্রূপের যে-সুযোগ, নিমিত্তের ভাগী আমি তার॥

— উইলিয়ম্ শেক্স্‌পীয়র

আদি রচনা : ২৩ জানুআরি ১৯৩৪
পরিমার্জনা : ৩১ মার্চ ১৯৫৪

পূরবী

যে-ঋতু আমার মাঝে দেখো তুমি, তার নাম শীত,
পীত পত্র-কতিপয় কাঁপে যবে হিমাহত শাখে,
যখন বিধ্বস্ত কুঞ্জে থেমে যায় বিহঙ্গসংগীত,
মূর্তিপরিগ্রহ ক'রে, সর্বনাশ মুহুর্মুহু হাঁকে।
সূর্য অস্তাচলে গেলে, যে-দ্বিধার অস্পষ্ট আভাস,
রাঙায়ে পশ্চিম, মেশে অচিরাৎ নিবিড় আঁধারে,
সে-বিষাদে সমাকীর্ণ দেখো আজ মোর চিদাকাশ;
মরণের সহোদর নিশি জাগে সুষুপ্তির দ্বারে।

আমার হৃদয়কুণ্ডে দেখো যেই বহ্নি ম্রিয়মাণ,
সে শুধু চিতাবশেষ, কৈশোরের অশান্ত উৎসাহ ;
একদা যে-হবি তারে দিয়েছিল অপর্যাপ্ত প্রাণ,
তারই আতিশয্যে বুঝি অনিবার্য আজ অন্তর্দাহ।
এ-দুর্দশা দেখে, কিন্তু দ্রুত বাড়ে তোমার প্রণয় :
মানুষ তারেই চায়, যারে শীঘ্র ছেড়ে দিতে হয়॥

—উইলিয়ম্ শেক্স্পীয়র

আদি রচনা : ২৩ জানুয়ারি ১৯৩৪
পরিমার্জনা : ১৬ জানুয়ারি ১৯৫২

অবিনাশ

তথাপি নিশ্চিন্ত থাকো : উগ্রচণ্ড যমদূত যবে
আসিবে আমারে নিতে, শুনিবে না কারও উপরোধ,
তখনও এ-কবিতায় মোর স্বত্ব বিদ্যমান রবে,
এ-স্মৃতিমন্দির দিবে চির কাল তোমারে প্রবোধ।
এ-দিকে তাকালে পরে, খুঁজে পাবে বাণীর নিভৃতে
আমার তন্মাত্র তুমি, করেছি যা উৎসর্গ তোমারে :
ধূলিই ধূলির প্রাপ্য, তাই শুধু মিলিবে ধূলিতে ;
আমার একান্ত আত্মা গচ্ছিত তোমার অধিকারে।
যাবে যা মৃত্যুর গ্রাসে, নিতান্তই সে তো মলময়,
উচ্ছিষ্ট কঙ্কাল, তথা ক্রিমিদের উপজীব্য শব,
অধমের গুপ্ত অস্ত্রে অপৌরুষ তার পরাজয়,
মনে রাখিবার মতো নেই তার তিলার্ধ বৈভব।
আধার অপ্রতিগ্রাহ্য, আধেয়ই মহার্ঘ কেবল ;
বর্তমান ছন্দোবন্ধে সে-সম্পদ, জেনো, অবিচল॥

—উইলিয়ম্ শেক্স্পীয়র

আদি রচনা : ২৩ জানুয়ারি ১৯৩৪
পরিমার্জনা : ১৬ জানুয়ারি ১৯৫২

প্রাণবায়ু

তোমার সমাধিলিপি আমি লিখে যাই বা না যাই,
দেখো বা না দেখো তুমি ভূমিগর্ভে আমার বিপাক,
আমাদের সঙ্গে সঙ্গে এ-স্মৃতির তিরোধান নাই ;
যেটুকু অরক্ষণীয়, একা আমি তার অংশভাক ।
এক বার গত হলে, মৃত আমি পৃথিবীর কাছে ;
কিন্তু তুমি অতঃপর অমৃতের উত্তরাধিকারী :
আমার অনন্ত শয্যা অবজ্ঞার আনাচে-কানাচে ;
তোমার অক্ষয় চৈত্য মানুষের চক্ষে বলিহারি ।
আমার সম্ভ্রান্ত কাব্যে প্রতিষ্ঠিত কীর্তিস্তম্ভ তব ;
শিখিবে অনুজবৃন্দ জন্মে জন্মে সে-অনুশাসন ;
তোমার বন্দনা-পাঠে মুখরিবে জিহ্বা নব নব,
যখন একাদিক্রমে রুদ্ধশ্বাস শ্বাসজীবিগণ ।
তুমি রবে বর্তমান (এ-লেখনী হেন শক্তি ধরে)
মানুষের মুখে মুখে, প্রাণ যেথা অবাধে সঞ্চরে ॥

— উইলিয়ম্ শেক্স্পীয়র

আদি রচনা : ২৫ জানুআরি ১৯৩৪
পরিমার্জনা : ১৯ মার্চ ১৯৫৪

অনিবার্য

অন্তিমে অবার্য হলে, হানো ঘৃণা এখনই আমাকে,
ব্রহ্মাণ্ডের বৈপরীত্যে যে-সময়ে অকর্মণ্য আমি ;
নোয়াও আমার মাথা নৈমিত্তিক দৈবদুর্বিপাকে,
কুড়ায়ো না সর্বনাশে বাকী কানাকড়ির প্রণামী ।
এ-হৃদয় মুক্তি পাবে বর্তমান শোক থেকে যবে,
সে-দিন এসো না ফিরে বিতাড়িত দুঃখের পশ্চাতে ;
বিলম্বের বিড়ম্বনা ঘটায়ো না ধার্য পরাভবে,
ঝঞ্ঝাহত রাত্রি যেন ফুরায় না বৃষ্টিমগ্ন প্রাতে ।

যদি ছেড়ে যেতে চাও, পরিশেষে যেও না তাহলে,
পরম্পর উপসর্গে যে-দুর্যোগে আমি উপদ্রুত ;
কৃতান্তের বিনিয়োগ কোরো সূত্রধারের বদলে,
যাতে বুঝি প্রারম্ভেই নিয়তির অমোঘ আকূত।
তোমার বিয়োগ, জানি, জাগাবে যে-অপার নির্বেদ,
খেদ ব'লে গণ্য নয় তার পাশে উপস্থিত খেদ ॥

— উইলিয়ম্ শেকস্‌পীয়র

আদি রচনা : ২৩ জানুআরি ১৯৩৪
পরিমার্জনা : ১৮ মার্চ ১৯৫৪

কালযাত্রা

অজর আমার কাছে তুমি সদা, সুদর্শন সখা :
যে-সৌন্দর্যে শুভদৃষ্টি হয়েছিল আপাততন্ময়,
আজও তা তোমাতে দেখি ; অথচ বনশ্রী পলাতকা
ইতিমধ্যে তিন বার, মাধবের মদির সঞ্চয়
তিন বার হৃত শীতে, তিন বার ঋতুর বিকারে
হেমন্তের অনুগত বসন্তের শ্যাম সমারোহ,
সুগন্ধি ফাল্গুনত্রয় পরিণত জ্যৈষ্ঠের অঙ্গারে :
এখনও অক্ষুণ্ণ শুধু সদ্যোজাত তোমার সম্মোহ।
তবু, শঙ্কুপট্টসম, সুন্দরের ললাটফলকে
কালের কীলক, হায়, অগোচর চৌর্যে ঘূর্ণমান ;
হয়তো তোমার কান্তি ক্ষ'য়ে যায় পলকে পলকে,
আসক্তির আধিক্যেই প্রবঞ্চিত আমার নয়ান।
অজাতবার্ধক্য বন্ধু, তাই বলি অতীতপ্রত্যূষ
সে-যৌন মাধুর্য আজ, তুমি যার উত্তরপুরুষ ॥

—উইলিয়ম্ শেকস্‌পীয়র

আদি রচনা : ২৩ জানুআরি ১৯৩৩
পরিমার্জনা : ২১ মার্চ ১৯৫৪

অতিদৈব

আমার ভয়ার্ত বুদ্ধি, কিংবা সেই চিন্ময় পুরুষ,
যার স্বপ্নাবিষ্ট দৃষ্টি সমাহিত অনাগত কালে,
জানে না আমার প্রেম কী সত্যের গুণে নিরঙ্কুশ,
কেন তার পরমায়ু ন্যস্ত নয় ভাগ্যের খেয়ালে।
রাহুমুক্ত পূর্ণ চন্দ্র প্রত্যাগত অমৃতে আবার;
দুঃখবাদী গণকেরা উপহাস্য নিজেদের কাছে;
সংশয়ের নিপাতনে অব্যাহত প্রমার উদ্ধার;
যে-শান্তি আরব্ধ আজ, অনন্তের স্ফূর্তি তাতে আছে।
উপস্থিত সন্ধিলগ্ন; সুযোগের দিব্য রসায়নে
পুনরুজ্জীবিত প্রেম; মৃত্যু মোর পদানত দাস।
নির্বাক নির্বোধ যারা, অভিভূত তারাই মারণে;
এই অকিঞ্চন কাব্যে অপরাস্ত আমি, অবিনাশ।
সে-দিনও তোমার স্মৃতি প্রকীর্তিত রবে এ-সংগীতে,
রাজাদের জয়স্তম্ভ মিশে যাবে যে-দিন ধূলিতে॥

— উইলিয়ম্ শেক্স্পীয়র

আদি রচনা: ২৫ জানুআরি ১৯৩৪
পরিমার্জনা. ২২ জানুআরি ১৯৫২

কামরূপ

লজ্জাকর অপচয়ে চেতনার নিজস্ব বিনাশি,
ফুরায় কামের ক্রিয়া; অথচ সে যাবৎ অক্রিয়,
তাবৎ শপথভ্রষ্ট, মারাত্মক, শোণিতপিপাসী,
বর্বর, অমিত, রূঢ়, অবিশ্বাসী, ক্রূর, দূষণীয়।
সম্ভোগের চূড়ান্তে সে বিতৃষ্ণার বিষে পরাহত:
অন্যায় মৃগয়া তার, কিন্তু যেই করে লক্ষ্যভেদ,
অমনই ধিক্কার জাগে; গলগ্রহ বড়িশের মতো,
অপ্রকাশ আয়োজনে ঘটায় সে ক্ষিপ্তের নির্বেদ।

মত্ত তার অভিসার, মত্ত অধিকরণও তেমনই ;
চাওয়া, পাওয়া অপর্যাপ্ত ; খাওয়াতেও মাত্রা মানে না সে ;
অপ্রমাণ সুখাবহ, সপ্রমাণ মূর্তিমান শনি ;
বরাভয়ে অভ্যুদয়, শূন্যগর্ভ স্বপ্ন অন্ত্যকালে।
এ-সবই সকলে জানে ; কেন জ্ঞানী নেই তবু ভেবে,
স্বর্গাভিসন্ধিৎসু পথে নামে না যে বিখ্যাত রৌরবে ॥

— উইলিয়ম্‌ শেক্‌সপীয়র

আদি রচনা : ৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৪
পরিমার্জনা : ৩১ জানুয়ারি ১৯৫২

মৃন্ময়ী

কে বলে সূর্যের সঙ্গে তুলনীয় প্রিয়ার নয়ন ?
প্রবাল রক্তিম হলে, নাতিরক্ত তার ওষ্ঠাধর ,
তুষার ধবল বটে, পাংশুবর্ণ কিন্তু তার স্তন ;
কেশের বদলে ধরে মস্তকে সে তন্তুর কেশর।
স্ফূর্ত যে-কৌশেয় কান্তি শাদা, লাল, বিস্তর গোলাপে,
কান্তার কপোলতলে দুর্নিরীক্ষ্য তার প্রতিভাস ;
আমোদের আতিশয্য উদ্বায়ী যে-সুরভিকলাপে,
তার অন্যতম নয় প্রেয়সীর নিবিড় নিঃশ্বাস।
অবশ্য আমার কানে তার বাক্য নিত্য রমণীয়,
তৎসত্ত্বেও বুঝি আমি সমধিক মধুর সংগীত ;
দেবীদের গতিবিধি এ-জীবনে দেখিনি যদিও,
সে, মাটি মাড়িয়ে, চলে, জানি তবু এ-কথা নিশ্চিত।
অথচ ঈশ্বর সাক্ষী, যারা তার মিথ্যা উপমান,
সে শ্রেয় তাদের চেয়ে, মাত্রাজ্ঞানে আমার প্রমাণ ॥

— উইলিয়ম্‌ শেক্‌সপীয়র

(আদি রচনা ?) : ৩ এপ্রিল ১৯৫৪

জ্ঞানপাপী

প্রিয়ার শপথকারে শুনি যবে সত্য অস্ত্র প্রাণ,
তখন সে-অপলাপ মেনে নিই আমি জ্ঞাতসারে,
আমার অপরিণতি পায় যাতে পরোক্ষ প্রমাণ,
সে বোঝে অপটু আমি সংসারের কূট অনাচারে।
গত যে আমার দিন, জানি, তার অবিদিত নয় ;
তবু চাই যেহেতু সে যুবা ব'লে ভাবুক আমাকে,
সরল বিশ্বাসে তাই দিই তার মিথ্যার প্রশ্রয়,
এবং সহজ সত্য উভয়ত সংগোপিত থাকে :
কিন্তু কেন প্রিয়তমা অবিচার করে না স্বীকার ?
কেন আমি চেপে রাখি অতিক্রান্ত আমার যৌবন ?
প্রেম কি প্রকৃতপক্ষে সাধনীয় আস্থার বিকার ?
বয়স্কের ভালোবাসা ভালোবাসে না কি বর্ষাপন ?
অতএব দু জনেই স্তোকবাক্যে মজি ও মজাই,
লুকাতে নিজের দোষ মুক্ত কণ্ঠে তার গুণ গাই ॥

– উইলিয়ম শেকস্‌পীয়র

(আদি রচনা ?) : ৭ এপ্রিল ১৯৫৪

মৃত্যুঞ্জয়

হা, রে অকিঞ্চন আত্মা, পাতকের পার্থিব নির্ভর,
রাজদ্রোহী প্রধানেরা তোরে কেন চক্রান্তে ধাঁধায় ?
সর্বস্বান্ত অন্তঃপুরে শীর্ণ তুই, তথা দিগম্বর,
দুর্মূল্য রঙ্গাতিরেক বহিরঙ্গে কেন শোভা পায় ?
যে-ভগ্ন প্রাসাদে তোর বসবাস নিতান্ত অস্থায়ী,
এতাদৃশ অপব্যয় কেন তার সংস্কারসাধনে ?
বাহুল্যের দায়ভাগে থাকে যদি কিছু অনাদায়ী,
তবে তা বর্তাবে কীটে—দেহান্ত কি এরই সম্পাদনে ?

ভৃত্যের সম্বলে তোর প্রাণযাত্রা বরঞ্চ চলুক ;
অতঃপর তার হ্রাসে পুষ্ট হোক তোর উপচয় ;
মিটুক মর্ত্যের ক্ষুধা ; ঘনঘটা অশ্রুতে গলুক ;
কালের উদ্‌বৃত্ত বেচে, কর তুই নিত্যানন্দক্রয়।
মর্ত্যজীবী মৃত্যু তোর উপজীব্য হবে তাহলেই ;
এবং মৃত্যুর মৃত্যু যে ঘটাবে, তার মৃত্যু নেই ॥

— উইলিয়ম্ শেকস্পীয়র

আদি রচনা : ২৫ জানুয়ারি ১৯৩৪
পরিমার্জনা : ৩ এপ্রিল ১৯৭০

জার্মান

. . . .

জয়ন্তী

কিশবের শিখরাগ্রে, কণ্টকিত তুষারশয়নে,
জীবনের পরিবর্তে পেল যারা অনন্ত বিশ্রাম,
তাদের সমাধিচৈত্য এসো রচি প্রস্তরচয়নে,
এসো লিখি কীর্তিস্তম্ভে সে-অখ্যাত জনতার নাম।
করেনি আক্ষেপ তারা, তাকায়নি পূর্বে বা পশ্চাতে,
চায়নি তিলার্ধ ক্ষান্তি, মেনেছিল আজ্ঞা নিরুত্তরে ;
অভিষেকি বিদেশের অনুর্বর মাটি রক্তপাতে,
নির্বিশেষ প্রাণ তারা বিসর্জিল লুপ্তির বিবরে ॥

দিশাহারা আঁখি আজ : এ-ধ্বংসের শেষ কোথা, কবে ?
অন্ধকার ভবিতব্যে থেকো, বন্ধু, সদা সাবধান।
যদি দেখো মুমূর্ষুরে, বোলো তারে কানে কানে তবে
অন্তিম হিংসায় যেন কাড়ে না সে মৃত্যুর সম্মান,
বোলো শ্রদ্ধাসহকারে সে মোদের সবারই অগ্রণী,
বিস্মৃতির নিরুদ্দেশে আমরাও তার অনুচর।
অনন্তর জননীপারে বুনে রেখে শবপ্রাবরণী,
তুমিও পদাঙ্কে তার অকাতরে হয়ো অগ্রসর ॥

কিন্তু যদি ভাগ্যগুণে নরমেধ দেয় অব্যাহতি,
বাস্তুতে ফিরেও, তবু হারায়ো না আরামে চেতনা,
বিধাতা, তোমারে ডেকে, পান যেন তখনই প্রণতি,
ব্রাহ্মমুহূর্তের প্রতি অনীহা বা হেলা দেখায়ো না।
ভুলো না তোমার পথ দীর্ঘ, সমতলেও বন্ধুর,
অনিশ্চিত পরমায়ু, সিদ্ধি নেই কোনও সাধনায়,

উৎসব অভাবনীয়, অবকাশে উৎকণ্ঠা নিষ্ঠুর,
সতর্ক তোমার নিদ্রা শৈলচারী হরিণের প্রায়।

সত্যের নিরহংকারে তোমার অন্তর হোক শুচি :
মিথ্যার চক্রান্তে আজ বিশ্বময় মনুষ্য পাগল,
নির্বাণ হিরণ্যগর্ভ, নাস্তির অর্গল গেছে ঘুচি,
রাক্ষসের অত্যাচারে পুনর্বার আর্ত ভূমণ্ডল।
মোদের প্রান্তিরে ঘিরে, দুর্লক্ষণ চর্মচটী-সম,
চক্রবর্তী নৈরাশ্যের নিরাকৃত, নিত্য প্রদক্ষিণ ;
অন্ধ, অনপত্য, অস্থ, দুঃশাসন, দুর্মর, নির্মম,
শ্মশানের অধিষ্ঠাতা, শকুনি-সে পতত্রবিহীন।
তাই কি শিশুর মর্মে আজ আর পারে না পশিতে
পরম্পরাগত শ্রুতি, সার্বভৌম সুভাষিতাবলী :
তীর্থে তীর্থে দ্রোণকাক, ধূর্ত লোভ শাণিত দৃষ্টিতে,
উজাড়ি অনাথ বেদী, লুটে ভোগ, মজায় অঞ্জলি ?
গত বুঝি শুভ লগ্ন ; অনর্থক ষোড়শোপচার ;
জীর্ণ দেউলের চূড়া ভেঙে পড়ে আশ্রিতের 'পরে ;
লঙ্কাকাণ্ডে অবসিত সেতুবন্ধ, উদ্বেল পাথার,
অভেদ্য অলাতচক্র ; স্তব-স্তুতি শূন্যে কেঁদে মরে।
নির্বাসিত মানবাত্মা, ত্রিভুবনে নেই তার স্থান ;
শৈবালিত গুহাদ্বার, অন্তর্যামী নির্জনে নিহিত ;
মানস তুষারাবৃত, জড়ীভূত মৎস্যের সমান
অসাড় উৎকাঙ্ক্ষা, আশা চৈতন্যের তুহিনে পিহিত।

কিন্তু, বন্ধু, কোনও কালে ফিরে যেতে পেলে নিজ বাসে,
প্রত্যাশারে মুক্ত রেখো হতাশার অবসাদ থেকে ;
বিক্ষিপ্ত হয় না চিত্ত যেন স্বার্থস্বপ্নের বিলাসে ;
দিও বর্তমান হানি নিষ্কলঙ্ক বিস্মরণে ঢেকে।
সংকল্পিত শৃঙ্খলায় আপনারে ঘিরো অহরহ ;
হৃদয়ে হোমের অগ্নি জ্বেলো বিশ্বদেবের উদ্দেশে ;

কোরো তার পরিক্রমা তিন বার অন্তত প্রত্যহ;
তার পরে, ইচ্ছা হলে, প্রেয়সীরে বেঁধো কণ্ঠাশ্লেষে॥

ধন্য সে, কালের ব্যাপ্তি তপোবনে লঙ্ঘিতে যে পারে;
অনিষ্টের প্রমুখাৎ নিয়ত সে ইষ্টমন্ত্র শোনে;
পারায় সে মন্বন্তর অজানার রুদ্র অভিসারে;
বিতরে সে আপ্ত সুধা সংসারের দুঃস্থ কোণে কোণে।
পৃথিবীর পিতা ওই জন্মমৃত্যুব্যতিক্রান্ত রবি,
ওর জ্যোতি, ওর তেজ আমাদের গভীরে বিরাজে;
বিগত স্নেহের স্মৃতি, উপস্থিত করুণার ছবি
ফুটে ওঠে নিরন্তর অনুপূর্ব মুহূর্তের মাঝে।
তারায় তারায় কাঁপে আমাদের চিরন্তন প্রাণ,
সপ্ত সিন্ধু বিচঞ্চল সে-প্রাণের প্রচ্ছন্ন পরশে,
সে-প্রাণের উপাদানে নির্মিত স্বয়ং ভগবান,
তারই গূঢ় অভিপ্রায় পরিণামী সৃষ্টির হরষে॥

চিরসুন্দরের দূত, নামো তবে গিরিশৃঙ্গ হতে,
প্রবঞ্চক প্রেতাত্মা ও মেঘমুগ্ধ শ্যেন পরিহরি;
প্রকাশো প্রেমের দীপ্তি অন্ধতমঃপ্রবিষ্ট জগতে;
আত্মীয়ের প্রতীক্ষায় বরাভয় উঠুক গুঞ্জরি।
স্থগিত সৎকার যার, অসম্ভব তার উজ্জীবন;
ফিরে চাও, ক্ষেমংকর, লগ্ন ভ্রষ্ট নয় একেবারে:
বিশ্বমানবের মূর্তি সহস্রধা, ধুলায় শয়ন;
নূতন বেদীর মূলে সযতনে উপ্ত করো তারে।
নহে সে অপরিচিত, যে-সত্যের প্রচারক তুমি;
ইতিপূর্বে বারংবার অগ্নিদীক্ষা পেয়েছে মানুষ:
আলো ও ছায়ার দ্বন্দ্বে সমাচ্ছন্ন যে-সীমান্তভূমি,
উভয়সংকটে সেথা দাও, দেখা দাও, নিরঙ্কুশ।
তোমার উদাত্ত মন্ত্র জড়ে শুদ্ধ চৈতন্য জাগায়;
তোমার দক্ষিণ মুখে স্ফূর্ত হয় অভিব্যক্তিবাদ;

তোমার আবেশে কারা অকস্মাৎ মোক্ষে মিশে যায় ;
তোমার আশিস্ আনে পরাভবে জয়ের প্রসাদ ।

বেষ্টিত যে চিরাচারে, নিমজ্জিত নিশ্চেষ্ট পাতালে,
কুড়ায়ে উচ্ছিষ্ট কণা, কাটে যার অনবৃত্ত দিন,
করো তারে আবিষ্কার আশুতোষ তন্দ্রার আড়ালে.
ধরো ওষ্ঠে সুধা-বিষ, হরো ভয়, হোক সে স্বাধীন ।
দাও, তারে শক্তি দাও : বসুধার বদ্ধ মুষ্টি খুলে,
সে যেন কাড়িতে পারে জীবনের পরম বৈভব ;
আপন দক্ষিণা নিতে কভু যেন যায় না সে ভুলে ,
রহে না গ্রহণে তার যেন কোনও লোভের সংস্রব ।
পাসরি ভাবনা, যেন মুক্ত হস্তে ঢালে সে আহুতি
প্রাথমিক উপচয় সনাতন যজ্ঞাগ্নির পুটে ;
থাকে না অব্যক্ত যেন অতিমর্ত্য আত্মার আকৃতি ,
অমৃতের দানসত্রে নিত্য যেন বিত্ত ভ'রে উঠে ॥

ধ্রুব পথিকৃৎ-সম, রেখে যেও উৎকীর্ণ নির্দেশ
অনুগের তরে, বন্ধু, বৃক্ষে, শৈলে, হিমে, বালুকায় ,
ঘটে যদি অপঘাত, অন্তঃকালে মৈত্রীর সন্দেশ
লিখো তবে সহচর বিহঙ্গের ধবল পাখায় ।
কিশবের শিখরাগ্রে কণ্টকিত তুষারশয়ন,
হত বীরেদের লাগি এসো সেথা কীর্তিস্তম্ভ রোপি ,
মাগেনি বিরতি যারা, বিনা বাক্যে বরেছে মরণ.
তাদের মহার্ঘ নাম এসো আজ শুচি মনে জপি ॥

এখনও শীতের ব্যাপ্তি রুমানির পর্বতে পর্বতে,
অথচ উন্মুক্ত নভে বসন্তের বিচিত্র আশ্বাস ;
জরাজর্জরিত ভূর্জ, কিন্তু চীর্ণ পরতে পরতে
প্রত্যাগত নবীনের রক্তাভ দামিনীবিলাস ।

উধাও ঝঞ্ঝার মুখে বৃন্তচ্যুত পল্লবের মতো,
আমরা তাড়িত আজ বার্তাহীন প্রান্তরে প্রান্তরে ;
জানি না ললাটলিপি, আছে কিনা কোথাও স্বাগত,
বর্তমান সর্বনাশে কিসের অঙ্কুর ধৈর্য ধরে ॥

শ্রদ্ধার নক্ষত্রপুঞ্জ জেলে যেও তবু অন্ধকারে,
অনাগত উন্মার্গেরা যার পানে চাবে অপলকে,
যার রশ্মি এক দিন, প্রলয়সিন্ধুর পরপারে,
প্রবেশিবে মানুষের ঘনীভূত হৃদয়গোলকে।
সে-দূরান্ত স্পর্শে যদি না-ও গলে আত্মার কৈলাস,
উত্তল দর্পণ থেকে বিচ্ছুরিবে বর্ণালী তথাপি ,
হয়তো মিলিবে তাতে নব আদিভূতের আভাস,
লক্ষ্য খুঁজে পাবে ধরা, বহু যুগ নিরুদ্দেশে যাপি ॥

গলিত শবের স্তূপে ভারাক্রান্ত কিশবের চূড়া,
দলিত বিজয়মাল্য, লৌহমল ভগ্ন তরবারে ;
পুনরায় মিষ্ট লাগে তাহলেও বিষতিক্ত সুরা,
রাখিবন্ধনের তিথি উপনীত বিশ্লিষ্ট সংসারে।
নিত্য বিশ্ববাসনার অব্যাহত অনুপ্রাণনায়
আবার উর্বর বুঝি ধরিত্রীর অনন্ত যৌবন ;
নূপুরনিক্কণ জাগে শৃঙ্খলের ক্লিষ্ট ঝঞ্জনায় ;
অমৃতসন্ধানী আত্মা ; আর বার অবার গগন।
স্বসমুখ কুরুক্ষেত্রে, রক্তবীজসম, আচম্বিতে
তরুণের মুক্তিসেনা ; বরাভয় মুদ্রাঙ্কিত ধ্বজে ,
পুরাতন প্রত্যাদেশ পরিণত অপূর্ব সংগীতে ;
অভেদ সাধ্যে ও সাধে ; আত্মসত্য অবতীর্ণ রজে ॥

—হান্‌স্ কারোসা

আদি রচনা : ২৯ জুলাই ১৯৩১
পরিমার্জনা : ১৯ জুলাই ১৯৪৩

গোধূলি

মাঝি-মাল্লার বৈকালী সভা :
আকাশ, বাতাস গোধূলি মাখে :
তার পাশে ব'সে, বাহিরে তাকাই,
যেখানে সিন্ধু অসীমে ডাকে ॥

জ্বলে একে একে দিশারী প্রদীপ,
আলোকমঞ্চ অভয়ে ভাসে ;
দূর দিগন্তে বিবাগী জাহাজ
এখনও দৃষ্টিগোচরে আসে ॥

আলোচনা হয় নাবিকজীবন :
তুফানে কী ক'রে নৌকা ডোবে ;
শূন্যে ও জলে ঘেরা কাণ্ডারী,
দ্বিধাটলমল খুশিতে, ক্ষোভে ॥

অভাবনীয়ের লীলানিকেতন
অবাচী, উদীচী, প্রতীচী, প্রাচী :
আচারে, বিচারে বিপরীত মতি,
মানবসমাজ সব্যসাচী ॥

স্রোতে প্রতিভাত লক্ষ মানিক,
মত্ত মলয় বকুলবনে,
গঙ্গার তীরে সৌম্য পুরুষ
সমাধিমগ্ন পদ্মাসনে ॥

ল্যাপ্‌দেশীয়েরা বামনের জাতি,
নোংরা, হাঁ বড়, চ্যাপ্টা মাথা,
আগুন পোহায়, মাছ সেঁকে খায়,
কথা কয় না তো, ঘোরায় জাঁতা ॥

যে যা বলে, সে তা কান পেতে শোনে,
তার পরে মুখ খোলে না আর ;
দেখা যায় না সে-বিবাগী জাহাজ,
বাহিরে গভীর অন্ধকার।

—হাইন্‌রিখ্‌ হাইনে

১০ মার্চ ১৯৫১

৷ তত্ত্বকথা

ডঙ্কা পিটে শঙ্কাবিসর্জন,
পসারিনীর সুলভ সোহাগ কাড়া,
সেই তো সকল উপদেশের সার,
বেদ-বেদান্তে নেই কিছু তার বাড়া।

হাতের সুখে ঢাকের কাঠি নেড়ে,
পাড়ায় পাড়ায় ঘুম ভাঙিয়ে যাওয়া—
গুণী-জ্ঞানী তার বেশী কী করে,
যথেষ্ট নয় ঢাকের পিছু ধাওয়া ?

যা বলেছেন শংকরাচার্য, তা
বরঞ্চ কম সার্থকতায়, দামে,
জন্মাবধি ঢাকের মতো বেজে,
শিখেছি এই সত্য পরিণামে।

—হাইন্‌রিখ্‌ হাইনে

আদি রচনা : ২৮ ডিসেম্বর ১৯৩১
পরিমার্জনা : ৪ জুলাই ১৯৫৪

মন্ত্রগুপ্তি

দীর্ঘশ্বাসে আমরা অনভ্যস্ত,
চক্ষে সাহারা, প্রচুর হাস্ত ওঠে,

ভুলেও কখনও হই না শশব্যস্ত,
বাস যদিও কালফণী মণিকোঠে।

হৃদয়শোণিতে স্নাত সে-মন্ত্রগুপ্তি,
মূক যাতনার অলাতচক্রে রুদ্ধ ;
প্রহত বুকের মুখরিত নিঃসুপ্তি
করে না কিন্তু রসনাকে উদ্বুদ্ধ।

সেই রহস্যে পিহিত জাতক, প্রাজ্ঞ ;
শিশু আর শব জানে তার সারমর্ম ;
তাদের শুধাও, আমি যা লুকাতে বাধা,
তার দ্বিরুক্তি বুঝি বা তাদেরই ধর্ম।

—হাইন্‌রিখ হাইনে

আদি রচনা : ২৮ ডিসেম্বর ১৯৩১
পরিমার্জনা : ১৯ মার্চ ১৯৪১

অধঃপাত

অনাচারে ডোবে নিসর্গসুন্দরী—
মানবধর্মে নিয়েছে কি সেও দীক্ষা ?
পশু, পাখী, কীট, ফল, ফুল, মঞ্জরী,
প্রাপ্ত সকলে অপলাপে লোকশিক্ষা।

বিশ্বাস করি কী ক'রে কুমুদী সতী ?
হাটে হাঁড়ি ভেঙে, রসরঙ্গে সে লিপ্ত ;
নটবর নবকার্তিক প্রজাপতি,
অবাক মাধবী চাটু চুম্বনে দীপ্ত।

ভীরু মাধবীও মনে মনে রঙ্গিলা ;
রতিপরিমলে নেই তার অনায়ত্তি ;
আপাতত যেন কুমারী লজ্জাশীলা,
আসলে সে সাধে মোহিনীর প্রতিপত্তি।

বুল্‌বুল গলা কাঁপায় যে-পালাগানে,
নেই তাতে উপলব্ধির নাম-গন্ধ ;
সন্দেহ হয় বাঁধা গতে মিড় টানে
অতিরঞ্জিত কাকুতির নির্বন্ধ ।

ক্রমে ম'রে আসে সত্য সর্ব ঘটে,
নিষ্ঠা বা তার দেখা পাওয়া আজ শক্ত ।
কুকুরের ল্যাজ যথারীতি নড়ে বটে,
কিন্তু জগতে নেই আর প্রভুভক্ত ॥

— হাইন্‌রিখ্‌ হাইনে

আদি রচনা : ২৯ ডিসেম্বর ১৯৩১
পরিমার্জনা : ২৮ ফেব্রুআরি ১৯৫১

মায়ার খেলা

সিদ্ধান্তের পক্ষপাতী যেহেতু আমি, তাই
ভাবো কি নই কুলিশে কৃতবিদ্য ?
ভ্রান্ত ব'লে, বোঝো না লীলা দেখাই, না দেখাই,
স্বভাবতই আমি অশনিসিদ্ধ ॥

শুনতে পাবে পরীক্ষার ভয়ংকর দিনে
আমার রূঢ় কণ্ঠ মেঘমন্দ্রে,
ত্রাহিস্বর বাত্যাহত বৃক্ষে তথা তৃণে,
প্রতিধ্বনি রন্ধ্র থেকে রন্ধ্রে ॥

সে-দুর্যোগে বজ্র মেতে উঠবে তাণ্ডবে,
লাগবে যত প্রাসাদে ভূমিকম্প,
দৈবতের গর্ব হবে খর্ব খাণ্ডবে,
অবাধ শত শিখার উল্লম্ফ ।

— হাইন্‌রিখ্‌ হাইনে

আদি রচনা : ২৯ ডিসেম্বর ১৯৩১
পরিমার্জনা : ৩ জুলাই ১৯৫৪

অবিশ্বাসী

পাব আমি আজ তোমাকে আলিঙ্গনে !
সুখের উৎস, অবরোধ টুটে,
বারে বারে তাই বুকে নেচে উঠে ;
তাই বিমোহন স্বপনের রং ধরেছে মনে !
সত্য পাব কি তোমাকে আলিঙ্গনে ?

পাব আমি আজ তোমাকে আলিঙ্গনে !
শিথিল কবরী সহসা বিরলে
ভ'রে দিবে মুঠি সোনার ফসলে ;
কাঁধে মাথা তুমি রাখিবে অবাধ সমর্পণে।
সত্য পাব কি তোমাকে আলিঙ্গনে ?

পাব আমি আজ তোমাকে আলিঙ্গনে !
বাস্তবে মিশে যাবে কল্পনা ;
পূরিবে অমিত মনস্কামনা ;
অমরা আসিবে নেমে মর্ত্যের আকর্ষণে।
সত্য পাব কি তোমাকে আলিঙ্গনে ?

বলো বিধি তাকে পাব কি আলিঙ্গনে !
ভাগ্যে তখনই বিশ্বাস হবে,
টমাসের মতো, অঙ্গুলি যবে
ইষ্ট ক্ষতের রহসে পশিবে পরম ক্ষণে।
মানিব তখন বাঁধা সে আলিঙ্গনে ॥

—হাইন্‌রিখ হাইনে

আদি রচনা : ২ জানুআরি ১৯৩২
পরিমার্জনা : ১০ ফেব্রুআরি ১৯৪১ ?

পরিবাদ

সাচ্চা কিছুই নেই জগতে ; দুষ্ট সবাই দোষে।
গোলাপ আপন বোঁটায় বোঁটায় তীক্ষ্ণ কাঁটা পোষে।
সন্দেহ হয় ঊর্ধ্বলোকে দেবতা থাকেন যত,
হয়তো তাঁরাও খাদে ভরা মর্ত্যবাসীর মতো।
কিংশুকে, কই, সৌরভই নেই। বৃন্দাবনে তাপ।
গেরুয়া দিয়ে ঢাকেন সাধু মহাবিদ্যার ছাপ।
সীতা যদি গোসা ক'রে যার কাছে না যেত,
পঞ্চ সতীর পুণ্য শ্লোকে তবেই সে ঠাঁই পেত।
শিখীর পেখম জবর হলেও, বীভৎস পা তার।
শকুন্তলা, কালিদাসের কাব্যকলার সার,
তার ভণিতাও সকল সময় সহ্য হবার নয়।
কাদম্বরীর বিপুল বহর স্বতই জাগায় ভয়।
ষণ্ড, স্বয়ং শিবের বাহন, জানে না দেবভাষা।
বাচস্পতি শেখেননি তো বয়েং খাসা খাসা।
কোণারকের সুন্দরীদের পাছা বেজায় ভারী।
বাঙালীদের নাকের আবার নেই কো বাড়াবাড়ি।
ছন্দ যতই হোক না মধুর, খুঁত থেকে যায় মিলে।
মৌচাকে, হায়, বিষাক্ত হুল। গ্রাম্য বধূর পিলে।
ব্যাধের হাতে মারা গেলেন কৃষ্ণ ভগবান।
তানসেনও, সে কলমা প'ড়ে হল মুসলমান।
স্বর্গচারী, দীপ্ত তারা, সর্দি তাকেও ধরে ;
তারও কবর ধুলার ধরায় ; ঠাণ্ডাতে সেও মরে।
দুধে মিলে ঘাসের গন্ধ। সূর্যদেবের গায়
দাগ দেখা যায় শাদা চোখেও, সেই বোঝে, যে চায়।
তোমায়, দেবী, ভক্তি করি ; কিন্তু তোমার ত্রুটি
কত যে, তার হিসাব রাখি, কোথায় এমন ছুটি ?
ডাগর চোখে, শুধাও কী দোষ ? আছে কি তার শেষ ?
ওই সমতল বুকের তলায় নেই হৃদয়ের লেশ !

—হাইন্‌রিখ্‌ হাইনে

২ জানুআরি ১৯৩২

প্রত্যাবর্তন

মধুমালতীর কুঞ্জ—চৈত্রসন্ধ্যা—আমরা দু জনে
আবার আগের মতো ব'সে আছি খোলা জানালায়—
চাঁদ ওঠে ধীরে ধীরে, স্নাত মর্ত্য স্নিগ্ধ সঞ্জীবনে—
কেবল আমরা যেন প্রেতচ্ছায়া, গলগ্রহ দায়।

দ্বাদশ বৎসর পূর্বে শেষ বসেছিলুম উভয়ে
এখানে যুগলাসনে, এ-রকম কবোষ্ণ প্রদোষে ;
নবানুরাগের জ্বালা ইতিমধ্যে নিবেছে হৃদয়ে,
সম্প্রতি মন্দাগ্নি কাম অনুচিত পারণে, উপোসে।

নিতান্ত নিঃসাড় আমি, তথাচ সে কথার জাহাজ ;
মুখের বিরাম নেই, সঙ্গে সঙ্গে নাড়ে নিরন্তর
প্রণয়ের চিতাভস্ম ; বোঝে না সে কোনও মতে আজ
নির্বাপিত বিস্ফুলিঙ্গ পুনরায় হবে না ভাস্বর।

অফুরন্ত ইতিহাস : কুচিন্তার বিরুদ্ধে সে নাকি
এত দিন যুদ্ধ ক'রে উপনীত আর্তির চরমে
অপ্রতিষ্ঠ একনিষ্ঠা, পাপস্পর্শে নষ্ট তার রাখী।
তাকাই বোবার মতো সে যখন সায় চায় সমে।

অগত্যা পালিয়ে বাঁচি ; কিন্তু মৃত লাগে চন্দ্রালোক,
ভূতের কাতার দেখি দু পাশের অতিক্রান্ত গাছে,
নিরালায় কথা কয় পৃথিবীর পুঞ্জীভূত শোক ;
ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চলি, তবু সঙ্গ ছাড়ে না পশ্চাতে।

—হাইন্‌রিখ্ হাইনে

আদি রচনা : ৩১ ডিসেম্বর ১৯৩১
পরিমার্জনা : ৩ মার্চ ১৯৬১

আত্মপরিচয়

মুক্তির সংগ্রামে আমি কাটিয়েছি তিরিশ বৎসর ;
করিনি চেষ্টার ত্রুটি দূরবর্তী দুর্গের রক্ষায় ;
ছিল না জয়ের আশা, তবু যুদ্ধে থেকেছি তৎপর ;
ভাবিনি অক্ষত দেহে ঘরে ফিরে যাব পুনরায় ॥

অহোরাত্র পাহারায় এক বারও ফেলিনি পলক ;
অসাধ্য লেগেছে নিদ্রা শিবিরের সামান্য শয়নে ;
অনিচ্ছায় ঢুল এলে, তৎক্ষণাৎ ভেঙেছে চমক
সৎসাহসী সঙ্গীদের সমস্বর নাসিকাগর্জনে ॥

মাঝে মাঝে মহানিশা ভ'রে গেছে সান্দ্র অবসাদে,
হৃদয়ে জেগেছে আর্তি – নির্বোধেরই ভয়-ডর নেই –
অশ্লীল গানের কলি সে-সময়ে ভেঁজেছি অবাধে ;
পেরেছে বিবিক্ত মৌন কখনও বা উদ্ধত শিসেই ॥

উন্নিদ্র সন্দেহ চোখে, শব্দভেদী অবধান কানে,
সজাগ বন্দুকে উষ্মা, কৌতূহলী অজ্ঞের প্রগতি
থামিয়েছি অর্ধপথে, দেখিয়েছি অব্যর্থ সন্ধানে
সূচাগ্রপ্রমাণ যত লম্বোদর দাম্ভিকের মতি ॥

কিন্তু সে-ক্লীবের দলে হেন শত্রু মিলেছে দৈবাৎ
সাংঘাতিক লক্ষ্যবেধে যে সব্যসাচীর প্রতিযোগী ;
না মেনে উপায় নেই – সাক্ষী আছে শত রক্তপাত,
অসংখ্য উন্মুদ্র ক্ষতে প্রতিপন্ন আমি ভুক্তভোগী ॥

অনাথ দুরান্ত দুর্গ ; রক্তগঙ্গা আহত প্রহরী ;
বন্ধুরা নিহত, কিংবা অগ্রগামী, নচেৎ বিমুখ ;

মরণেও অপরাভ, অবশেষে খাডে ট'লে পড়ি ;
ভাঙেনি আমার অম্ল, শুধু জানি ফেটে গেছে বুক ॥

—হাইন্‌রিখ্ হাইনে

আদি রচনা : ১ জানুআরি ১৯৩২
পরিমার্জনা : ৯ ফেব্রুআরি ১৯৪১

রোমন্থ

গোলাপচারায় ফুল ফুটেছিল সে-দিন সবে,
নিশীথে কোকিল ডেকেছিল বার বার,
চুম্বনঘন প্রথম সোহাগে সহসা যবে
করেছিলে তুমি আমাকে অঙ্গীকার ॥

আজ হেমন্ত পাপ্‌ড়ি খসায় গোলাপ থেকে ;
নীরব বেহাগ, কোকিল নিরুদ্দেশ ;
সংগতিহীন শূন্যে আমাকে একাকী রেখে,
তুমিও ছেড়েছ ম্রিয়মাণ প্রতিবেশ ॥

হাড়হিম রাত ফুরাতে চায় না, কেবলই বাড়ে,
পায় না তোমার সাড়া অন্তর্যামী।
ভূতের বেগার খাটাতেই স্মৃতি চেপেছে ঘাড়ে :
সত্যের ফাঁক স্বপ্নে ভরাই আমি ॥

—হাইন্‌রিখ্ হাইনে

আদি রচনা : ৬ জানুআরি ১৯৩২
পরিমার্জনা : ১০ ফেব্রুআরি ১৯৪১

বর্ষশেষ

শীত শাখে ওই ধরেছে কাঁপন,
ঝরকে ঝরকে পাতা ঝরে ;

শুকায় যা কিছু ললিত, মোহন,
ধুলায় কবরে লুটে পড়ে ॥

অটবিশিখরে জলে থেকে থেকে
সবিতার শোকাবহ জ্যোতি ;
মনে হয় শেষ চুম্বন রেখে,
দ্রুত চ'লে যায় ঋতুপতি ॥

অশ্রুফল্গু সহসা আবার
ভাসে পুরাতন উচ্ছ্বাসে :
এ-ছবি নেহাবি, সেই দিনকার ,
বিদায়ের বেলা মনে আসে ॥

জানিতাম আশু তোমার মরণ,
যেতে হল তবু ডাক শুনি ,
তোমার উপমা মুমূর্ষু বন,
আমি পলাতক ফাল্গুনী ॥

— হাইন্‌রিখ হাইনে

আদি রচনা : ৭ জানুআরি ১৯৩২
পরিমার্জনা : ১০ ফেব্রুআরি ১৯৪১

সূর্যাস্ত

নির্বাণমুখ রবিরে রম্য লাগে ,
তোমার চোখের রুচি ততোধিক ধন্য
রাজীব আঁখির দীপকে, অনুরাগে,
আমার হৃদয় শোকে আজ অবসন্ন ॥

সন্ধ্যাশোণিমা ঘোষে বিচ্ছেদ নহে,—
পৃথগাত্মার যাতনাজাগর রাত্রি :

অশ্রুসাগরে অচিরাৎ দ্বিধা হবে
অন্ধ ভিখারী, সুনয়নী বরযাত্রী ॥

—হাইন্‌রিখ্‌ হাইনে

আদি রচনা : ৭ জানুয়ারি ১৯৩২
পরিমার্জনা : ১০ ফেব্রুয়ারি ১৯৪১

স্মৃতিবিষ

বয়স আমার অন্তত পঁয়ত্রিশ,
পনেরো বছরে পা দিয়েছ তুমি সবে ;
তবু গূঢ় ক্ষতে চোয়ায় স্মৃতির বিষ
তাকালে তোমার তরুণ মুখাবয়বে ॥

ভালো লেগেছিল আঠারো শ সতেরোতে
যে-কিশোরীকে, সে হুবহু তোমার জোড়া ,
আকারে-প্রকারে, এলানো খোঁপার স্রোতে,
তোমার মতোই অপরূপ আগা-গোড়া ॥

গেলুম শহরে, বিশ্ববিদ্যালয়ে,
বললুম, "দেরি হবে না, স্মরণে রেখো ।"
জবাব দিল সে, "তুমি ছাড়া এ-হৃদয়ে
আর কেউ নেই, কেবল তুমিই থেকো ॥"

বছর-তিনেক টীকাটিপ্পনীসহ
ধর্মশাস্ত্র কিছু সড়গড় হলে,
নব ফাল্গুনে কে এক বার্তাবহ
দরদ জানাল, সে পরঘরনী ব'লে ।

সে-দিন পহেলা ফাল্গুন : ঘাটে, মাঠে
মদনসখার বিস্মিত অভিযান ;

বালারুণপ্রতিবিম্বিত পাশসাটে
নাচে পতঙ্গ, গায় বিহঙ্গ গান ॥

শুধু পেয়েছিল আমাকে মুমূর্ষাতে :
ক'য়ে ক'য়ে, মিশেছিলুম শয়নে আমি।
সয়েছি তখন যে-যাতনা প্রতি রাতে,
তা আমি জানি ও জানে অন্তর্যামী ॥

কিন্তু ধরল মরা ডালে ফের শীষ।
স্বাস্থ্যে কি আমি অক্ষয়বট তবে ?
তবু গূঢ় ক্ষেতে চোয়ায় স্মৃতির বিষ
তাকালে তোমার তরুণ মুখাবয়বে ॥

—হাইন্‌রিথ্‌ হাইনে

আদি রচনা : ২২ সেপ্টেম্বর ১৯৩০
পরিমার্জনা : ১৮ ফেব্রুআরি ১৯৪১

মহাকাব্য

রমণীর বরদেহ, সে যেন কবিতা,
রচয়িতা নিজে ভগবান ;
বিশ্বমহাভারতের অন্তর্গত গীতা,
ঐশী অভিব্যক্তির প্রমাণ ॥

যেমনই প্রশস্ত লগ্ন, তেমনই প্রখর
প্রতিভার দিব্য হুতাশন ;
তাই মেনেছিল স্বৈর, অনেকান্ত জড়
ঐকান্তিক শিল্পের শাসন ॥

সত্যই বিস্ময়কর রমণীর দেহ,
মহাকাব্য সরস, সার্থক ;

গৌর, তন্বী অবয়বে বিজড়িত স্নেহ,
এক-একটি সর্গ বা স্তবক ॥

অনাবৃত গ্রীবাভঙ্গে দৈবী ভাবচ্ছবি
চিত্রার্পিত নিপুণ আঁচড়ে ;
কেশমুকুটিত শিরে ত্রৈলোক্যপ্রসবী
পরিকল্পনাই ধরা পড়ে ॥

উদ্ভট শ্লোকের মতো শ্লেষে ও সংক্ষেপে
সূচীমুখ উরোজের কলি :
সুপ্রকট যতিপাত সমবৃত্তে মেপে,
যমকের সাক্ষ্য গীতাঞ্জলি ॥

সর্বশ্রেষ্ঠ ভাস্করের চূড়ান্ত গৌরব
সুখনম্য, সমাস্তর শ্রোণী ;
নিহিত নিক্ষেপবন্ধ প্রত্যক্ষ প্রণব,
অধিগম্য রহস্যের খনি ॥

তাতে নেই অচিন্ত্যের অমূর্ত আকৃতি :
অস্থি-মাংসে সে-গাথা সাকার :
সহাস, চুম্বনসহ অধরে আহুতি,
হাতে বর, পায়ে অভিসার ॥

ভারতী যোগায় নিত্য প্রাণবায়ু তাকে ;
মন্ত্রমুগ্ধ তার অঙ্গরাগ ;
অন্নপূর্ণা তার ভালে আশীর্বাদ আঁকে :
কোষে কোষে প্রচুর পরাগ ॥

অগত্যা তোমাকে, প্রভু, জানাই প্রণাম,
অদ্বিতীয় আদিকবি তুমি।

আমরা শিক্ষার্থীমাত্র, সাধি স্বরগ্রাম,
কিংবা আজও বাজাই ঝুমঝুমি।

আমি হব সে-সংগীতসিন্ধুর ডুবুরী;
উদয়াস্ত প্রাণান্ত প্রয়াসে
ক'রে যাব বিদ্যাভ্যাস, মথিত মাধুরী
যত দিন আয়ত্তে না আসে।

উদয়াস্ত অধ্যয়ন নিজেকে সওয়াব;
শ্রান্তি চোখে দেবে না নিদুটি,
প'ড়ে প'ড়ে, অবশেষে পা-জোড়া ক্ষওয়াব;
তার পরে একেবারে ছুটি।

—হাইন্‌রিখ্‌ হাইনে

আদি রচনা: ২১ সেপ্টেম্বর ১৯৩০
পরিমার্জনা: ২২ ফেব্রুআরি ১৯৪১

প্রমারা

অসমসাহসে আমি বাজি রেখেছিলুম একদা
খেয়ালের প্রমারায় জীবনের দৈনিক সংগতি।
যদিও মরীয়া খেলা সর্বনাশে সমাপ্ত সম্প্রতি,
তবু অশোভন শোক, আজ নয়, সর্বথা, সর্বদা।

প্রবচনে প্রোক্ত আছে: ইচ্ছার অসাধ্য কিছু নেই;
ইচ্ছাময় ভগবান; স্বর্গসুখ পূর্ণ মনোরথে।
মিটাতে পেরেছি সাধ বাধ-সাধা বিধির জগতে,
জীবনের নিরাপত্তা দৃক্‌পাতেও আনিনি ব'লেই।

যে-তুরীয় অভিজ্ঞতা পরিবর্তে করেছি সম্ভোগ,
তা অবশ্য ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু অবচ্ছেদেও অগাধ।

স্বতরাং নিমেষেও নির্বিকল্প সমাধির স্বাদ
পেয়েছে যে এক বার, সে হিসাব করে না বিয়োগ ॥

নিত্যবর্তমান শুধু অদ্বিতীয় আত্মসমাহিতি।
নিরঞ্জন, বিরঞ্জন সে-আলোর উৎসে বা প্রপাতে
প্রেমের সমস্ত জ্বালা না জুড়াক, বয় এক খাতে ;
তবু তা নির্বাণ নয়, দেশকাললঙ্ঘনেরই রীতি ॥

—হাইন্‌রিখ্‌ হাইনে

আদি রচনা : ২১ সেপ্টেম্বর ১৯৫০
পরিমার্জনা : ২৪ ফেব্রুআরি ১৯৫১

প্রায়শ্চিত্ত

ভাবিসনে তোর শয়তানি সই আমি,
আকাট বোকা ব'লে ;
ভাবিসনে দেবদূত ভূভারে নামি,
ক্ষমায় গ'লে গ'লে ॥

নষ্টামি তোর স্পষ্ট বুঝেও, তোকে
দেখাই বদান্যতা ;
অন্যে হলে, হঠাৎ খুনের ঝোঁকে
ফুরাত তোর কথা ॥

কিন্তু আমার পাতকও নয় সোজা,
শক্ত সাজা তাই ;
অগত্যা তোর ভালোবাসার বোঝা
বইছি, বিরাম নাই ॥

একত্রে তুই নরক ও কৈবল্য :
তোর অশুচি হাতে

দৈব দয়ায় অচিন্ত্য সাফল্য
মিলবে কি শেষ রাতে ?

—হাইন্‌রিখ্‌ হাইনে

আদি রচনা : ১০ জানুআরি ১৯৫২
পরিমার্জনা : ৬ জুলাই ১৯৫৪

বিদায়

বাষ্পী চোখে বিদায় নিতে দাও,
সাধ্য নেই মুখে সে-কথা আনি ;
দুঃসহ এ-বিরহবেদনাও,
পুরুষ ব'লে, তা মানি বা না মানি ॥

সকাল নয়, অকাল উপনীত :
বর্তমানে শপথও শোচনীয়,
অধরসুধা নীহারে অবসিত,
অকিঞ্চন দৃষ্টি মোচনীয় ॥

অথচ ছিল একদা বিস্ময়
তোমার লঘু, চকিত চুম্বনে,
মাঘের শেষে প্রথম কিশলয়
লাগায় যেন পুলক পাতী বনে ॥

হবে না আর বদল বরমালা,
মধুপ লীলাকমল জাগাবে না ।
বাহিরে শুরু বসন্তের পালা,
হৃদয়ে জমে হেমন্তের হেনা ॥

—য়োহান্‌ ভোল্‌ফ্‌গাংগ্‌ ফন্‌ গ্যোটে

আদি রচনা : ২৪ জানুআরি ১৯৫২
পরিমার্জনা : ২৫ জুন ১৯৫৪

সুরাত্রি

প্রাণপ্রতিমার কুঞ্জকুটীর ছেড়ে,
নৈশ, নিরালা কান্তারে দিই পাড়ি ;
অপার ব্যবধি পায়ে পায়ে যায় বেড়ে,
কিন্তু এখনও রভসে বিবশ নাড়ী ।

বনস্পতির জটায় বন্দী বিধু ;
দিশারী মলয় আত্মঘোষণা করে ;
বকুলবনের সুরভি এবং সীধু,
লাস্যলীলায়, ছড়ায় বনান্তরে ।

মধুমাধবের সুন্দর শর্বরী
স্নিগ্ধ প্রসাদে কী অনির্বচনীয় !
এ-মহামৌনে অশোভন মাধুকরী,
ভূমা সমাহিত চেতনারই রচনীয় ।

শত সহস্র এমন রজনী তবু
মূল্যহিসাবে কেড়ে নিও যথাকালে ;
আমি চাই পরিবর্তে আবার, প্রভু,
মতিচ্ছন্ন্ ক্ষণিকার মায়াজালে ।

—য়োহান্ ভোল্ফ্‌গাংগ্ ফন্ গোটে

আদি রচনা : ২৪ জানুআরি ১৯৩২
পরিমার্জনা : ২৬ জুন ১৯৫৪

আদিনাগ

মহীরুহ দোদুল মারুতে,
সর্পবেশী আমি শাখাচর,
দন্তরুচি ক্ষুধার বিদ্যুতে
প্রভাস্বর আমার অন্তর।
সঞ্চারী সে-মরীয়া ক্ষুধায়
বীতস্বর নন্দন সুধায়,
লেলিহান দ্বিরক্ত রসনা।
অন্ধ আমি, তীক্ষ্ণবীর্য বটে,
কিন্তু নেই হেন বিষ ঘটে
যাতে ডোবে ঋষির চেতনা॥

রম্য এই প্রমোদের কাল!
মর্ত্যবাসী, সাবধান: আমি
জৃম্ভণেও প্রবল, ভয়াল;
আশুতোষ নই, অন্তর্যামী।
নীলিমার ক্ষুরধার স্নেহে
অসংবৃত, ছদ্ম নাগদেহে,
জীবনের পাশব প্রসাদ।
আয়, জড়ভরতের জাতি,
আয়, হেথা আমি ওত পাতি,
নিয়তির মতো অপ্রমাদ॥

সূর্য, সূর্য, হিরণ্ময় খনি,
মৃত্যু ঢাকা যার চন্দ্রাতপে,

যার মন্ত্রে স্ফূর্ত কানাকানি
ফলে ফুলে পাদপে পাদপে,
দৃপ্ত তুমি, হে সূর্য, আমার
সর্বশ্রেষ্ঠ সহায়ক, আর
চক্রান্তের আলয় ; কারণ
জগৎ যে বিশুদ্ধ অভাবে
কলঙ্ক, তা তোমারই প্রভাবে
অস্বীকার করে মুগ্ধ মন ॥

মহাজ্যোতি, তুমিই জাগাও
প্রাণবহ্নি সত্তার বিগ্রহে,
তথা তার ক্ষেত্র মেপে দাও
প্রত্যক্ষের স্বপ্নাচ্ছ আবহে।
দুষ্ট মরীচিকার প্রণেতা,
কী সংকল্পে নিমগ্ন প্রচেতা,
চাক্ষুষ তা তোমার রূপকে।
হে স্বরাট্ ছায়ার সম্রাট্,
ভালোবাসি ভরো যে-বিরাট্
মিথ্যা তুমি শূন্যের কূপকে ॥

যথাজাত তোমার উত্তাপে
আলস্যের তুষার শিথিল,
স্মৃতি প্রতিধ্বনিত বিলাপে,
আমি প্রত্ন বিপাকে জটিল।
একাকার কায়ার পতন
দেখেছিল এ-দিব্য কানন ;
এ-আরাম সে-জন্যেই প্রিয় :
ক্রোধ পায় ইন্ধন এখানে,
কুণ্ডলিনী উদ্বুদ্ধ পুরাণে,
উন্মুখর অনির্বচনীয় ॥

অহংকার, তুমি মূলাধার,
চক্রবর্তী আকাশে আকাশে,
দেশগত জগৎ-সংসার
খুলেছিলে বাণীর বিভাসে।
নিত্য আত্মদর্শনে বুঝি বা
অপ্রচার্য স্রষ্টার প্রতিভা ;
মুক্ত তাই পূর্ণের অর্গল,
উপজাত বিধির ব্যত্যয়,
ছত্রভঙ্গ সিদ্ধান্তে নিশ্চয়,
তারাপুঞ্জে কৈবল্য বিকল ॥

ব্যোম তার ভ্রান্তির প্রমাণ,
সর্বনাশ স্বাক্ষরিত কালে,
আরম্ভেই উল্কাপাত—প্রাণ
ধাবমান ব্যাদত্ত পাতালে।
কিন্তু আমি প্রথম প্রণবে,
অদ্বিতীয় স্ফূর্তবাক্‌ নভে,
উপস্থিত, অতীত, আগামী ;
আত্মহারা ঐশ্বর্যের হ্রাস
করি লুব্ধ আলোকে প্রকাশ ;
নিরাকার মোহিনীর স্বামী ॥

বর্তমান ঘৃণার আধার,
ভূতপূর্ব নয়নের মণি,
প্রেমিকের যোগ্য পুরস্কার
নরকের অক্ষয় পত্তনি ?
দেখো মুখ আমার তিমিরে !
যে-ছবি সে-গরিষ্ঠ গভীরে
মুকুরিত, একদা তা দেখে,
নৈরাশ্যে ও ধিক্কারে ব্যাকুল,

অনুরূপ মাটির পুতুল
গড়েছিলে শ্রদ্ধাব্যতিরেকে ॥

পশুশ্রম : মৃত্তিকাসঞ্জাত,
সাবলীল তোমার সন্তান
করেছিল স্তবে প্রতিভাত
তুমি বটে সর্বশক্তিমান ;
কিন্তু সৃষ্ট ভাস্কর্যের সেরা,
প্রত্যাদিষ্ট নবজাতকেরা
শুনেছিল বিরামে বিরামে
আমি বলি, "ওরে আগন্তুক,
শ্বেতকায়, উলঙ্গ, উন্মুখ,
পশু তোরা, নর শুধু নামে ॥"

"তোরা যার সৌসাদৃশ্যদোষে
আশপ্ত ও আমার ঘৃণিত,
অপূর্বের স্রষ্টা যদিও সে,
তবু তার রচনা গর্হিত।
সিদ্ধহস্ত আমি সংশোধনে ;
প্রস্তুত যে আত্মসমর্পণে,
আমি তার মরমী সহায়।
অথ যত উরঙ্গশাবক
হয়ে ওঠে উদ্যত তক্ষক
আমাদের যৌথ প্রচেষ্টায় ॥"

অপ্রমেয় আমার মনীষা
খুঁজে পায় মানুষের মনে
প্রতিহিংসাপূরণের দিশা
যা সম্ভব তোমারই সৃজনে।
রহস্যের দুস্থ অবরোধে,
নাক্ষত্রিক ধূপের আমোদে,

বিশ্বপিতা যেথা ইচ্ছাময়,
সেখানেও করে অধিরোহ
আত্যন্তিক আমার সম্মোহ,
স্পর্শক্রামী বিদ্রোহের ভয়॥

আসি, যাই সত্বর, মন্থর ;
শুচি চিত্তে হই নিরুদ্দেশ।
কার বক্ষ এমন কঠিন
রুদ্ধ যাতে চিন্তার প্রবেশ ?
যেই কেন হোক না সে, তার
মর্মে আত্মরতির সঞ্চার
সংঘটিত আমারই প্রভাবে।
স্বার্থে আমি প্রতিষ্ঠিত ব'লে,
স্বরূপের আবরণ খোলে,
অন্যপের বিকাশ স্বভাবে॥

ঈভ্-ও, দেখেছিলুম একদা,
ভাবনার প্রারম্ভে চকিত,
ওষ্ঠাধরে অবাক্ ব্যবধা,
গোলাপের লাস্যে উচ্ছ্বসিত।
সুপ্রশস্ত হৈম কটিতট ;
অনবদ্য গৌরবে প্রকট,
নিঃশঙ্ক সে রৌদ্রে ও মানুষে,
অঙ্গীকৃত বায়ুর আশ্লেষ ;
দেহদ্বারে আত্মার প্রবেশ
প্রত্যাহত বুদ্ধির প্রত্যূষে॥

আহা, ভূমানন্দের সংহতি,
মরি, মরি, তুই কী সুন্দর!
সুমতির মতো, মহামতি
তাই তোর সেবায় তৎপর।

তারা তোর দীর্ঘশ্বাস শুনে,
ঝাঁপ দেয় প্রেমের আগুনে।
যে নিষ্পাপ, সে আরও তন্ময়,
যে কঠোর, সেই অভ্যাহত।…
আমি পালি পিশাচ, প্রমথ,
তবু তুই গলালি হৃদয়॥

সরীসৃপে পক্ষীর উল্লাস :
উহ্য আমি পাতার আড়ালে ;
ছলনার সূক্ষ্ম নাগপাশ
বিরচিত হয় বাক্যজালে।
ইতিমধ্যে রূপমুগ্ধ চোখে
পান করি, রে বধিরা, তোকে ;
আমি তোর প্রচ্ছন্ন কাণ্ডারী।
বক্র গতি গ্রীবার বিভ্রমে,
দীপ্র তুই হিরণ্ময় রোমে,
শান্ত, স্বচ্ছ মাধুর্যের ভারী॥

আপাতত অনতিগভীর,
অতীন্দ্রিয় প্রকৃত প্রস্তাবে,
ভাব আমি, সৌগন্ধমদির
তোর মর্ম যার আবির্ভাবে।
নিশ্চয়ের যাতায়াতে তোর
কম্র কায়া কোমল-কঠোর,
ক্ষণে ক্ষণে অধিক উতলা।
ভয় নয়, কম্প্র বিপর্যায়
অভিব্যাপ্ত তোর মহিমায় :
পাব তোকে আয়ত্তে, সরলা॥

(যে-নিপট অকপট, তাকে
প্রযত্নের পরাকাষ্ঠা দেয় ;

সে অচ্ছোদ চোখে জেগে থাকে ;
রক্ষা পায় সুন্দরের গেহ
তার দম্ভে, মতিভ্রমে, সুখে ।
এসো শিখি দুর্দৈবের মুখে
সাধ্বীদের দুঃসাহস দেওয়া ।—
পারদর্শী সে-কলাকৌশলে,
পরিচিত আমি প্রতিফলে :
চিরজয় সবুরের মেওয়া ॥

অতএব দীপ্ত মৃগমদে
বোনা যাক লঘিষ্ঠ শৃঙ্খলা,
জাড্য ভুলে, অস্পষ্ট বিপদে
স্নিগ্ধ ঈষৎ পাতে যেন গলা ।
নীলিমায় অভ্যস্ত কেবল,
ঊর্ণাজালে পর্যস্ত বিহ্বল,
কী শিল্পে শিকারের ঝোঁকে !
কিন্তু নয় অগোচর কূট,
এবং তা নির্ভার, অটুট,
রচনার রীতিজ্ঞ কুহকে ॥

উপহার দে তাকে, রসনা,
সোনা-মোড়া কথার মাধুরী,
লক্ষ লক্ষ মৌনের ভক্ষণা,
কিংবদন্তী, উদ্বেগ, চাতুরী ;
লাগ তার অপচিকীর্ষায়,
তোষামোদে তাকে নিয়ে আগ
অভিপ্রায়ী আমার কবলে :
স্বর্গচ্যুত নির্ঝরের মতো,
নিজেকে সে করুক দুর্গত
অতটের নীলিম অতলে ॥

ব্যোমে, না কি পরাগে, আবৃত,
কম্বুনিভ, সে-আশ্চর্য কানে
নিরুপম কী গন্ধে পিহিত
পরমার্থ ঢেলেছি সমানে !
ভাবিনি সে-চেষ্টা অপচয় ;
সর্বগ্রাহী সন্দিগ্ধ হৃদয় :
সিদ্ধি স্থির : শুধু প্রয়োজন,
মর্মান্বেষী মধুপের মতো,
ঘিরে রাখা নির্বন্ধে সতত
কর্ণিকা না স্বর্ণ শ্রবণ ॥

ধীরে বলেছিলুম, "নিশ্চয়ে
দৈববাণী ন্যূনতম, ঈভ্ ।
ওই পক্ব ফলের আশয়ে
বিস্ফারিত বিজ্ঞান সজীব ।
শুনো না সে-প্রাচীনের মানা,
যার শাপে পাপ দন্তহানা !
কিন্তু স্বপ্নে মুগ্ধ ওষ্ঠাধর,
তুমি করো যে-রসের ধ্যান,
আগামীর সেই অভিজ্ঞান
বিগলিত অনন্তে উর্বর ॥"

আবেদনে অদ্ভুত আমার
বক্তব্য সে পান করেছিল ;
উপেক্ষিত দেবদূত—তার
চক্ষু বৃক্ষে ঘুরে মরেছিল ।
অনিষ্টের সঞ্চারে গর্ভিণী,
বোঝেনি সে-বিশ্বাসঘাতিনী
কৌটিল্যে যে জন্তুর প্রধান,
যার শ্লেষে নষ্ট তার ভর,

পর্ণে আমি বিমূর্ত সে-স্বর ;
তবু উৎ পেতেছিল কান ॥

"আত্মা," তাকে শিখিয়েছিলুম,
"প্রতিবিম্ব রূপের বসতি,
তোর মনে যে-প্রেমের ধূম,
তা পরম জনিতারই ক্ষতি।
অপহৃত অমৃতে মধুর,
দূরদর্শী, আদিম অসুর,
ব্যবস্থিত ক্রান্তিপাতে মৃত,
আমি বলি, বাড়িয়ে দে হাত,
পাড় ফল ; ঘোচাতে ব্যাঘাত
হাত আছে—চাস তো, নে বিধু ॥"

মহামৌন প্রহত পলকে !
অর্ধবক্ষে বিটপীর ছায়া,
অপরাধ, রৌদ্রের ঝলকে,
ঊর্ধ্বশ্বাস কেশরের মায়া।
সঙ্গে সঙ্গে আমার উল্লাস
পেয়েছিল শীৎকারে প্রকাশ ;
হয়েছিল বিপন্ন পুলকে
শরীরের কুণ্ডলিত ফণা,—
শিরোমণি পর্যন্ত সহসা
মগ্ন যেন সদ্য মাদকে ॥

দীর্ঘায়িত অধৈর্য—প্রতিভা !
অবশেষে লগ্ন উপনীত :
ব্যক্ত নব বিজ্ঞানের বিভা,
নগ্ন পদে গতি উৎসারিত ;
স্বর্ণে নতি ; নিঃশ্বাস মর্মরে :
যুগ্ম আলো-ছায়ার নির্ভরে

চাঞ্চল্যের কম্পিত সূচনা;
টলমল শূন্য কুম্ভ-বৎ
উন্মুখ সে; উদ্বায়ী শপথ;
আপাতত অবাক্ রসনা॥

নবদেহে প্রলুব্ধ জিজ্ঞাসা,
হারিয়ে যা অভীষ্ট সম্ভোগে।
তোর পরিবর্তনপিপাসা
ভঙ্গিমার সংবদ্ধ উদ্যোগে
ঘিরে যেন রাখে মৃত্যুতরু।
না এগিয়ে, বাড়া করভোরু,
গোলাপের ভারে মন্দগতি।
নৃত্যে তনু নিশ্চিন্তে সঁপে দে।
এখানে যা ঘটে, অনির্বেদে
অহৈতুক তার পরিণতি॥

জ্বেলেছিল কী উন্মত্ত আলো
অন্তর্বর বিলাসের জতু!
তবু দেখে, লেগেছিল ভালো,
পৃষ্ঠদেশে অবাধা বেপথু!
ইতিমধ্যে স্বপ্নে আলুথালু
বোধিদ্রুম, বিলায়ে রসালু
প্রপঞ্চ ও সংহত প্রমিতি,
ডুবেছিল রৌদ্রের গভীরে,
বাতাহত নির্ভার শরীরে
জমে যাতে আবার প্রতীতি॥

বৃক্ষ, মহাবৃক্ষ, দুর্নিবার
বৃক্ষশ্রেষ্ঠ, গগনদর্পণ,
মর্মরের দৌর্বল্যে তোমার
তৃষ্ণা করে রসানুসরণ;

শূন্যে তুমি ছড়াও যে-জটা,
অন্তরঙ্গ তমিস্রার ঘটা
সে-ধাঁধায় মোক্ষ খুঁজে পায় ;
চিরন্তন প্রভাতের নীলে,
পারাবতে, সৌরভে, অনিলে,
অফুরান প্ররোহের দায় ॥

হে গায়ক, খনির অগাধে
লুক্কায়িত তোমার নিপান,
যে-ভাবুক ফণীর প্রমাদে
ভাবাবিষ্ট ঈভ্, মহাপ্রাণ,
তুমি তার হিন্দোলা, তোমাকে
উপক্রান্ত করে জ্ঞান, ডাকে,
দৃষ্টিপাত বাড়াতে, উন্নতি,
অবিমিশ্র হিরণ্যে উদ্বাহু ;
প্রশাখায় কুয়াশার রাহু,
পক্ষপাত পাতালের প্রতি ॥

বিনির্মিত তোমার বর্ধনে
অনন্তকে তুমিই হটাও,
শীর্ষে নীড়, সমাধি চরণে,
জ্ঞানে আত্মবিলোপ ঘটাও।
কিন্তু আমি প্রবীণ দাবায় ;
হৈমন্তের বিশুদ্ধ আভায়
তোমার এ-শাখা ঘিরে থাকি :
জানি তুমি বিশ্বে ভারাতুর —
বিপর্যয়, হতাশা, মৃত্যুর
চ্যুত ফল চোখে চোখে রাখি ॥

সুশ্রী সর্প, দুলি ইন্দ্রনীলে,
তন্দ্রা শিষ্ট শীৎকারে তাড়াই,

জরাযুক্ত খেদের নিখিলে
বিধাতার গৌরব বাড়াই।
দুরাশার তিক্ত মহাফলে
মৃৎসন্ততি মাতে দলে দলে —
এর তৃপ্তি, তাই বিলক্ষণ।
তত ক্ষণ তৃষ্ণাস্ফীত আমি,
সর্বেসর্বা নাস্তির প্রণামী
না যোগায় সত্তা যত ক্ষণ॥

— পোল ভালেরি

বাতায়ন

মৃতকল্প বৃদ্ধ যেন বকধর্মে হঠাৎ বিরূপ :
অরিষ্ট আতুরালয়ে, চেয়ে দেখে রিক্ত চূর্ণলেপে
ভিত্তিপাল বিগ্রহের নিরাগ্রহ ; অনির্বাণ ধূপ
জাগায় বিমুখ গতি আজ তার পঙ্গু পদক্ষেপে॥

শটিত শরীরে রৌদ্র পোয়াতে সে দাঁড়ায় না এসে
কাচের কপাটে ; শীর্ণ, শুভ্রকেশ, তাকায় কেবল
বাহিরে, পাষাণ যেথা হিরণ্ময় সূর্যের প্রবেশে,
এবং বিক্ষিপ্ত বিম্বে বাতায়ন পর্যন্ত পিঙ্গল॥

জ্বরে দগ্ধ ওষ্ঠাধরে আকাশের ইন্দ্রনীল ক্ষুধা,
সে ক্লিন্ন চুম্বন আঁকে গবাক্ষের কবোষ্ণ কনকে,
একদা যৌবনে যথা খুঁজেছিল অনাবিল সুধা
লালায়িত তার মুখ প্রাণাধিক কুমারীর ত্বকে॥

মাদকে সে উজ্জীবিত, অচিরাৎ ভোলে বিভীষিকা —
আরতির ঘৃত, ঘড়ি, রোগশয্যা, কাসি ও পাঁচন ;

সন্ধ্যার শোণিতে স্নাত নগরীর যত অট্টালিকা
পেরিয়ে, আলোর ভারে থেমে যায় দিগন্তে নয়ন ॥

সেখানে নদীর জলে সুরভির বেগুনী উচ্ছ্বাস ;
মরালপঙ্‌ক্তির মতো অভিরাম হৈম নৌবহর,
স্বপ্নে দুলে দুলে, সাধে বক্র সীমারেখার সমাস ;
বিলায় স্বরাট্ স্মৃতি আলস্যের প্রকাণ্ড প্রহর ॥

প্রাগুক্ত মুমূর্ষু আমি, রুগ্‌ণ দেহে বিতৃষ্ণার বিষ ;
অসাড় আমার আত্মা সংসারীর পঙ্কমূল সুখে ,
উদরপূজার পরে যোগাই না উদ্‌বৃত্ত পুরীষ
স্তন্যজীবী সন্ততির অন্নজীবী জননীর মুখে ॥

তাই পলাতক আমি, জানালায় জানালায় ঝুলি,
দিনগত পাপক্ষয়ে নিত্য করি পৃষ্ঠপ্রদর্শন :
শিশিরনিষিক্ত কাচে অঙ্গনার চম্পক অঙ্গুলি,
আশিস্ জানিয়ে, লেখে অসীমের ইষ্ট নিমন্ত্রণ ॥

নিজেকে দেবতা-রূপে চিনি আমি সে-মায়ামুকুরে –
হোক কলাকৌশলে বা মন্ত্রবলে, ম'রে, বেঁচে উঠি,
আকাশকুসুমে গাঁথি জয়মাল্য, অবারিত দূরে,
মাধুর্যের জন্মভূমি যেখানে, সে-প্রত্ন তীর্থে ছুটি ॥

কিন্তু সর্বেসর্বা, হায়, ইহলোকই । তার গৈবী হানা
এ-নিশ্চিন্ত আশ্রয়েও থেকে থেকে ধরায় অরুচি :
নীলিমানিবদ্ধ চোখে অধরার নিশ্চিত ঠিকানা,
পাশব উদ্‌গার নাকে, মর্ত্যলোক দুর্গন্ধে অশুচি ॥

হা, রে তিক্ত অভিমান, সত্যিই কি সম্ভব নিস্তার –
পিশাচলাঞ্ছিত ব'লে, কৈলাসের অস্তিত্ব না রাখা,

অক্ষুরন্ত অধঃপাতে মাপা মহাশূন্যের বিস্তার,
নিখিল নাস্তিতে ওড়া, মেলে পুষ্পবিরহিত পাখা ?

— স্তেফান্ মালার্মে

আদি রচনা : ১৭ জানুআরি ১৯৩২
পরিমার্জনা : ২৩ জুন ১৯৫৪

উজ্জীবন

প্রশান্ত শিল্পের স্রষ্টা, প্রসাদের প্রতিমূর্তি শীত
অসুস্থ বসন্তে আজ বিতাড়িত খিন্ন নির্বাসনে :
জড় স্তূপে আলস্য ভাঙে ক্লৈব্য পুন সত্তার গহনে,
যেখানে নির্বাহকর্তা শোকাবহ আমার শোণিত ॥

ধাতব চৈত্যের মতো, করোটির অবরোধে যেন
সহসা প্রবেশ করে ঈষতুষ্ণ ধবল প্রত্যূষ :
স্বপ্নসুন্দরীর ডাকে নিরুদ্দেশ বিষাদে পৌরুষ :
বিপুল বীর্যের হর্ষে চমৎকৃত অপর্ণ উদ্যানও ॥

পাদপের গন্ধোচ্ছ্বাসে অনন্তর বিভ্রান্ত, ব্যাকুল,
শষ্পে মেলে দিই দেহ কল্পনার সমাধিপত্তনে,
দাঁতে কাটি তপ্ত মাটি, ভুঁইচাঁপা যেখানে প্রতুল,

সর্বনাশে ডুবে যাই নির্বেদের পুনরুন্নয়নে…
সংবদ্ধ গুল্মের ঊর্ধ্বে ইতিমধ্যে শূন্য প্রভাস্বর,
বিহঙ্গবিকচ রৌদ্র নীলিমার হাসিতে মুখর ॥

— স্তেফান্ মালার্মে

আদি রচনা : ১৩ জানুআরি ১৯৩২
পরিমার্জনা : ১০ অগস্ট ১৯৫৩

উৎকণ্ঠা

সমগ্র জাতির পাপ সংক্রান্ত যে-জান্তব শরীরে,
তার নৈশ বলিদানে আজ আমি নই উপনীত ;
জাগাবে না ক্ষুব্ধ ঝড় অপবিত্র কেশের গভীরে
আমার চুম্বন, যাতে দুরারোগ্য নির্বেদ নিহিত ॥

নিবিড়, নিশ্চিন্ত নিদ্রা খুঁজি আমি তোমার শয়নে,
অনস্তাপ প্রাবরণে নির্বাণের শান্ত অবরোহ ।
ফুরালে মিথ্যার পালা, রক্ষা পাও তুমি যে-অয়নে,
নিত্য সে-নিখিল নাস্তি ; তার পাশে মৃত্যুও সম্মোহ ॥

আমিও, তোমার মতো, অভিগ্রস্ত ব্যাপক কলুষে,
অনুর্বর, বীতস্বত্ব সৌজাত্যের মৌল মর্যাদায় ,
পাষাণহৃদয় তুমি পক্ষান্তরে যেহেতু স্বেচ্ছায়,

অক্ষত তোমার বক্ষ তাই অপরাধের অঙ্কুশে ।
আর আমি পরাজিত, প্রেতভয়ে পাণ্ডু, দ্রুতপদ,
ঘুমাতে পারি না একা, ভাবি শয্যা শবের প্রচ্ছদ ॥

— স্তেফান মালার্মে

আদি রচনা : ১২ জানুয়ারি ১৯২২
পরিমার্জনা : ১০ অগস্ট ১৯৫৩

নীলিমা

নিরপেক্ষ নীলিমার নির্বিকার, নির্মল বিদ্রূপ,
মদালস পুষ্প যেন, সাংঘাতিক সৌন্দর্য ছড়ায় :
অনর্থক বিড়ম্বনা অভিশপ্ত প্রতিভার যূপ,
যন্ত্রণার মরুপথে আমি কবি ছুটি নিরুপায় ॥

দুটি নিমীলিত নেত্রে ; তবু বেঁধে নিষ্কবচ বুকে
লক্ষ্যভেদী দৃষ্টি তার, রুদ্র অনুশোচনার মতো।
কোথায় লুকাব এই নিদারুণ অবজ্ঞার মুখে,
রুষ্ট তম, অন্ধ তম, পুঞ্জ পুঞ্জ, সমুখ, বিতত ?

মাথা তোলো, কুজ্ঝটিকা , মেলো শূন্যে মলিন চীবর ;
ঝরো, পরিকীর্ণ করো বিরঞ্জন বিভূতির কণা :
ডুবুক সে-পাংশুস্তূপে হেমন্তের রসস্থ প্রান্তর ;
অচিরে সমাধা হোক নৈঃশব্দ্যের মণ্ডপ-রচনা।

বৈতরণী পঙ্ক ছেড়ে, উঠে এসো তুমিও, নির্বেদ ;
দু হাতে কুড়িয়ে আনো বর্ণচোরা শৈবাল, কর্দম :
শতচ্ছিদ্র নভস্তলে লেপে দাও স্তরে স্তরে ক্লেদ,
পায় না প্রবেশপথ আর যাতে দুষ্ট বিহঙ্গম।

পুনর্বার লুপ্তপ্রায় বাষ্পোচ্ছ্বাসে বিষণ্ণ সরণী ;
কজ্জলীর কারাগার দিগ্বিজয়ে বদ্ধপরিকর ;
বীভৎসের অবরোধে ম্রিয়মাণ পীত দিনমণি ;
আসন্ন অনাদি অমা ; নির্বাপিত নক্ষত্রনিকর।

ম'রে গেছে মহাকাশ। চাই আমি তোমাতে আশ্রয় ;
আমাকে ভোলাও, জড়, নিষ্করুণ আদর্শ ও পাপ।
যে-গড্ডলিকার স্রোতে মানুষের আত্মপরিচয়
নিশ্চিহ্ন, পাতুক তাতে শেষ শয্যা আমার সন্তাপ।

কারণ প্রাচীরমূলে অধোমুখ বর্ণভাণ্ড-বৎ,
নিরিক্ত আমার মর্ম ; অন্তর্যামী আর রূপে, রসে
সাজাবে না কোনও দিন ক্রন্দসীর মৌন মনোরথ ;
তাই খুঁজি বিস্মরণ মরণের জৃম্ভিত রহসে।

বৃথা অব্যাহতিভিক্ষা। নীলিমাই আবার বিজয়ী ;
উন্মুখর তারই মন্ত্র মন্দিরের জীবন্ত ঘণ্টায় ;
কানে কাংস্য প্রতিধ্বনি ; অপূর্বের সুস্নিগ্ধ মাভৈ
অন্তরিত অকস্মাৎ হৃদয়ের ক্ষিপ্র উৎকণ্ঠায় ॥

কুয়াশার অন্তরালে চক্রবর্তী, প্রাগৈতিহাসিক,
সে মাপে আমার মৌন বিবিক্তির কণ্টকিত সীমা।
কোথায় পালিয়ে বাঁচি ? বিদ্রোহ কি সর্বত্র ধার্মিক ?
নীলিমানিমগ্ন আমি, চতুর্দিকে নীলিমা, নীলিমা ॥

—স্তেফান্ মালার্মে

আদি রচনা : ১৬ জানুআরি ১৯৩২
পরিমার্জনা : ১৯ জুন ১৯৭৪

সমুদ্রসমীর

দেহ দুঃখময়, হায়! সব শাস্ত্র করেছি নিঃশেষ।
উড়ে যাওয়া বহু দূরে! জানি মহাকাশের আবেশ,
সিন্ধুর অচেনা ফেনা আপ্ত ব'লে বলাকা মাতাল!
কিছু নেই : যেমন প্রাচীন কুঞ্জ, চোখের দুলাল,
আমার সমুদ্রমগ্ন হৃদয়ের উদ্ধারে অক্ষম,
হে শর্বরী, রিক্ত কাগজের শুক্ল স্বগত সংযম
বিবিক্ত প্রদীপে, তথা স্তন্যদায়ী যুবতী তেমনই!
প্রস্থানে প্রস্তুত আমি! দোলা লাগে মাস্তুলে ; তরণী,
উঠাও নোঙর, চলো পরকীয়া প্রকৃতির খোঁজে!
নির্বেদ যদিও নিঃস্ব, প্রত্যাশার দশচক্রে ম'জে,
রুমালী বিদায়ে তার আস্থা তবু হয়নি নির্মূল!
এবং ঝড়কে ডাকে জাতিস্মর ওই যে মাস্তুল,
হাওয়ার দমক ওকে হয়তো বা নোয়াবে আবার
সে-অগাধে, যার কোলে খানখান নৌকার কাতার,

মাস্তুল ঘুচিয়ে, আসে. ভোলে কামদ্বীপের প্রশ্রয়…
কিন্তু নাবিকের গান কী মধুর সেখানে, হৃদয় !

— স্তেফান্ মালার্মে

১৪ অগস্ট ১৯৫৩

[illegible]নের দিবাস্বপ্ন

ওই অপ্সরীরা, মন চায় ওদের চিরায়ু দিতে ।

কী স্বচ্ছ ওদের কান্তি, আবহের পুঞ্জিত গ্লানিতে
ভাসে যেন উর্ণাজাল ।

ভালোবেসেছিলুম তবে কি
স্বপ্নকেই ?

প্রতর্ক. প্রাক্তন রাত্রি, সাঙ্গপ্রায়, দেখি,
সূক্ষ্ম শাখা-প্রশাখায়, অবশিষ্ট বাস্তব বনানী
জানায় নির্জনে যাকে জয়শ্রীর অর্ঘ্য ব'লে মানি,
তার আখ্যা অনুরাগ গোলাপের স্বভাবদোষেই ।

তবু ধরো…

সে-বরকিশোরীদের পরিচয় এই
হয় যদি যে তারা তোমারই ইন্দ্রিয়ের অভিজ্ঞান
পরিণত সচিত্র পুরাণে ! বিনির্গত ওই ধ্যান
আপাতকুমারী প্রথমার, সাশ্রু নির্ঝরের মতো,
ইন্দ্রনীল, হিম নেত্র থেকে : পক্ষান্তরে ক্রমাগত
দীর্ঘশ্বাসে দ্বিতীয়া কি স্মরণে আনে না দ্বিপ্রহরে
উত্তপ্ত হাওয়ার স্পর্শ রোমশ শরীরে ! কিন্তু জরে

মূর্ছাপন্ন স্নিগ্ধ অহনার পরাবর্তী চেতনাকে
পিষে পিষে মারে যে-নিস্তব্ধ অবসাদ, সে-বিপাকে
আমার বাঁশিই শুক কুঞ্জে ধ্রুব সুর ঢালে ; আর
একমাত্র বায়ু রেখারিক্ত চক্রবালে প্রেরণার
প্রকট, কপট, শান্ত প্রাণ, যা আমার বেণুরবে
প্রত্যুৎপন্ন, পরিকীর্ণ নির্জলা বৃষ্টিতে, তথা নভে
অধুনা পুনরারূঢ় ।

সিসিলির নিস্তরঙ্গ হ্রদ,
যার তটে তটে আমি সবিতার প্রতিযোগী মদ
ধর্ষণে করেছি ব্যয়, হতবাক্ তুমি বিকসিত
স্ফুলিঙ্গের নিচে, বলো, "এখানেই ছিলুম ব্যাপৃত
"আমি প্রতিভাপালিত, ফাঁপা নল কাটায়, যখন
"দূরের শ্যামল উৎসে সমর্পিত দ্রাক্ষার হিরণ
"জন্তুনিভ শুভ্রতার অবিচল ঊর্মিতে উতলা
"হয়েছিল আচম্বিতে : কিন্তু যেই বাঁশরীর গলা
"ফুটেছিল বিলম্বিত আলাপে, অমনই পাথসাটে
"মরালের ঝাঁক শূন্যে মিশে গিয়েছিল, না বিরাটে
"জলকন্যকারা ফিরেছিল ডুব সাঁতারেই···"

জ্বলে

জড়জগৎ প্রখর প্রহরের তাম্র তাপে : স্থলে,
জলে, অন্তরীক্ষে অপর্যাপ্ত সেই কৌমার্যের লেশ
নেই, এমনকি নেই শিঞ্জসার সে-ষড়জের রেশ,
যার অনুসন্ধানেই পলাতকাদের রূপকার
হারিয়ে ফেলেছে আজ ; আদি উন্মাদনায় আবার
নিজেকে জাগিয়ে তবে, পুরাতন আলোকের বানে
দাঁড়াব একেলা, ঋজু, হে পদ্মিনী, অপাপের ভানে
তোমাদেরই অন্যতম ।

যে-মূক চুম্বনে থেমে যায়

অমুলাপী অধরের প্রলাপরটনা, স্বস্তি পায়
বিশ্বাসহন্ত্রীরা, ততোধিক রহস্যনিগূঢ় ক্ষত —
অমর্ত্য দন্তের সাক্ষ্য — অথচ আমার অনাহত
বক্ষে স্বাক্ষরিত ; কিন্তু থাক বাক্যব্যয় ! সমুদায়
যুগল বেতসই শুধু হেন মন্ত্রগুপ্তির আধার :
নিবিবিক্তির মর্মবাণী, পরিণত তারই দীর্ঘ স্বরে,
নীলিমাকে স্বধর্ম ভোলায় ; প্রতিবেশে যায় দূরে
রূপসীর মায়া, আত্মগত সংগীতের নায়িকা সে
ভাবে আপনাকে, যদিও প্রকৃতপক্ষে, প্রতিভাসে
প্রত্যঙ্গ উরুর কিংবা পৃষ্ঠাদির রূপান্তর ক'রে,
বিভ্রষ্টের অস্থায়ী-অপ্সরা যেমন অমর ম'রে,
তাকে মেনে সাধক তেমনই একতান ওংকারের
প্রতিধ্বনিপ্রহত অভাব ॥

তবে ফুটে ওঠো ফের,

হে যন্ত্রস্থ পলায়ন, পিশুন সিরিংস্, পুনরায়
স্ফূর্তির প্রয়াদ পাও ইতস্তত বিতত জলায়,
যেথা তুমি আমারই প্রতীক্ষা-রত ! আমি জনরবে
অলক্ষিত, কাটাব অমেয় কাল দেবীদের স্তবে ;
কৃতবিদ্য প্রতিমাপূজায়, একাধিক বৈদেহীর
মেখলা খসাব ; যেমন সন্তাপ ভুলে আমদির
বিবর্তবাদেই, আঙুরের শোষিতপ্রসাদ ত্বকে
ফুৎকার ভরেছি, এবং প্রচুর হেসে, অপলকে,
মাতাল তৃষ্ণায়, সারা বেলা তাকিয়ে থেকেছি, তুলে
ধ'রে মহাকাশে ভাস্বর নির্মোক ॥

স্মৃতির পুতুলে

এসো, হে অপ্সরীবৃন্দ, প্রাণবায়ু ফুঁকি । "নলবন
"চিরে চিরে, আমার চাহনি বিঁধেছিল অতুলন

"তাদের গ্রীবায়, যার জ্বালানিবারণে দিগ্বধূর
"দল ঝাঁপ দিয়েছিল সংগীতে, নির্লিপ্ত, নিষ্ঠুর
"শূন্যে আরণ্যক আর্তনাদ হেনে ; এবং অচিরে
"কুন্তলের মুক্ত ধারা হীরকের মথিত মির্মিরে
"বিভাব হারিয়েছিল ! আমি ছুটেছিলুম সে-দিকে ;
"কিন্তু পা, উচট লেগে, থেমেছিল যেখানে, সখীকে
"বাহুক্ষেপে বেঁধে, সখী (সম্ভাবিত অনেকো আহত)
"অঘোরে ঘুমিয়েছিল। আনিনি বিয়োগ করগত
"সে-অন্বেষতে ; ছায়াবিড়ম্বিত এক গোলাপবিতানে
"নিয়ে এসেছিলুম তাদের, যাতে দিনশেষে টানে
"বীতগন্ধ ফুলের মতোই, আমাদের উচ্ছ্বসিত
"রতিপরিমল উবে যায় দিবাশেষে।" বলাৎকৃত
কুমারীর ক্রোধ, উলঙ্গিনী উন্মত্ত বতাসে শুচি
পিপাসিত অধরের তপ্ত স্পর্শে যেন বরকাঁচ
বিদ্যুতের স্খলিত বিলাস, ভালোবাসি, ভালোবাসি
আমি আতঙ্কের সংবৃতি শরীরে — হোক তা উদাসী
প্রথমার পদান্তে বা দ্বিতীয়ার সকণ্টক বুকে :
উভয়ে সমান তারা নষ্ট অনভিজ্ঞার অসুখে,
একজন আত্মহারা যদিচ ক্রন্দনে ও অপরে
মাত্র বাষ্পাকুল। "আমার মহাপরাধ, দৈব বরে
"যে-চুম্বন একাকার তথা আলুথালু, জয়োল্লাসে —
"যেহেতু তাদের ভয় ভেঙেছিল আমারই প্রয়াসে —
"সে-সহযোগের জোট আমি চেয়েছিলুম ছাড়াতে।
"কারণ উদ্দীপ্তকাম জ্যেষ্ঠার সংক্রাম কনিষ্ঠাতে
"দেখা দূরে থাক, অগ্রবর্তিনীর গভীর আহ্লাদে
"যেই নিবাতে গেলুম আমার দীপক হাসি, সাধে
"আর সাধ্যে তৎক্ষণাৎ বিবাদ বাধাল বিধি : শ্বেত
"পালকের মতো অলজ্জ, সরল অনুজা সংকেত
"থেকে পলাল সে-সুযোগে, আমার অঙ্গুলি ছিনিয়ে ;

"সঙ্গে সঙ্গে, শঙ্খেদ নির্বন্ধে কান পর্যন্ত না দিয়ে,
"কৃতজ্ঞ শিকার শৃঙ্খল শিথিল কর্তায়েব।"

যাক

যা যাবার; অনাগত সুন্দরীরা ভরাবে এ-ফাঁক,
জড়িয়ে আমার শৃঙ্গে কেশপাশ, আরামে ভরাবে:
'স্বসমুখ আদিরসে অলিদের মুখর করাবে
আমার বাসনা—স্ফুট, নীলারুণ, সুপক্ব ডালিম;
এবং যে-পরিপ্লুতি আমাদের শিরায় রক্তিম,
তার নিত্য নির্বিশেষে ধার্য নয় কে বসন্তসেনা।
কুঞ্জকে ছোপায় যবে ধূসরিত গোধূলির হেনা,
তোমার উৎসব, এট্না, নির্বাপিত পাতায় পাতায়
অন্তরিত হয় সে-সময়ে, আসে অমায়িক পায়ে
স্বয়ং ভীনাস, পেরিয়ে লাভার প্রস্থ, অকস্মাৎ
নীরবের বজ্রনাদে ঘটে খিন্ন বহ্নির নিপাত।
ধরি ভুজে অপ্সরীরাজ্ঞীকে।

হা, শাস্তি অনপনেয়...

কিন্তু বাক্যবিমুক্ত হৃদয়, তথা গুরুভার দেহ,
হার মানে শেষে মধ্যাহ্নের উদ্ধত মৌনের কাছে:
আর নয় দেবনিন্দা; স্মরণের আনাচে-কানাচে
তন্দ্রা জমে; পাতি শয্যা তবে রুক্ষ বালুতে এ-বার,
এবং সুরার জন্মপত্রে যে-গ্রহ প্রবল, তার
নিচে শুই, যথারীতি মুখ খুলে!

যমলা, বিদায়!
আমাকে সে-ছায়া ডাকে, তোমাদের লুপ্তি যে-দ্বিধায়।

—স্তেফান্ মালার্মে

২৩ অগস্ট ১৯৫৩

অর্ধছাগ, অর্ধদেবতা, রোমক পুরাণের ফন্, ভারতীয় কিন্নরদের মতোই, সংগীত-বিলাসী। কিন্তু তারা গায়ক নয়, বেণুবাদক; এবং হয়তো তাই, যেমন আমাদের মুরলীধর, তারাও তেমনই লাম্পট্যের প্রতিমূর্তি। কারণ তাদের অগ্রনায়ক প্যান্-এর অনুধাবন থেকে বাঁচার অন্য পথ না পেয়ে, সিরিংস্-নামক অপ্সরী একদা বেতসের রূপ ধরেছিল; এবং উক্ত নলেই ফন্-সম্রাটের প্রথম বাঁশি নির্মিত। অবশ্য মালার্মে-র মৃত্যু মনোবিকলনের প্রাগ্বর্তী। তাহলেও অলোকসামান্য অনুব্যবসায়ের আশীর্বাদে তিনি প্রায় এক শতাব্দী আগে—যখন তাঁর বয়স ছিল পঁচিশের নিচে, তখন—অনুমান করেছিলেন যে সৌন্দর্য-বোধ রিরংসার উদ্গতিমাত্র; এবং সেই জন্যে ফন্-এর দিবাস্বপ্নে প্রত্যক্ষ উরু ও পৃষ্ঠ ধ্বনিসর্বস্ব কবিতার একতাল ওংকারে পরিণত। নন্দনতত্ত্বের আর কোনও ব্যাখ্যায় আস্থা রাখলে, শোষিত আঙুরের নির্মোকে ফুৎকার ভ'রে, সারা দিন সে-ভাস্বর গুচ্ছের দিকে তাকিয়ে, তৃষ্ণানিবারণ তার সাধ্যে কুলত না; এবং বৌদ্ধ না হয়েও, সে কায়মনোবাক্যে মন্ময় শূন্যবাদ মেনে নিয়েছিল ব'লেই, সন্ধ্যার তন্দ্রাবেশেও তার আত্মশ্লাঘা ফুরয়নি, তার সর্বশক্তিমান অহংকারের অগ্নিগিরি ভীনাস্-কে গ'ড়ে, আবার আপনার বজ্রনির্ঘোষ মৌনে তলিয়ে গিয়েছিল। নায়িকাযুগলের প্রসঙ্গেও অনুরূপ মন্তব্য সম্ভব, এবং পৃথকভাবে তাদের মধ্যে বাঁশরী ও প্রেরণা, বেদনা ও ভাবনা, ইত্যাদির যোগাযোগ দেখি বা না দেখি, প্রাকৃত অদ্বৈতের ব্যবচ্ছেদই নায়কের স্বীকৃত মহাপরাধ।

পক্ষান্তরে মালার্মে প্রতীকী কাব্যের পুরোধা; এবং প্রতীকের সঙ্গে রূপকের প্রভেদ আকাশ-পাতালের চেয়েও বেশী। অর্থাৎ প্রতীক স্বতঃসিদ্ধ রূপের কৈবল্য আর রূপক ময়ূরপুচ্ছধারী দাঁড়কাক; এবং মালার্মে কবিতাকে রিক্তগর্ভ সংগীতের মর্যাদা দিয়েই থামেননি, পাশ্চাত্ত্য সংগীতের বিশেষ বর্ণমালা কাব্যরচনায় অনুকরণীয় নয় ব'লে, তিনি একাধিক বার আক্ষেপ করেছিলেন। উপরন্তু তিনি জানতেন যে সমসাময়িকদের মধ্যে তিনিই একমাত্র শুদ্ধ কবি; এবং আজীবন তিনি যেহেতু অধ্যাপনার দ্বারা অগত্যা গ্রাসাচ্ছাদনের দাবি মিটিয়েছিলেন, তাই বোধহয় লোকশিক্ষার নামে তাঁর গায়ে জ্বর আসত। অবশ্য গদ্য টীকায় কবিতার মর্মোদ্ঘাটন যে পাপের পরাকাষ্ঠা, এ-বিশ্বাস তাঁর নয়, তাঁর অনামধন্য শিষ্য ভালেরি-র। কিন্তু তাঁর কাব্য নিকামত রহস্যঘন; এবং সেই

প্রাণস্বরূপ রহস্যের রক্ষায় তাঁর জটিল চিত্রকল্প অবিচ্ছেদ্য, তাঁর ভাষা ব্যঞ্জনামূলক শব্দের ধাতুগত প্রয়োগে দুরূহ, তাঁর অভিপ্রায়, ব্যাকরণ মানলেও, অন্বয়ের শাসন-মুক্ত। তৎসত্ত্বেও মনে রাখা দরকার যে অন্তত প্রথম সংস্করণে "ফন্-এর দিবাস্বপ্ন" আবৃত্তির জন্যে লিখিত; এবং জীবদ্দশায় সে-সাধ পূরতে না পেরে, কবি যদিও নিরন্তর সংশোধনে অভিনেয় কাহিনীকে শেষ পর্যন্ত ধের স্বগতোক্তির পর্যায়ে তুলেছিলেন, তবু যে-বৈনাশিক এ-নাটকের মুখ্য পাত্র, তার অনন্য নির্ভর ঘটনা-পরম্পরা, অথবা ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ—উজ্জ্বল ও অবশ্যস্বীকার্য হলেও, প্রতীক, যার ও-দিকে অনিশ্চয় আর এ-দিকে বেদনাপ্রভব কল্পনা।

অন্তত পক্ষে আমরা যারা দর্শক, উত্তমপুরুষের অন্তরলোকে আমাদের প্রবেশ স্বভাবত নিষিদ্ধ; এবং তার হাবভাবে দৃষ্টি রেখে, তথা উক্তিতে কান পেতে, যত রকম বিবরণ লেখা সম্ভব, তার একটা এই: ফন্-দের শ্রীক্ষেত্র সিসিলি-র এক উপবনে একজন মধ্যবয়সী ফন্, মধ্যাহ্ননিদ্রায় বিভোর হয়ে, দেখছিল অপ্সরীধর্ষণের সুখস্বপ্ন; কিন্তু দিনের তাপ বাড়তে, সে আর ঘুমতে পারলে না; এবং জাগতেই, তার চক্ষে পড়ল শূন্য কুঞ্জের বাস্তব ডালপালা। তখন যদিও না মেনে উপায় রইল না যে তন্দ্রা আসার আগে পারিপার্শ্বিক গোলাপের গন্ধ তার মানসে যে-আমোদ জাগিয়েছিল, তাতেই ফুটে উঠেছিল স্বপ্নান্ত বরমাল্যের আকাশকুসুম, তবু কল্পনা-বিলাসকে একেবারে অসার বলতে তার আত্মরতিতে বাধল; এবং ফলে, উৎপ্রেক্ষার চরমে পৌঁছে, সে ভাবতে চাইলে যে নিকটে কোনও নির্ঝরের শব্দ, বা শরীরে হাওয়ার তপ্ত স্পর্শ, নায়িকাযুগলকে মনে আনেনি, বরঞ্চ তাদের ভাবানুষঙ্গেই জলকল্লোল ও বায়ুহিল্লোলের উৎপত্তি। কিন্তু এ-বিশ্বাসও টিঁকল না—আবার চোখ মেলতেই, বোঝা গেল যে, সুন্দরীদ্বয় দূরে থাক, তার প্রতিবেশে জলহাওয়ার চিহ্নও নেই, রুক্ষ নাস্তিতে অভিব্যাপ্ত শুধু বাঁশির ধ্রুব সুর আর বাদকের দিব্য প্রেরণা, যা, কামিনী কেন, অপ্ ও মরুতের মতো আদিভূতেরও উদ্ভাবক। এমনকি, অমায়িক জেনে, দিগন্তের রৌদ্রবিকচ হ্রদে তাকাতেও, ভেসে উঠল কেবল অভিজ্ঞান; এবং সঙ্গে সঙ্গে অতলে তলাল সত্য-মিথ্যার ব্যাবহারিক ব্যাবর্ত।

কারণ সে যেমন না মেনে পারলে না যে সে আত্যন্ত একা, তেমনই বুকে দংশনের দাগকেও তার অস্বীকার্য ঠেকল; এবং তার পরে সে বুঝলে যে উভয় উপলব্ধি কার্যকারণের সূত্রে সংবদ্ধ। অর্থাৎ শিল্পসামগ্রী ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অভিজ্ঞতার নৈর্ব্যক্তিক অভিব্যক্তি; এবং যে-নির্মম অনুপ্রাণনায় রূপকারমাত্রেই নিঃস্ব,

তাতে সম্ভবত প্যান্-প্রপীড়িত সিরিংস্-এর অবরোহী অভিসম্পাত সক্রিয়। কিন্তু প্রকৃতির পরিহাস এমনই নিষ্ঠুর যে উক্ত আত্মবলিদানের দুঃখ প্রতিহিংসাপরায়ণ সিরিংস্-কেই নিবেদ্য। এবং হয়তো তাই, মুখে মাইডাস্-এর নাম না আনলেও, নায়ক ইঙ্গিতে সে-হতভাগ্যের উল্লেখ করেছে। অবশ্য ফ্রিজিয়া-রাজ, প্যান্-অ্যাপোলো-র সংগীত-প্রতিযোগে প্রথমের প্রতি পক্ষপাত দেখিয়ে, শেষোক্তের শাপে যে লম্বকর্ণ হয়েছিলেন, তা তিনি নিজে রটাননি; এবং তাঁর নাপিত সে-কথা শুনিয়েছিল কেবল মাটিকে। কিন্তু যত্নে বোজানো গর্তে ফুটে উঠেছিল বেতস; এবং হাওয়ার দৌত্যে রাজার লজ্জা পৌঁছেছিল প্রজার কানে। অতএব লোকাপবাদখণ্ডনের ব্যর্থ চেষ্টায় সময় না কাটিয়ে, ফন্ অতঃপর মন দিলে মানসীদের প্রকাশ্য বস্ত্রহরণে; এবং যখন বলাৎকারের সুযোগ এল, তখনও সে শিকারসমেত বনান্তরালে লুকল না, সাক্ষী ডাকলে দ্বিপ্রহরের সূর্যকে। সেই অবৈকল্য সত্ত্বেও, চূড়ান্ত সিদ্ধি কেন তার ভাগ্যে জুটল না, সে-প্রশ্নের উত্তর সে আপনার মধ্যেই পেলে, এবং মহাপাতকের প্রায়শ্চিত্তকল্পে যে-সোঽহংবাদে শেষ পর্যন্ত সে চোখ বুজলে, তার ভাষ্য লিখে গেছেন শংকরাচার্য।

অবশ্য অদ্বৈতবাদে মালার্মে-র গুরু শংকর নন, হেগেল্। কিন্তু অনেকে যেমন ভাবেন যে শংকর প্রচ্ছন্ন বৈনাশিক, তেমনই হেগেল্-এর বিচারে বিশুদ্ধ সত্তা আর নির্বিকার নাস্তি তুল্যমূল্য, এবং তাঁর শিষ্য মালার্মে-র কাছেও তাই একর্ষির হিরণ্ময় পাত্র মোহময়। তবে ক্রোচে-ও হেগেল্-পন্থী; এবং তিনি ভাব ও ভাষার প্রভেদ মানেননি। সুতরাং "ফন্-এর দিবাস্বপ্ন"-এ ঈশোপনিষদের রহস্যারোপ হাস্যকর; এবং হয়তো তার চেয়েও বেশী পণ্ডশ্রম উক্ত ফরাসী কবিতার বঙ্গানুবাদ। কারণ কবি হিসাবে মালার্মে শুধু বিভিন্ন, এমনকি বিপরীত, আবেগের আস্রবণ, অথবা অস্মোসিস্ ঘটিয়েই ক্ষান্ত নন, তাঁর নিরবচ্ছিন্ন চিত্রকল্প যে-রকম বহুলাঙ্গ বাক্যের মুখাপেক্ষী, তার অনুকরণ স্বভাবনির্গ্রন্থ বাংলায় একেবারে অসম্ভব; এবং স্বয়ং অলডাস হাক্স্‌লি বর্তমান কবিতার ইংরেজী তর্জমায় পরিবর্জন ও পরিবর্তন—এ-দুটো দোষের কোনওটা এড়িয়ে যেতে পারেননি। অবশ্য রজার ফ্রাই-এর অনুবাদ আক্ষরিক। কিন্তু শার্ল্ মোর-র টীকা-ব্যতিরেকে তা প্রায় অবোধ্য; এবং মোর আর মালার্মে-র শ্রেষ্ঠ জীবনীকার আঁরি মঁদর-এর মধ্যে একমাত্র যোগসূত্র বোধহয় অবিমিশ্র সমালোচনার প্রবর্তক আল্‌বের তিবোদে-র প্রতি তাঁদের গভীর অবজ্ঞা, যদিও

গুরুতত্ত্ব ভালেরি আবার শেষোক্তের পৃষ্ঠপোষক। পক্ষান্তরে, প্রতীক ব'লেই, মালার্মে-র কাব্য-সম্পর্কে নানা মুনির নানা মত অনিবার্য; এবং তিনি কার্যতও দেখিয়ে গেছেন যে কবির সঙ্গে যে-ফুলের কারবার, তার বর্ণ নেই, গন্ধ নেই, আকার নেই, আছে কেবল প্লেটো-পরিকল্পিত রূপ।

৭ সেপ্টেম্বর ১৯০৩

John Masefield

I have seen dawn and sunset on moors and windy hills (Beauty)

Twilight it is, and the far woods are dim, and the rooks cry and call (Twilight)

D. H. Lawrence

In front of the sombre mountains, a faint, lost ribbon of rainbow (On the Balcony)

C. Field

If any ask, "How looks the moon ?" (*from* Jalaluddin Rumi)

William Shakespeare

Who will believe my verse in time to come (Sonnet XVII)
Shall I compare thee to a summer's day (Sonnet XVIII)
Devouring Time, blunt thou the lion's paws (Sonnet XIX)
So is it not with me as with that muse (Sonnet XXI)
My glass shall not persuade me I am old (Sonnet XXII)
Weary with toil, I haste me to my bed (Sonnet XXVII)
When in disgrace with fortune and men's eyes (Sonnet XXIX)
When to the sessions of sweet silent thought (Sonnet XXX)
Thy bosom is endeared with all hearts (Sonnet XXXI
Full many a glorious morning have I seen (Sonnet XXXIII)
Why didst thou promise such a beauteous day (Sonnet XXXIV)
Like as the waves make towards the pebbled shore (Sonnet LX)
No longer mourn for me when I am dead (Sonnet LXXI)
That time of year thou mayst in me behold Sonnet LXXIII)
But be contented when that fell arrest (Sonnet LXXIV)
Or I shall live your epitaph to make Sonnet LXXXI)
Then hate me when thou wilt ; if ever, now (Sonnet XC)
To me, fair friend, you never can be old Sonnet CIV)
Not mine own fears, nor the prophetic soul (Sonnet CVII)
The expense of spirit in a waste of shame (Sonnet CXXIX)
My mistress' eyes are nothing like the sun (Sonnet CXXX)
When my love swears that she is made of truth (Sonnet CXXXVIII)
Poor soul, the centre of my sinful earth (Sonnet CXLVI)

Heinrich Heine

Wir sassen am Fischerhause (Die Heimkehr, VII)
Schlage die Trommel und fürchte dich nicht (Doktrin)
Wir seufzen nicht, das Aug ist trocken (Geheimnis)
Hat die Natur sich auch verschlechtert (Entartung)
Weil ich so ganz vorzüglich blitze (Wartet nur)
Du wirst in meinen Armen ruhn (Der Unglaubige)
Nichts ist vollkommen hier auf dieser Welt (Unvollkommenheit)
Die Geissblattlaube—Ein Sommerabend (Wiedersehen)

Heinrich Heine (*Continued*)

Verlorner Posten in dem Freiheitskriege (Enfant perdu)
Als die junge Rose blühte (Geträumtes Glück)
Das gelbe Laub erzittert (Der scheidende Sommer)
Es glänzt so schön die sinkende Sonne (Liebesverse Zweite Abteilung, X)
Ich bin nun fünfunddreissig Jahr alt (An Jenny)
Des Weibes Leib ist ein Gedicht (Das Hohelied)
Für eine Grille— keckes Wagen (Aus der Matratzengruft, I)
Glaube nicht, dass ich aus Dummheit (Celimene)

Johann Wolfgang von Goethe

Lass mein Aug' den abschied sagen (Der Abschied)
Nun verlass' ich diese Hutte (Die schone Nacht)

Paul Valéry

Parmi l'arbre, la brise berce (Ébauche d'un Serpent)

Stéphane Mallarmé

Las du triste hopital, et de l'encens fétide (Les Fenêtres)
Le printemps maladif a chassé tristement (Renouveau)
Je ne viens pas ce soir vaincre ton corps, ô bête (Angoisse)
De l'éternal azur la sereine ironie (L'Azure)
La chair est triste, helas ! et j'ai lu tous les livres (Brise Marine)
Ces nymphes, je les veux perpétuer (L'Aprés-Midi d'un Faune)

দশমী

অবনীভূষণ চট্টোপাধ্যায়

বন্ধুবরেষু—

প্রতীক্ষা

পাতী অরণ্যে কার পদপাত শুনি ?
জানি কোনও দিন ফিরবে না ফাল্গুনী :
তবে অঙ্গুলি উদ্যত কেন পলাশে ?
বনের বাহিরে ক্ষওয়া মাটি ধু ধু করে ;
নেই ফসলের দুরাশাও অন্তরে ;
যা ছিল বলার, কবে হয়ে গেছে বলা সে ।

মহাশূন্যের মৌনে পরিস্ফীত,
বিবিক্তি আজ বৈষ্ণবীবিরহিত ;
অধুনায় নিশ্চিহ্ন অতীত, আগামী ;
নাস্তিতে নেতি স্বতঃসিদ্ধ প্রমা,
সোঽহংবাদীর আর্তি আত্মোপমা,
অগতির গতি মনোরথ বৃথা লাগামই ।

আরও এক বার, হাজার বছর আগে,
বিপ্রলব্ধ আত্মা অস্তরাগে
খুঁজে পেয়েছিল উজ্জীবনের প্রেরণা ;
এবং আবার সহস্র বৎসর
পূরে আসে বটে, তবু মন্বন্তর
মানবেতিহাসে সর্বনাশেরই দেশনা ।

অন্তত এতে সন্দেহ নেই আর
অলাতচক্রে ঘুরে ঘুরে, সংসার
অনাদি অমাকে আনে আমাদের গোচরে ;
পুঞ্জ পুঞ্জ ব্যক্তির বুদ্বুদ,
সময়ের স্রোতে অচির, অকস্মাৎ,
মমতার জোট পাকায় এ-চরে, ও-চরে ।

অভাব হয়তো স্বভাবেরই অগ্রজ :
নিরবধি তাই প্রভাসে ফুরায় ব্রজ—

প্রতিজ্ঞা রাখে মরণ আতায় বদলে :
বিশৃঙ্খলার পরাকাষ্ঠায় স্থাণু,
পৃথিবী অনাথ : যথেচ্ছ পরমাণু ;
প্রগতিক শুধু কালভৈরব সদলে ॥

অতএব কারও পথ চেয়ে লাভ নেই :
অমোঘ নিধন শ্রেয় তো স্বধর্মেই ;
বিরূপ বিশ্বে মানুষ নিয়ত একাকী।
অনুমানে শুরু, সমাধা অনিশ্চয়ে,
জীবন পীড়িত প্রত্যয়ে প্রত্যয়ে :
তথাচ পাব না আমি আপনার দেখা কি ?

কলকাতা
২৭ জুলাই ১৯৩৪

নৌকাডুবি

শরতের সমারোহ প্রকাণ্ড প্রান্তরে :
চক্রবালে শুভ্র মেঘপাল
নিশ্চিন্তে বেড়ায় চ'রে ; কদাচিৎ খোঁড়ায় রাখাল
স্নিগ্ধ বনান্তরে ॥

খালি গোলাঘরে সারা, ভাঙা হাটে শুরু,
পায়ে-চলা পথে কে একাকী ?
দু চোখে সোনার স্বপ্ন ; পসরার ফাঁকি আর বাকী
সহসা অগুরু ॥

কিন্তু বেলা প'ড়ে আসে : দ্রুত ডুবে যায়
মহাশূন্যে মাঠের হরিৎ ;
নির্ভার আবহে স্ফূর্ত অন্তর্ভৌম অমার সরিৎ
পৃথিবী ডোবায় ॥

নৌবাহী অগত্যা পার ; অনন্ত সকল
মজ্জমান সাধের তরণী :
উত্তরল জলোচ্ছ্বাসে তাই তার সমগ্র ধরণী,
উদ্‌বৃত্ত মণ্ডল ।

অবশ্য অপ্রতিকার্য অন্তিম কুম্ভক .
অমূর্তার্থ নাস্তির কিনারা ,
বৈকল্যের ষড়যন্ত্রে তুল্যমূল্য তুঙ্গী ধ্রুবতারা
ও মগ্ন চুম্বক ।

তথাচ অভাবে যবে তলাবে নাবিক,
তখনই তো স্মৃতির বিদ্যুতে
পাবে সে নিজের দেখা, তার পরে মিশে আদিভূতে,
হবে স্বাভাবিক ॥

কলকাতা
১০ অক্টোবর ১৯৫৭

অগ্রহায়ণ

হেমন্তের বেলা প'ড়ে আসে :
ক্ষেতে ক্ষেতে ধান কাটা হ'য়ে গেছে সারা,
খামারে খামারে সোনা, ভারা ভারা খড় আশে, পাশে ,
স্তব্ধ ঘাট, রিক্ত বাট , একমাত্র তারা
অস্তমিত পাণ্ডুর আকাশে ॥

রহস্যের অনচ্ছ অভিধা
মুকুরিত সরোবরে ; হতবাক্ ক্রমে
প্রবিষ্ট নিবিড় ছায়া, বহিরঙ্গে বিশীর্ণ মসিদা ;
অবলুপ্ত জনপদ ইন্দ্রনীল ধূমে,
ঘরে ঘরে প্রদোষের দ্বিধা ।

শোধবোধ শূন্যে অবসিত :
নির্গত মেদের সঙ্গে নিষ্ক্রান্ত ক্ষমতা ;
পারিপার্শ্বিকের ক্লান্তি সর্বগাত শরীরে কষিত ;
নষ্ট নীড়ে বিবিক্ত সে, স্বগত মমতা,
অবকাশে নির্বেদ ঘনিত ।

ঘুম নেই তবু রুদ্ধ চোখে :
শিথিল সন্ধিতে জাড্য, ধমনীতে হিম ;
কিন্তু সে, এখনও অন্ধ অস্তমিত সূর্যের আলোকে,
বোঝে না স্বভাবদোষে রাত্রির কৃত্রিম
বররুচি অক্ষয় অশোকে ।

কলকাতা
২৩ জানুয়ারি ১৯৫৫

ভ্রষ্ট তরী

সহসা সবুজে আবীরের আভা লাগে,
মেঘের আড়ালে সূর্য অস্ত যায় :
নীলের বিকার ধূসর পূর্বভাগে ;
অলস সাগর, আকাশেও তার সায় ।

দূর দিগন্তে সংবৃত শর্বরী,
শুক্র শুদ্ধ এখনও দেয়নি দেখা :
নিরুদ্দেশের যাত্রী আমার তরী ;
নিরবলম্ব নিখিলে সে আজ একা ।

একদা কত কী ভয় করেছিল তাতে —
ঝড় ও বৃষ্টি, পর্বতপরিমাণ :
মহার্ণবের দারুণ ঝঞ্ঝাবাতে
কিঞ্চিৎও শেষে পায়নি পরিত্রাণ ।

মাস্তুল ডেকে এনেছিল অশনিকে,
পালে লেগেছিল কেবল ত্রাহিস্বর,
ভেঙেছিল হাল : সর্বনাশের দিকে
গতি হয়েছিল অবাধ অতঃপর ।

আপাতত তাকে নাচাতে পারে না আর
অপ্সরীদের নির্মম জলকেলি ;
সে বুঝেছে বৃথা অজানার অভিসার —
পাতকের দ্বারে জাতকের ঠেলাঠেলি ॥

দিনমানে তাই চতুর চিত্রভানু
ভোলায় না লঘু মরীচিকা-নির্মাণে :
অন্ধ আলোর পলাতক পরমাণু
অমারাতে তাকে ছায়াপথে মিছে টানে ॥

একা সে এখন, বাঁধা অধুনার তালে ;
ত্রিসীমায় নেই আদ্যন্তের দিশা :
চলচল জল সচল চক্রবালে ;
সন্ধিলগ্নে সংগত দিবা-নিশা ॥

এস্. এস্. ফ্লাইং ক্লাউড,
লোহিত সাগর
৩১ জানুয়ারি ১৯৭৬

তীর্থপরিক্রমা

এখনও গেল না ভোলা, যদিও এ-দেশ স্নিগ্ধ নয়
সুবর্ণধারায় : ভ্রাতৃরক্তে সিক্ত মাটি, তবু ক্ষয়
এবং পিপাসা এখানে সর্বতোব্যাপী ; অদ্রিলার
গিরি কদাচিৎ তুষারকিরীটী বটে, কিন্তু তার
সান্নিধ্যে প্রশান্তি নেই — যেন অতিজীবিত ক্ষত্রিয়,
বাহুবল গত জেনে, তপোবল সাধে, অম্বকীয়

প্রতিহিংসা শেষে যাতে অলিন্দ না থাকে ; তবু শিলা,
বালু শোষিত নদীর গর্তে বন্যার প্রত্যাশী ; নীলা
দিনে, হীরক নিশীথে—আতপে এই যা প্রকারভেদ,
বর্বর আকাশ নচেৎ নিরত নয়, অনির্বেদ,
তথা নির্বিকার ; এবং নগরে, গ্রামে, বাহিরে ও
ঘরে আরবেরই উত্তরাধিকার যেহেতু অজেয়,
তাই ঊষ্ণ অবিশ্বাসে উদ্বিগ্ন মানুষ, অহংকৃত
সৌজন্য সত্বেও, মৎসর অদৃষ্টবাদে, ব্যবস্থিত
অথচ উদ্দাম অস্থত সংসক্ত নৃত্যে ॥

লোকান্তরে

বুঝি, সম্ভবত অপর কল্পেও, পুষ্পিত প্রান্তরে
পেতেছিলুম আমরা যে-অস্থায়ী যৌবরাজ্য, তার
অধিষ্ঠাতারূপে ছিল প্রজ্ঞাপারমিতা ; কি প্রাকার,
কি পরিখা সে-রাষ্ট্রকে ঘেরেনি কখনও : মুক্ত পথে
ছায়াচ্ছন্ন ক্ষিতিজের ডাক, ঊর্ধ্বশ্বাস মনোরথে
অধিরূঢ় নিরস্ত্র এষণা, সহচর স্রোতস্বিনী
অভয়ে মুখর, আগন্তুক অগ্রবাসী, ও অগ্রণী
নিঃস্বও যেখানে, তার পরে দুর্বিষহ এ-মরুর
অন্ধ অবসাদ। কিন্তু চক্রচর কাল : সুরাসুর
বিশ্বে সমবল, সম্পূর্ণ পৃথিবী ঊষর, উর্বর
একাধারে, ধর্মে, কর্মে শুভাশুভ নিত্য নিরন্তর—
তা আমার সমবয়সীরা মানেনি, মানিনি আমি ;
ফলে আমাদের নিয়তি অগস্ত্যযাত্রা, অনুগামী
হত বা বিস্মৃত ফণিমনসার বনে। তবু বলি—
এখনও গেল না ভোলা : তীর্থরজে রক্তের অঞ্জলি ॥

এস্. এস্. ফ্লাইং ক্লাউড.
আরব্য সাগর
• ফেব্রুআরি ১৯৫৬

ভূমা

সবুজের স্বরগ্রাম ফাল্গুনের রৌদ্রে হিরণ্ময়,
সংগত সে-ঐকতানে অসম্পৃক্ত আমের মুকুল ;
হলুদে চিত্রিত লাল, জনপদবধূর দুকূল
সংবৃত রূপের সাক্ষ্য : অন্তরাত্মা পর্যন্ত তন্ময় ।

সে-চির মুহূর্ত এই, বিশ্বরূপ যার ব্যাত্ত মুখে,
যার সারথ্যে ও সখ্যে ক্লৈব্য থেকে মুক্ত ক্ষণবাদী :
শস্পশ্যাম কুরুক্ষেত্রে অবিচল নিত্যের সমাধি ;
অনুপূর্ব সম্রাটেরা ধূলিসাৎ তাল ঠুকে ঠুকে ।

পরিপূর্ণ বর্তমান : নাস্তি সুদ্ধ তার অংশভাক্ ;
ভূত অধুনার স্মৃতি, উপস্থিত স্বপ্ন ভবিষ্যৎ ;
পরিপ্রেক্ষিতের বশে অনেকান্ত প্রত্যক্ষ জগৎ ;
দেশান্তর ভাবচ্ছবি ; ক্রৌঞ্চ, কবি অভিন্ন, অবাক্ ।

তবু অনুশোচনায় কেন প্রতিধ্বনিত ক্রন্দসী ?
সূর্য আঁকে মরীচিকা ; মদস্রাবে মজ্জায় চন্দ্রমা ;
বিগত রশ্মির প্রেতে কণ্টকিত অসম্ভূত অমা ।
কী দেখে দিগন্তরালে ফিরে ফিরে আশ্লিষ্ট প্রেয়সী ?

শক্তির অব্যয়ীভাবে স্বস্থ নয় তবে কি সংসার ?
বিকারের উপরে কি বিনষ্টিও সৃষ্টির নিয়তি ?
আগামী ও অতীতের প্রতিযোগে মথিত সম্প্রতি
আপাতমধুর বিষ নিরন্তর করে কি উদ্‌গার ?

তাই কি নিমেষমাত্র সর্বময় সংবিদের আয়ু,
এবং কালের গতি প্লুত ব'লে, তাকে সে চেনে না ?
কিন্তু অবচেতনায় পরস্পর সম্ভোগের দেনা
স্বাক্ষরিত হতে থাকে : দায়ভাগী জাতিস্মর স্নায়ু ।

কলকাতা
১৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৬

উপস্থাপন

আমি ক্ষণবাদী : অর্থাৎ আমার মতে হয়ে যায়
নিমেষে ভামাদী আমাদের ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ, তথা
তাতে যার জ্ঞেয়, সে-সংসারও। অথচ সময় ভূত
থেকে ভবিষ্যতে ধাবমান নয় ; এবং যদি বা
তার সাক্ষ্য থাকে অন্ত্রে কি নাড়ীতে, তবু সে-নিভৃতে
হৃদয়বানের মতো, বুভুক্ষুও নিষিদ্ধপ্রবেশ।
অবশ্য বিজ্ঞানে বলে কালের উদ্দেশ সুপ্রকট
শৃঙ্খলার অব্যর্থ ও অভিব্যাপ্ত হ্রাসে ; এবং কে
আছে বিশ্বে যে অন্ধ বিশ্বাসে স্বীকার না ক'রে পারে
দিনগত পাপের স্বাক্ষরই মুদ্রাঙ্কিত তার মুখে,
ফেনিল শর্বরী অপসর্পের ভ্রমিভঙ্গে, অতিশ্রুতি
বিলাপ অভাবে, প্রেতের প্রভাবে ভটস্থ পৈতৃক
ভিটা ? তাহলেও উধাও লহমা কখনও চাক্ষুষ
নয়, মানুষের প্রমা পদরেখা পর্যন্ত, ফেরারী
কপোলকল্পনা কিংবা যুক্তি-তর্কে ভারী অনুমান ॥

তবে কেন ঠেলি সে-উজান, বিশেষত যাত্রাশেষে
স্বগত প্রত্যয়ই যখন অপেক্ষমাণ ? অধুনার
সাক্ষাৎ মাভৈ ঐকান্তিক বটে, কিন্তু বর্তমানে
দূর স'রে আসে যত সন্নিকটে, ইতিহাস প্রাণ
পায় ভাবচ্ছবিরূপে, অন্তরীক্ষ মণ্ডূকের কূপে
ঝাঁপ দেয়, আদায়ের সমে ফেরে জন্মান্তের ব্যয়।
এবং বিরহে কেন, মিলনেও, একান্তর ডেকে,
স্বাধিকারপ্রমত্তের অভিনয় শেখে ত্রিশঙ্কুর
বংশপরম্পরা : বসুন্ধরা আত্মপ্রদক্ষিণে রত
নিরালম্ব পায়ের তলায়, খমধ্যে অমরাবতী,
ভূমিকা বদলায় জাতিস্মর শূন্য পৃষ্ঠদেশে, ওঠে
ভেসে সম্মুখীন স্বচ্ছ মায়ামুকুরে বিভূতি– তারা

পরিনির্বাণে নৈঋতি আলায় একাদিক্রমে যাতে
না হারায় সাহারায় প্রবাসীর প্রতিগামী পথ।
সম্প্রতি সর্বতোভদ্র, পরিপূর্ণ প্রাকাম্যে জগৎ।

কলকাতা
৬ মার্চ ১৯৩৬

প্রত্যুত্তর

তাকে যখন বলি, "সুদূরে আর চোখ চলে না"; এখন আমি
শুদ্ধ কৃতাঞ্জলি, বর্তমানের প্রত্যাদেশে দিন সঁপেছি
যাতে ভূতের বেগার খাটতে না হয় রাতে," আপত্তি সে তোলে
তখন, "জোয়ার-ভাঁটার মতো, টান-যোগানের নিয়ম ওতপ্রোত
শিরায় শিরায়, জানি; কিন্তু ডাকায় কেবলই বান, পূর্ণিমা কি
অমোঘ দৈববাণী রটায় না সেই সঙ্গে হঠাৎ অবাক্ প্রাণে
প্রাণে? এবং যদি মানি কটাল আনে কাদার গাদাই, তবু
নিশ্চয়ই সে নেহাৎ জবুথবু, পাঁকের কাছে গচ্ছিত যে,
উৎস গেছে ভুলে, সমুদ্রকে ঠেকিয়েছে দিক্‌শূলে।" শুনি
এবং ভাবি, অতীত তথা অনাগতের দাবি অস্বীকৃত
নয় অধুনায়: মানসসরোবরে বিম্বিত যে-শ্যামল গিরি
এক সময়ে ছিল দেশান্তরে, বাদলে তার ধৌত মাটি
উপস্থিতের পলি; বনস্থলী উৎপাটিত সেখান থেকে,
কিন্তু এ-কর্দমে বিরাজমান নিত্য উপক্রমে; আছে,
তারাও সুপ্ত বীজের স্বপ্নে জেগে আছে, দেখতে চেয়েছিল
যারা কল্পতরুই উচ্চ ইতর গাছে। নৌকা অচল, মাঝি
বিকল, সম্প্রতি তাই ধ্যানে দিগ্বিজয়ী সে, আজ অভিজ্ঞানে
স্বয়ংবরের মাল্য পরায় শকুন্তলা তাকে; কিংবা ঢাকে
জননী সংবর্তে আবার, ফুরায় কলি আদিম অন্ধকারে,

আগামী কাল বিষাবশেষ শিশু পারাবারে ভেসে ওঠে।
তাকিয়ে থাকে পঙ্গু নাবিক ; ভূষণ্ডী কাক রক্তপক্ব খোঁটে ॥

চিত্তরঞ্জন
১১ মার্চ ১৯৫৩

অসংগতি

হঠাৎ শুনি মৌনে কানাকানি :
কোথায় যেন কিসের উপক্রম।
আরব্ধ কি আবার দৈববাণী,
এ-বারে আর ঘটবে না দিক্‌ভ্রম ?
অক্ষয় বট, জানি, আমায় দেয়নি শরণ :
অস্থায়ী নীড়, খড়কুটো তার উপকরণ ;
শুকনো শাখায় ঝুমকোলতার মোহাবরণ ;
আতুর ব'লেই, অলস বিহঙ্গম।
ভীষণ তবু ঝড়-বাদলের রিক্ত হানাহানি,
উৎপাটনের উগ্র উপক্রম ॥

সিন্ধু উতল পতনে, উত্থানে ;
দিগ্বিজয়ী নিরুদ্দেশে সারা ;
অভাবপ্রভব ভ্রমিই তাকে টানে ;
অস্তোদয়ের সাক্ষী একই তারা।
ক্রৌঞ্চপথেও কেবলই হিম এবং রোদন ;
স্থির মানসে অপচ্ছায়ার অনুমোদন—
ভুবনাভারে দুর্যোধনের হিংসাবোধন
আবিল করে বৈতরণীর ধারা।
পুনর্বাদী প্রাণপ্ররোহ রুদ্ধ গোরস্থানে :
স্ববাহুত শব্দভেদে সারা ॥

কৌতূহলের উন্মাদনা তবে
পঙ্গু পাখায় সঞ্চরমাণ কেন :
ম্লান সহসা দুঃস্থ অগৌরবে
বর্তমানের নিত্য অভিজ্ঞানও ?
অথচ আজ মজাতে চায় মরীচিকাই :
প্রবঞ্চনার পরিবর্তে প্রজ্ঞা বিকাই ;
কালির পোঁছে অনির্বচনীয় নিকাই ;
মিসরী বীজ জরায় মরুস্থানও।
অনপাস্য সম্ভাবনার বিকার অসম্ভবে :
পঙ্গু পাখা ব্যস্ত তবে কেন ?

কলকাতা
১৮ মার্চ ১৯৫৬

নষ্ট নীড়

কৃষ্ণচূড়া নিষেধে মাথা নাড়ে,
কুলায় খোঁজে শুক :
চৈত্রশেষ সূচিত হাড়ে হাড়ে,
সূর্য অধোমুখ।
কেবলই দূর মুখর তবু পবনে,
কোথায় যেন নিবিদ বনে ষবনে ;
চিরায়মাণ নির্বাপিত হবনে
কালের কৌতুক।
বিরত মহাশূন্য ওই গোধূলি ধীরে ঝাড়ে :
কৃষ্ণচূড়া তাড়ায়, ওড়ে শুক॥

কখন ওঠে, পাতালভেদ ক'রে,
অসম্বৃত অমা :

বায়ুর বেগ সহসা যায় থ'মে ;
রাত্রিরা নেয় শয্যা ।
জ্যোতির্গামী কিন্তু সেই ভ্রমণও,
তারার ফেনা-উৎসারিত ভ্রমণ ;
যৌনে পড়ে তীর্থামৃত পোষণও,
স্বয়ংবর প্রেমা ।
তাহলে কেন বিরহী শুক নিরুদ্দেশে ঘোরে,—
মজায় কাকে অনাত্মীয় জমা ?

কলকাতা
৩১ মার্চ ১৯৫৬

তন্বী

উৎসর্গ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শ্রীচরণে

অর্ঘ্য

ঋণশোধের জন্য নয় ঋণস্বীকারের জন্য

পরবর্তী কবিতাগুলোর উপরে স্বদেশী বিদেশী অনেক কবিই ছায়াপাত করেছেন —সব সময়ে গ্রন্থকারের সম্মতিক্রমে নয়। কেবল রবীন্দ্রনাথের ঋণ সর্বত্রই জ্ঞানকৃত। সত্য বলতে কি, সমস্ত বইখানা খুঁজে, যদি কোনওখানে কিছুমাত্র উৎকর্ষ মেলে, তবে তা রবীন্দ্রনাথের রচনারই অপহৃত ভগ্নাংশ ব'লে ধ'রে নেওয়া প্রায় নিরাপদ। তবু এই চুরির জন্যে আমি লজ্জিত নই, কেননা শুধু সুন্দরের মোহ যে-চোরকে পাপের পথে ডাকে, সে নিশ্চয়ই নীতিপরায়ণ নয়, কিন্তু রূপজ্ঞ বটে। ওই লুণ্ঠিত সম্পদের একটা বিস্তারিত তালিকা এইখানে দিতে পারলে, হয়তো, মহাবিদ্যার অপবাদটা অনেকখানি লঘু হত। কিন্তু সে-লোভ পরিহার করছি, কারণ পাঠকের বিদ্যাবুদ্ধির প্রতি আমার শ্রদ্ধা অগাধ। এই প্রসঙ্গে স্বর্গীয় আনাতোল ফ্রাঁসের উপদেশ উল্লেখযোগ্য। তিনি একবার এক কবিযশঃ-প্রার্থীকে বলেছিলেন, "পূর্বগামীর ঋণ কখনও স্বীকার কোরো না। সে-কৌশলে অধর্মের বোঝা তো তিলমাত্র কমবেই না, বরং হারাবে পাঠকের দরদ। পণ্ডিত ভাববে, তুমি করছ তার অখিল বিদ্যার প্রতি কটাক্ষ, মূর্খের মনে হবে তার অজ্ঞতা আর তোমার কাছে ঢাকা রইল না।" উপরন্তু আমার অনুতাপে পাঠকের কোনও দাবি নেই, তাতে যাঁর অধিকার, তাঁর ক্ষমায় কিছুতেই বঞ্চিত হব না।

এই পুস্তক-প্রকাশে বন্ধুবর অপূর্বকুমার চন্দ আমার বিশেষ সহায় ছিলেন। তাঁর নিঃস্বার্থ পরিশ্রম ও অহৈতুক উৎসাহ না পেলে বইখানা কখনও মুদ্রিত হত কিনা সন্দেহ। প্রুফশোধনের কার্যে শ্রদ্ধাস্পদ অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় তাঁর দুর্মূল্য সময় অকাতরে ব্যয় করেছেন ; এর জন্যে আমি তাঁর কাছে কী পরিমাণে উপকৃত, তা এখানে ব্যক্ত করা অসম্ভব। এই বিরক্তিকর ব্যাপারে প্রধান কর্মী ছিল আমার ভ্রাতা শ্রীমান্ হরীন্দ্রনাথ, কাজেই ছাপার ভুলের জন্যে আমার চেয়ে তার দায়িত্ব বেশী। এঁরা ছাড়া আরও যত বন্ধু আমায় সাহায্য করেছেন, তাঁদের নাম দিলুম না ব'লেই আমার কৃতজ্ঞতা অল্প নয়।

এই গ্রন্থের কয়েকটি কবিতা বিভিন্ন সময়ে কয়েকটি মাসিক-পত্রে বেরিয়েছিল। এই সুযোগে সম্পাদকদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। ইতি কলিকাতা, ৩১ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৭।

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ দত্ত

ভীরু সে যে।
জীবনের রুদ্র বহ্নি তাই কি নিভেছে
জ্বলে ক্ষুদ্র চক্ষুদীপে তার ?
জগতে যা হেয়,
নিতান্ত নশ্বর দীন তুচ্ছ অবজ্ঞেয়,
তাদের সবার
নিঃসার নির্যাসে রচা সে-তনুর কায়া।
তাই তার সংকুচিত ছায়া
রূপান্ধের দৃষ্টিপথে গর্বপুষ্ট মলিনতা ভরি,
ধরার অরূপ সিদ্ধি রাখে না আবরি।
নয় তার আশুতোষ ক্ষুধা
কখনও করে না দাবি অন্নদার অমরার সুধা ;
শুধু যাচে
পার্থিব সুরার ফেনা অপব্যয়ী বিলাসের কাছে।
সে জানে আপন সীমা,
তাই তার আশ্লেষের ক্ষীণাস্থি ভঙ্গিমা,
কালের কবল হতে কেড়ে,
পারে না, সাবিত্রীসম, রক্ষিতে প্রেমের কঙ্কালেরে ;
তাই তার ভীরু কণ্ঠস্বরে
পলাতক নির্ঝরিণী স্নিগ্ধ সুরে প্রতিধ্বনি করে ;
নিঃসঙ্গ পান্থেরে তাই ডাকি,
সে দেয় জড়ায়ে ভুজে আশুক্লান্ত কুসুমের রাখি
স্বয়ংবরা বসন্তসন্ধ্যায় ;
মুক্তধারা আনন্দের অলকনন্দায়
তাই সে চাহে না বাঁধিবারে
বৈরাগীর রুক্ষ জটে, শক্তির উদ্ধত অহংকারে।
সে যে অনামিকা
অনিত্যা মৃন্ময়ী অন্না, তবু তার রূপমরীচিকা
নিশ্চায় অমিত শূন্য মরুভূমিমাঝে
অন্তিম সম্বলসম দিশাহারা নয়নে বিরাজে।

৯ মার্চ ১৯৩০

নবীন লেখনী

অধুনা-আনীত নব অলিখিত
লেখনী মোর,
কি জানি কেমন ভাগ্যলিখন
আছে রে তোর !
মুখাগ্রে তোর ছুটিবে কি গান ?
পাবি লাঞ্ছনা ? মিলিবে কি মান ?
কোথা কবে হবে কাজের খতম,
নেশার ভোর,
জানি না, এই তো জাগিলি প্রথম,
লেখনী মোর !

ওরে অভিনব, চতুরালি তব
বচনাতীতে
পারিবে কি, হায়, আঁখির আগায়
আনিয়া দিতে ?
পরশে কি তোর, ইন্দ্রজালিক,
শূন্যে মিলাবে দানবী অলীক ?
পারিবি জাগাতে, মথি নিশ্চল
দিগন্তর,
বুদ্বুদসম তারামণ্ডল
নিরন্তর ?

তোর অন্তরে কভু কি শিহরে,
উঠিবে রণি
স্ফীত ধমনীর লহর অধীর
নাটনধ্বনি ?
তোরে দিয়ে কভু হবে কি রচনা
প্রণয়লিপির ব্যাকুল বচন ?

শত-যোজনের-আড়াল প্রিয়ার
কানের 'পর
পারিবি ঢালিতে আমার হিয়ার
তরল স্বর ?

হবে কি জরায় ধূলির ধরায়
যাত্রাশেষ,
অথবা অকালে জীবনসকালে
নিরুদ্দেশ ?
কি দিলে মিটিবে পিপাসা তোমার ?
চাও কি বুকের শোণিত আমার,
চাও কি বিনিদ রক্ত আঁখির
তিক্ত লোর,
গ্লানিকলঙ্ককালিমা নিবিড়
বড় কঠোর ?

ওরে অশান্ত নবীন পান্থ,
নেই কি জানা
অজ্ঞাত পথে খাদে পর্বতে
বিঘ্ন নানা ?
অশ্রুর নদী, শাসনের শিখা,
হিংসার বিষ, যশমরীচিকা,
ভুখারী দীনতা নির্ভরহৃতা
গমনচোর—
জেলে দিবে সহমরণের চিতা
তোর ও মোর ॥

১৫ মে ১৯২৬

শ্রাবণবন্যা

সংকীর্ণ দিগন্তচক্র ; অবলুপ্ত নিকট গগনে
পরিব্যাপ্ত পাংশুল সমতা ;
অবিশ্রান্ত অবিরল বক্র ধারা ঝরিছে সঘনে ;
ঢাকে বস্ত্র বিস্মৃতমমতা ;
প্লাবিত পথের পাশে আনত বঙ্কিম তরুবীথি
শিহরিছে প্রমত্ত ঝঞ্ঝায় ;
কাল আজি সংজ্ঞাহারা ; নিমজ্জিত প্রহরের স্মৃতি ;
ভেদ নাই উষায় সন্ধ্যায় ॥

পথস্থ কুটীরদ্বারে ভয়ে পান্থ নিয়েছে আশ্রয় ;
সিক্ত গাভী ছুটে চলে গোঠে ;
কপোত কুলায়ে কাঁপে ; দাতুরী নীরব হয়ে রয় ;
পুষ্পবুকে অশ্রু ভ'রে ওঠে ;
নিষিক্ত স্তব্ধতা ভেদি, প্রলয়ের হুংকার-রণনে,
পরিপ্লুত নদীর কল্লোলে,
উন্মাদ শ্রাবণবন্যা ছুটে আসে ভৈরব নিঃস্বনে,
অবরুদ্ধ পরানপল্বলে ॥

১৪ অগস্ট ১৯২৬

বর্ষার দিনে

মানসী আজ সম্মুখে মোর বসি,
চায় যদি মোর মুখে,
নয়নে তার সজল মেঘের মসি,
সমবেদন বুকে ;

সে যদি আজ বলে মলিন হেসে,
"বলো, পাগল, বলো,
কোন্ নিঠুরায় ব্যর্থ ভালোবেসে,
চক্ষু ছলছল ?
কে সে চরম, কে সে পরম, যারে
সদাই তুমি চাও ?
কাহার পূজার আয়োজনের ভারে
আকুল হয়ে যাও ?
একলা ব'সে গোপন বিনিদ রাতে,
গাঁথো যে-গীতহার,
রাঙিয়ে কুসুম হৃদয়শোণিতপাতে,
কণ্ঠে দেবে কার ?"
সে যদি আজ ব্যাকুল ভীত চোখে
খোঁজে আমার মুখ,
ব্যক্ত হবে মন্দাক্রান্তা শ্লোকে
আমার অনাম দুখ ॥

সকাল দুপুর সন্ধ্যা গেছে মিশে,
বর্ষাবিজন পথ ;
মেঘের মাঝে হারাল তার দিশে,
স্তব্ধ কালের রথ।
কৃষ্ণ রাতে লুব্ধসুধাভরা,
কঠিন আলিঙ্গনে
যেই বেদনা দলিত হয় ত্বরা
মাতাল মনের কোণে,
রক্ত রবি ভ্রূভঙ্গিমায় হরে
যাহার ইন্দ্রজাল,
সেই বেদনা নিবেদনের তরে
এই তো শুভকাল।

বৃষ্টিশীকরসিক্ত ঘরে মম
দিতেম না আজ আলো,
মুখের 'পরে, বুকের 'পরে মম
ছাইত ছায়া কালো ;
কিছুই নাহি দেখতে পেত প্রিয়া,
চাহি আমার পানে,
অশ্রু আমার, অনুভূতি দিয়া,
বুঝত প্রাণে প্রাণে ॥

কুটীর-পাশে, দীঘির 'পরে বারি
পড়ত ঝ'রে ঝ'রে,
নীরবতা নীরব হত, তারই
প্রতিশব্দে ম'রে।
আমার বিরল কম্র করুণ ভাষা
নম্র মূর্ছনাতে
থাকত মিশে, করত যাওয়া-আসা,
সে-মল্লারের সাথে।
হয়তো কভু শুনত না সে, কভু
হঠাৎ নিত শুনি,
আমার গোপন গানের টানে তবু
বইত স্বরধুনী।
থাকত বাকি প্রণয় জ্ঞাপন করা,
অধর খোঁজাখুঁজি,
প্রেমসাগরে তলিয়ে যেতেম মোরা,
মুগ্ধ নয়ন বুজি।
পৃথক্ মোদের করত জগৎ থেকে
জলের যবনিকা—
স্বপ্ন সে-সব। ঝঞ্ঝা ওঠে হেঁকে,
জ্বলে তড়িৎশিখা ॥

২০ জুলাই ১৯২৫

বাৎসরিক

আজি সন্ধ্যায় প্রাণ মন ধায়
অতীতপানে,
ব্যর্থমানস একটি বরষ
পিষে, মিশে, শেষ হল যে-খানে।
গতানুশোচনাধূসর আকাশে
স্মরণের ম্লান অরুণিমা ভাসে;
সিক্ত ধরার গন্ধোচ্ছ্বাসে
কী বেদনা জাগে প্রাণে!
চাহি অবিরত সাঙ্গ বিগত
বর্ষপানে॥

সে-দিন দীপালী যামিনীর কালি
মুছিয়া দিল;
অমৃতকণিকা বহিয়া, ক্ষণিকা
আশেপাশে যেন ভ্রমিতেছিল।
সৃজনপ্রাতের আদি ওংকার,
মদনধনুর শেষ টংকার
জীবনবীণায় দিল ঝংকার,
মৌনিতা মুখরিল।
কে যেন সোনার স্বর্গদুয়ার
খুলিয়া দিল॥

আবার, সজনী, শ্রাবণরজনী
এসেছে ঘুরে;
আবার দুরাশা বাসনা তিয়াসা
গমকে, চমকে মেঘের উরে।
আজিও তেমনই আলেয়া-আলোতে
অভিসারিকারা ছুটে পথে পথে;

অজানার বাঁশী নদীপার হতে,
ডাকিছে বিপুল স্বরে।
মেঘের মাদল বাজায়ে, বাদল
এসেছে ঘুরে॥

আজি তব তনু লাগে গুরু ভার
আমার কাছে;
শমিতবহ্নি পরশে তোমার
শিরায় শোণিত আর না নাচে।
আজি নিরর্থ প্রণয়ের ভাষ,
সে যেন ছলনা, মিছে পরিহাস;
শুষ্ক তোমার নয়ন উদাস
নীরবে ক্ষান্তি যাচে।
দুর্দম প্রীতি আজি শুধু স্মৃতি
মোদের কাছে॥

জাগো জাগো, সখী, শূন্যে নিরখি,
থেকো না শুধু;
এসো খুঁজি মোরা সে-রাতি মুখরা,
সে-দিনের সেই হারানো মধু।
আজিও, হয়তো, পরশমণিকা
নিয়ে, কাছে কাছে ভ্রমিছে ক্ষণিকা।
চূর্ণ মুঠিতে উজলি দীপিকা,
বলো গাঢ় স্বরে, "বঁধু।"
স্তিমিত নয়ানে অতীতের পানে
চেও না শুধু॥

মিছে প্রাণপণ, স্খলিত লগন
ফিরেছে কবে?
আজিকে প্রণয় মিছে অভিনয়,
পুরানো কাহিনী তুলে কি হবে?

ডাকে না মোদের অজানার বাঁশী ;
ফুলহীন মালা সুকঠিন ফাঁসি ;
দুয়ারে বিকট প্রদোষের হাসি ;
শুকতারা নিবে নভে ;
থেমে আসে গান ; নিমীল নয়ান ;
ঘুমাও তবে ॥

২৩ জুলাই ১৯২৫

পলাতকা

কী যেন হারায়ে গেছে জীবন হতে,
কী যে তা বুঝিবে কে বা কেমন মতে
শুধু জানি এইটুক,
কী এক বিপুল দুখ
ভ'রে দেছে সারা বুক গোপন ক্ষতে।
কী যেন হারায়ে গেছে জীবন হতে ॥

আজিও শ্রাবণ পুন এসেছে ফিরে,
ঘন শ্যাম সমারোহে গগন ঘিরে ;
জল হতে মাথা তুলে,
আউস হরষে দুলে ;
নদী, ভরা কূলে কূলে, গাহিছে ধীরে।
আজি তো শ্রাবণ পুন এসেছে ফিরে ॥

আজিও নিবিড় রাতে যাবে না চেনা
কদম যূথিকা চাঁপা বকুল হেনা।
পূবে হাওয়া মেতে আসে,
ভেজামাটিউচ্ছ্বাসে

ফোটা কুসুমের বাসে ভেদ রবে না।
ফুলেরে পৃথক্ ক'রে যাবে না চেনা॥

আজও চলে একা পথে অভিসারিকা,
দ্বিধাকম্পিত হাতে প্রদীপশিখা।
আকাশে বিজুলি হানে,
ত্রস্ত সলাজ প্রাণে
মুখে গুণ্ঠন টানে ভীরু বালিকা।
আজও চলে একা পথে অভিসারিকা॥

তুমিও সমুখে মম রয়েছ ব'সে:
শিহরিত তনু হতে আঁচল খসে,
শিথিল কবরী টুটি,
মুখে বুকে পড়ে লুটি,
আধোমুদা আঁখি দুটি মৃদু আলসে।
তুমিও সমুখে মম রয়েছ ব'সে॥

আমারও হৃদয় ভ'রে, তেমনই আজি,
প্রণয় গভীর স্বরে উঠিছে বাজি;
ব'সে আছি তব পায়
শরমের ছলনায়;
বচন না খুঁজে পায় আবেগরাজি।
প্রণয় হৃদয়ে বাজে গভীরে আজি॥

বিলীন আঁধারপুটে তোমার আঁখি,
স্বপন-আবেশ ছুটে, যখনই ডাকি।
তনুভরা শিথিলতা
কহে কথা, কত কথা;
বুঝিয়াও বুঝি না তা, নীরবে থাকি।
আজিকে বিদায়ম্লান তোমার আঁখি॥

শুধু ঘন অবসাদ মোর মরমে ;
পারি না চাহিতে তব মুখে শরমে ;
গুমরি, হৃদয় ফাটে,
তবু না মূকতা কাটে ;
অতীতের বাটে বাটে পরান ভ্রমে।
আজি শুধু অবসাদ মোর মরমে ॥

দিবা নিশা এক ক'রে, বাহির পথে
বরষা অঝোরে ঝরে হাজার স্রোতে।
অনামাবেদনাভারে
ভাসি যে-অশ্রুধারে,
জানি না বুঝিব তারে কেমন মতে।
কী যেন হারায়ে গেছে জীবন হতে ॥

১ অগস্ট ১৯২৫

উর্বশী

একদা এক তৃষ্ণাবিধুর বিনিদ রাতে,
আলো-কালোর মূর্ছনাতে,
স্তব্ধ কালের রুদ্ধগতির অবকাশে,
বিশ্বভোলা মত্তোল্লাসে,
তোমার স্থনীল চীনাংশুকের লহরমালা,
সিন্ধুসম, যখন, বালা,
ঘিরল তোমার রক্তচরণ আচম্বিতে,
লুপ্তস্বর্গ উর্বশীটির উদয় হল অবনীতে,
দীর্ঘশ্বাসের অবসরে যখন তুমি
বলেছিলে আমায় চুমি,
"একলা শুধু তোমায়, সখা, বাসি ভালো ;
জালো শিরায় আগুন জালো ;"

তখন তোমার মুক্ত কেশের তীব্র ঘ্রাণে,
কাঁপনলাগা আত্মদানে,
অরুণ কামের জোয়ারভাঁটায় আনাগোনায়,
বলেছিলেম যে-সব কথা, আজকে কানে মিথ্যা শোনায়॥

সে-দিন মোদের চারটি আঁখির দীপ্তি দেখে,
গ্রহগুলো একে একে
লাজে যখন ঢাকল বদন, পাণ্ডু মুখে
রাত্রি গেল বিদায়দুখে,
গ্রামের বাটে হাঁকল পাইক উচ্চ রবে,
আমি তখন চেতন ল'ভে,
বলেছিলেম দীর্ণ স্বরে, "হায়, বিধাতা!
এ যে প্রদোষ নিঠুর নীরাগ," তিতিয়ে তোমার আঁখির পাতা॥

আজও আবার তেমনই নিবিড় রাত্রি এ যে,
মোরা তো সেই বাসকশেজে,
কিন্তু চোখে নেই আজি সেই ক্ষিপ্ত দ্যুতি,
অধরে নেই প্রতিশ্রুতি।
কয়েক বছর পালিয়ে গেছে কোথা দিয়ে,
ব্যাকুলতার বোঝা নিয়ে।
বিনিদ নিশা আজকে যে, হায়, দাঁড়িয়ে থাকে :
ভবিষ্য আজ মৌনী; অতীত, সুদূর হতে, সদাই ডাকে॥

আজকে তোমার চ্যুত বাসের লীলা খেলা
প্রাণে জাগায় অবহেলা;
ওই যে তোমার পাণ্ডু বুকের কৃষ্ণচূড়া,
মধুতে তার নেই সে-সুরা;
মর্মরপ্রায়, তোমার উরু আর না দহে;
চুম্বনে হিম ঝিমিয়ে রহে;

লীলায়িত অরাল ভুজের আলিঙ্গনে
বাঁধনছেঁড়ার দুরাশা আজ জাগে মনের সংগোপনে ॥

রিক্ততা মোর, নগ্নতা মোর, দৈন্য দেখি,
উর্বশী আজ পালিয়েছে কি ?
সকলই আজ লুপ্ত মোদের চিত্তদেশে
প্রেমের চিতাভস্মশেষে।
দুষ্ট তারার আঁখির ঝিলিক আজ গগনে,
দেখছি খোলা বাতায়নে।
তাই বলি আজ ভাঙা গলায়, কাতর স্বরে,
"ঘুমাও, সখী, ঘুমাও ; ঊষা এখনও, হায়, অনেক দূরে ॥"

২০ মে ১৯২৬

মৃত প্রেম

অন্তিমে মোরা আরোহি জীবনকূটে
নিরালোক এক নীরাগ সন্ধ্যাখনে,
দেখিনু মোদের মৃত প্রেম, অযতনে,
ভাঙা পথার রাঙা রজোপরে লুটে ॥

এত দিন পরে সহসা সে মুখ ফুটে,
কহিল আমারে ক্রোধকম্পিত স্বনে,
"তব মুমূর্ষু স্মৃতির সংক্রমণে
মোর প্রাণ কবে ম'রে, ঝ'রে, গেছে টুটে ॥"

আমি বলিলাম, "সে কি কথা, প্রিয় সখী ?
তোমারই প্রণয় গেল যবে অমরাতে,
আমার প্রাণের বিরহাশঙ্কা লখি,
নিল তারে সাথে, সংহারি অপঘাতে ॥"

সে কাঁদিল ; আমি কহিলাম, "বেশ ভাই,
চলো তবে শবসৎকারে এবে যাই।"

১৭ জুলাই ১৯২৬

ভ্রষ্ট লগ্ন

যদি স্মিত হেসে, এলে অবশেষে,
আসো নাই কেন লগনে,
উদ্দেশহীন প্রণয়ে যে-দিন
কেঁপেছিল হিয়া সঘনে ?
উষসীর লাগি রজনী যখন
ছিল অনিমেষ পাণ্ডুবদন,
পথনির্দেশী দীপের মতন
শুকতারা জেলে গগনে ?
কেন, হায়, সখী, এলে না পুলকি
মিলনোৎসুক লগনে ?

কাটেনি তখনও স্বপ্নজড়িমা
আধোনিমীলিত লোচনে ;
অপরিচয়ের অপটু গরিমা
শরমের সংকোচনে।
নীল কুহেলীর অঞ্চল টানি,
ঢেকেছিল ধরা ধর্ষণগ্লানি ;
লুব্ধ বাসনা বাড়ায়নি পাণি
অবগুণ্ঠনমোচনে।
ভীরু রসনায় প্রেরণা উদার
স্ফুর্ত মুখর লোচনে।

সত্য হয়নি মূল্যশূন্য
নিত্য নূতন বিকারে ;
তখনও আত্মা হয়নি ক্ষুণ্ণ
মানবের অঙ্গীকারে।
চলেছিনু ছুটে কল্পনারথে
মদির মায়ার আলেয়া-আলোতে,
দুঃসাধ্যের অজ্ঞাত পথে,
হিরণহরিণীশিকারে।
তখনও মরিয়া হয় নাই হিয়া
অহেতু বিকারে বিকারে ॥

তখনও দলিত দ্রাক্ষার মতো
অকাল জরার চরণে
হয়নি জীবন শুষ্ক শ্রীহত
যৌবনসুরাক্ষরণে ;
অনুরাগ হতে অরুণিমা, ওরে,
যায় নাই ধুয়ে বঞ্চনালোরে ;
কাঁপেনি পরান বিরহের ডরে,
প্রেমের পুরঃসরণে।
তখনও প্রণয় বৃথা অপচয়
করিনি হাজার চরণে ॥

কেন আগমন করোনি, যখন
যৌবন তব গোপনে
মরমে রুদ্ধ ছিল বিমুগ্ধ
আকাশকুসুমবপনে ;
তব চরণের চঞ্চল গতি
বেঁধেছিল যবে নয়নে বসতি ;
হঠাৎ কিসের আধো-অবগতি
আনন রাঙাত স্বপনে ;

সহসা অনাম বেগ দুর্দাম
ফুরাত গোপনে গোপনে ॥

তখনও তরল বাসনা-অনল
ধমনীতে তব ছুটেনি ;
ভুজনিপীড়িত অংশুকচ্যুত
তনুর ধৈর্য টুটেনি ;
মুদিত কমলকলিকার মতো
কোন্ তপনের প্রতীক্ষারত,
পাণ্ডু নিটোল দৃঢ় উন্নত
কুচযুগ তব ফুটেনি ;
মধুপের দল মুখপরিমল
অবাধে লুটিয়া, ছুটেনি ॥

প্রেমপারিজাত হয়েছে নিপাত
আজিকে পথের ধূলিতে,
শুধু সে-ফুলের গন্ধের জের
পারেনি হৃদয় ভুলিতে।
মূর্ত অতীত আমাদের মাঝে
আশ্লেষে, রূঢ় শৈলসম, বাজে।
স্মরণের ছায়া নয়নে বিরাজে।
নত শির নারো তুলিতে।
আজি বঞ্চনা গতানুশোচনা
বক্ষে রহিবে জ্বলিতে ॥

২৬ জানুআরি ১৯২৬ ✓

শৃঙ্গার

হে শৃঙ্গার, যারা বলে অনুপম তোমার মাধুরী,
তাহারা অলীকভাষী কিংবা অজ্ঞ অন্ধ অচেতন,
মথিতপ্রণয়বিষে জরজর তব সংবেদন,
ধ্বংসের ফাটলে যেন সূর্যভীরু কেঁদাক দাদুরী ।

কোথা সে-অমৃতক্ষিপ্ত স্বর্গজয়ী রক্তিম উল্লাস,
সংকীর্ণসময়হন্তা নির্বাণের চরম আকূতি ?
এ শুধু আতংকে-কাঁপা নিবৃত্তির নির্বাক্ কাকুতি,
বিধর্ষিত সম্ভ্রমের অশ্রুরুদ্ধ ব্যাহত নিঃশ্বাস ।

তব বিড়ম্বনাক্ষুব্ধ যত লোক, যুগে যুগান্তরে,
সে-সর্বনাশের দায় রেখে যায় পরম্পরাপরে,
অব্যক্তির শবাচ্ছাদে দুরাশার কঙ্কাল আবরে' ।

ভোগস্মৃতিমুগ্ধ আমি, আজি সেই চক্রান্তের ফলে,
কান্তার ক্ষীণাস্থি তনু বক্ষে ধ'রে দুর্বিষহ বলে,
চেয়ে আছি তাপদগ্ধ বুভুক্ষার আবিল অতলে ।

১১ মে ১৯২৭

কবি

কেন আমি কাব্য লিখি, জানতে চাহো সেই কথাটাই ?
অত কিছু বলা-কওয়ার আজকে, সখা, সময় যে নাই ;
তবু যদি নেহাৎ শুধাও, এইটুকু নয় ব'লে রাখি :
জীবনে যে কাব্য লেখে, জীবন তারে দিল ফাঁকি ।
দিনের আলো যায় ফুরাল, স্মরণনিবিড় সন্ধ্যা এল,
মাটির দীপে সলতে দেবার মানুষ তবু নাই যে পেল ;

আকাশকুসুমপাপড়িগুলি ঝরল হঠাৎ ঝঞ্ঝাঘাতে ;
অশ্রুনদী পারের সাঁকো মগ্ন হল বন্যাঘাতে ;
প্রাণাধিকার চরণপাতে অর্ঘ্য মলিন পথের ধারে ;
বিলাসিনীর অতৃপ্তিবিষ রক্তদীপ্তি অন্ধকারে ;
বন্ধু স্বজন মিলল্ না যার ; দেখে যাহার অক্ষমতা,
শত্রু দয়ায় করল নিরোধ প্রহরণের তুচ্ছ ব্যথা ;
দেবতা যারে রইল ভুলে ; ক্রূরতা যার লক্ষ্য ক'রে,
শয়তানও সে অবজ্ঞাতে বিনষ্টিলোভ পরিহরে ;
মিলিয়েছে যে ত্রিভুবনের অহমিকার ঐক্যতানে
নিজের ভ্রষ্ট আমিটিরে ; জানে না যে 'সিদ্ধি' মানে ;
সেই তো বাসী পুষ্প তুলে, চোখের জলে জীইয়ে রাখে ;
স্ববুদ্ধিরে সেই তো ধাঁধায় কল্পকথার লক্ষ পাকে।
পাথেয় যার স্মৃতি কেবল, পন্থা যাহার অনাদ্যন্ত,
কবি ব'লে আখ্যা পাবার যোগ্য তো সেই ভাগ্যবন্ত ॥

২০ জুলাই ১৯২৬

অতন্দ্রায়

নিস্পন্দ নিদ্রিত শান্ত সমস্ত নগরী ;
রাজপথ প্রাণহীন পান্থহীন চলাচলহীন ;
সারা বিশ্ব প্রাণবায়ু রয়েছে সম্বরি,
স্বপনে বিলীন।
মেঘমুক্ত ঘননীল অম্বরের মাঝে
মুমূর্ষু মাঘের চন্দ্র রাজে :
যেন কোনও জরাগ্রস্ত দ্রাবিড়ের শ্যামল ললাটে
সন্ত শুভ্রচন্দনের কৌলিক তিলক
বংশের অতীত কীর্তি বর্ণিবারে চাহে মৌন স্বরে,—
শক্তি অর্থ গেছে, ব্যর্থ আভিজাত্য রাখিয়াছে ধ'রে ;

কিংবা যেন বার্ধক্যের কাটে
যৌবনস্মরণদীপ্ত আকাঙ্ক্ষায় চোখ।
হোথা ওই দূরে দূরান্তরে
দু-একটি অন্তলীন তারা,
ঘনীভূত সে-জ্যোৎস্নার গুরুভারে সারা,
কেঁপে ওঠে ক্ষণে ক্ষণে
বিকলিত বিকাশবেদনে।
মনে হয়, এ-স্তব্ধতা বুঝি চিরন্তন।
হল বহু ক্ষণ
শেষ আর্ত ক্ষীণতম কণ্ঠের নিঃস্বন
হয়েছে নীরব :
লুটাইছে পরাজিত শব্দের দানব
নিশ্চল মূর্ছাতে,
সর্বজয়ী চন্দ্রমার সুপ্তিবাহী তীক্ষ্ণ শরাঘাতে॥

ক্লান্তিহারা গ্লানিহীন শান্ত এবে সবে ;
সুনিদ্রার অধিষ্ঠাত্রী চুপে চুপে কখন নীরবে
তাহাদের আঁখিপাতে বুলায়েছে স্বপনকজ্জল,
শীতল করিয়া দেছে বাস্তবের প্রদাহ প্রোজ্জ্বল।
তাই বুঝি তাহাদের স্তিমিত আননে যায় দেখা
পরিতৃপ্ত স্মিতহাস্যলেখা ;
সোহাগে শিহরি উঠে, ভুলে-যাওয়া প্রেয়সীর নাম
জড়িত আধেক ভাষে তাই বুঝি জপিতেছে কেহ ;
অপরে শিথিল ভুজে খুঁজিয়া পেতেছে অভিরাম
আকাশকুসুমকুঞ্জে অভুক্তা বাঞ্ছিতার দেহ।
আমিই একেলা শুধু অতন্দ্রার শয়নীয়ে শুয়ে,
ক্লান্ত শির থুয়ে
ব্যর্থতাকণ্টকক্লিষ্ট তপ্ত উপাধানে,
চেয়ে আছি শূন্যতার পানে॥

১ ফেব্রুয়ারি ১৯২৫

অন্ধকার

গৃহকোণে জ্বলে ক্ষীণ বিকম্পিত ভীরু দীপশিখা,
প্রত্যক্ষ করায়ে দিয়ে দ্রবীভূত মত্ত তরঙ্গিকা
ঘূর্ণমান আঁধারের,—বেগবতী নৈশ নদী-'পরে
তটস্থ নিঃসঙ্গ দীপ আনে যথা আঁখির গোচরে
ভৈরব স্রোতের লীলা। জীবনের হালহারা তরী
ধেয়ে চলে, দুর্নিবার গতিবেগে শিহরি শিহরি,
কোন্ ভবিষ্যের পানে। পোতের পশ্চাতে ভেসে ভেসে,
প্রচণ্ড আবর্তাঘাতে লুপ্ত হয় নিমেষে নিমেষে
স্খলিত মুহূর্তগুলি, ক্ষণপ্রাণ বুদ্বুদের প্রায়,
তাহার অলক্ষ্য কেন্দ্রে। চূর্ণ হয়ে, একত্রে মিশায়
অধুনার অহমিকা, আগামীর মোহন মহিমা,
অতীতের মুগ্ধ স্বপ্ন, সময়ের সুচিহ্নিত সীমা।
বিনিদ্র শয়নে শুয়ে, চেয়ে দেখি স্তিমিত নয়নে,
যত বিভীষিকা থাকে অন্তরের নিষ্পান্থ অয়নে,
দুশ্চিন্তার ঘন বনে, দুঃস্বপ্নের অমা-অন্ধকারে,
তন্দ্রার প্রদোষালোকে, তৃষ্ণাদগ্ধ প্রলাপে বিকারে;
কক্ষের প্রাকারগাত্রে আজি তারা করে বিচরণ,
যত ব্যর্থ অপূর্ণতা অসংযম অমূর্ত স্মরণ॥

ভেঙে পড়ে সব বাঁধ; অভিমান মর্যাদা সাহস
যত্নে-রচা ঔদাস্যের নাস্তিগর্ভ কঠিন সন্তোষ।
বিষাক্ত যৌবনব্যথা, রুদ্ধ-প্রাণ-ধারণের গ্লানি
সহে না সহে না আর; গুহাবাসী আদিম পরানী
অধীর হইয়া উঠে; যুগান্তের সম্ভ্রম সংস্কার,
তিতিক্ষার অভিনয়, সভ্যতার দৃপ্ত অহংকার
পলকে খসিয়া পড়ে; সংগৃহীত নির্বাক লাঞ্ছনা,
তিল তিল অনাদর, জীবনের যত প্রবঞ্চনা

জানায় শোণিততৃষা সম্মিলিত অস্পষ্ট কল্লোলে ;
হিংস্র হিয়া চাহে কোন্ নরভুক দেবপদতলে
মাতিতে তাণ্ডবে আজি, গাহিবারে প্রলয়ের গান,
ছিন্ন করি নিজ মুণ্ড, বলি দিয়ে সকলের প্রাণ,
রক্তগঙ্গাতট-'পরে ॥

প্রভূত প্রয়াস মাত্র সার।
শ্রুতিগম্য নীরবতা বিশ্বব্যাপী দুস্তর দুর্ভার,
চেপে ধরে বক্ষঃস্থল ; শুষ্ক কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসে ;
ঝরে স্বেদ, বহে শ্বাস, দেহ হিম প্রাকৃত তরাসে ;
কম্পিত অধরপ্রান্তে তবু নাহি বাহিরায় কথা ;
চারিদিকে ব্যাপ্ত স্থির সুগম্ভীর শ্রুত নীরবতা ॥

তাই তবে হোক আজ : থেমে যাক রক্তের নর্তন
স্ফীত ধমনীতে মোর ; উদ্দামের মত্ত বিবর্তন
শান্ত হোক জড় স্তব্ধ চিন্তাহারা মস্তিষ্কে স্থবির ;
আবার মরুর প্রান্তে দৃষ্টিহীনা নিয়তি বধির
বাজাতে করুক শুরু তৃপ্তিক্লিষ্ট কর্ণ-'পরে মোর
সেই চিরপরিচিত সান্দ্র হতে ক্রমে সান্দ্রতর
অনামা বেদনারাগ ; অননুভূতির যবনিকা,
নিশ্চল হিমানীসম, ঢেকে দিক আগ্নেয়াদ্রিশিখা
আমার বক্ষের মাঝে ; কণ্ঠ হতে থেমে যাক গান
হউক আমার গতি, অন্তর্দগ্ধ উল্কার সমান,
ভাস্বর আলোক হতে চির-অন্ধ পাতালের কোলে,
বিস্মৃতির পঙ্কগর্ভে, অব্যক্তির অখ্যাত অতলে ॥

বারেক উদ্দীপ্ত নেত্রে ঊর্ধ্বমুখে নিরুদ্ধ আকাশে
অন্বেষি বিলুপ্ত বন্ধু, কেঁপে উঠে চরম তরাসে,
মুমূর্ষু প্রদীপখানি আচম্বিতে নেবে গৃহকোণে,
মরণবেদনাক্লিষ্ট। নেমে আসে নিমীল নয়নে

জগৎ-স্বপন পিলা অবসন্ন অশান্ত তন্দ্রার
নৈরাশ্যনিবিড় হল অখিল অনন্ত অন্ধকার।

৬ জানুয়ারি ১৯১৬

অনাহূত

কে জানিত সেই দিন, ওরে চিরসুন্দরের দূত,
তুই অকস্মাৎ
মোদের কুটীরদ্বারে অনাহূত আসিয়া, করিবি
মৃদু করাঘাত ?
কে জানিত সেই দিন নশ্বর নরের ছদ্মবেশে
আসিবে দেবতা,
মিনতিমাখানো সুরে পদপ্রান্তে মাগিবে আশ্রয়,
কেঁদে, কবে কথা ?
কেন এলি ভিক্ষুরূপে ? এলি না বিজয়ী রাজসম
গর্বিত নির্ভয়,
গর্জিয়া, দিলি না আজ্ঞা, "ভাঙো দ্বার, করো হে প্রণাম,
আসে জ্যোতির্ময় ?"
মোরা জানি অত্যাচার ; নৃশংসতা পেয়েছি সতত,
পাইনি করুণা ;
আমরা বাসনা-অন্ধ, ভালো লাগে কার্পণ্য-আঁধার ;
উষসী অরুণা
আসে না মোদের কাছে, তরঙ্গিয়া অকামা ভৈরবী
আলোকবীণাতে ;
মোরা জানি দীপকের আকাঙ্ক্ষা অসীম, কামনার
সুনিবিড় রাতে।

কে তোরে ডাকিয়াছিল ? কেন এলি ? কেন গেলি চ'লে ?
সহিল না ত্বরা ?

আয়, বৎস, আয় ফিরে ; আমাদের বিদীর্ণ শ্রীহীন
রিক্ত বক্ষ ভরা।
জনতার চক্রব্যূহে, জীবন্ত মরণে নির্দেশিয়া
নির্গমের পথ,
বল কোথা সুধা মিলে ; বল কোথা পাব স্পর্শমণি,
পূর্ণ মনোরথ।
অযত্নবিচ্ছিন্ন তন্ত্রে অশ্রুত যে-সুরের ঝংকার
জাগে মাঝে মাঝে,
ধরিয়া জীবনবীণা, সে-রাগের করো হে আলাপ
জলভরা সাঁঝে।
মুছি অশ্রু বারংবার, সীমাশূন্য শূন্যতার পানে
দৃষ্টিহারা চোখে
চাহি বৃথা প্রতীক্ষায়, অদর্শিতে দেখার প্রয়াসে,
দূর কল্পলোকে।
জানি তুই আসিবি না, পুষে রাখি তবুও দুরাশা
আশাভ্রান্ত প্রাণে,
কে জানে হয়তো হবে পুনর্বার তোর সাথে দেখা
অন্য কোনওখানে।
হয়তো আষাঢ়রাতে সদ্যঃস্নাতপল্লবমর্মরে,
শান্তঝিল্লিস্বনে
অশ্রুক্লান্ত দুলালের সবিরাম মৃদুল নিঃশ্বাস
শুনিব শ্রবণে।
পুষ্পিত ফাল্গুন যবে সুপ্ত চিত্তে হানিবে নবীন
ক্ষিপ্র চঞ্চলতা,
জানিব সে-দিন তুমি কায়ামুক্ত মহাত্মপ্রেরণা,
সপ্রাণ দেবতা।
আবার বৈশাখপ্রাতে ঝটিকার প্রশান্ত প্রয়াণে
জাগিবে মরমে
ভ্রষ্ট লগনের স্মৃতি, ক্ষুব্ধ স্তব্ধ নিষ্ঠুর পীড়নে
আক্ষেপে শরমে॥

মিথ্যা কথা! মিথ্যা কথা! কে বলে যে হবে পুনরায়
তোর সনে দেখা?
পলকের প্রণোদনা, থাক তুই আত্মবিস্মরণে
চিরকাল লেখা,
নামহীন, কীর্তিহীন, সম্ভাবনা অপূর্ব মহান্,
স্খলিত সুযোগ,
অগীত সংগীত শ্রেষ্ঠ, আজন্মের পরাস্ত সাধনা,
বিরাট্ উদ্যোগ।
ফেলিব না অশ্রুজল, করিব না নিষ্ফল আক্ষেপ,
রব না লুণ্ঠিত,
চাহিব না দেখিবারে অজানিত তোমার আনন,
হে অবগুণ্ঠিত।
চ্যুত পারিজাতমাল্যে যদি হল বিগত পরান
স্বর্গের প্রবাসী,
ব্রহ্মার মানসপুত্র নভে তো বাজায়ে গেল বীণা,
ক্ষুদ্রতা বিনাশি॥

বাসনাসংকট হতে বাঁচায়েছ প্রচণ্ড প্রহারে,
হে চিরনির্মল;
আরামজড়ত্ব থেকে ছিনাইয়া, করেছ পথিক,
হে চিরচঞ্চল;
বসন্তের মদগর্ব হানিয়াছ, করেছ প্রমাণ
সে-সকলই ফাঁকি;
যৌবনসায়াহ্নে এসে, মিলায়েছ অনন্ত তিমিরে,
হে কালবৈশাখী!
তোমারে দেখিনি, তবু অকুন্তদ তোমার স্মরণ
বক্ষে জেগে রয়;
তুমি গেছ, তব বাণী কানে কিন্তু ধ্বনিছে নিয়ত,
"নয়, নয়, নয়।"

সন্তরি শোকের সিন্ধু অশ্রুধৌত কভু অনলীক
পবিত্র নিকায়,
তোমার অলক্ষ্য পদে আজি গাঁথে দিই গীতাঞ্জলি
অন্তিম প্রণাম ॥

১৩ জুন ১৯২৫

পশ্চিমের ডাক

বিরহ-আভাস-রাঙা পশ্চিমের অন্তিম সম্পৎ
মেঘের গুণ্ঠনতলে সংকেতিছে দিবা-অবসানে
দিগন্তে উদ্দেশহারা সুদূরের রেখাহীন পথ ;
যাত্রীর আহ্বান বাজে রাত্রিজয়ী ঝঞ্ঝার বিষাণে ;
অভিসারকাঙ্ক্ষাতুর দিগ্বধূর তপন-নোলকে
কোন্ দূর দয়িতের চুম্বনের পূর্বাশা ঝলকে !
প্রতীচ্যের নিমন্ত্রণ চেয়ে দেখি নিস্পন্দ পলকে
মেঘার্ণবপোতশীর্ষে স্বর্ণে লিখা উড্ডীন নিশানে ॥

ও-ডাক সহস্র বার শুনিয়াছি উন্মুখ শ্রবণে ;
ও-ডাকের দ্রব বহ্নি ছুটে মোর শিরায় শিরায় ;
উন্মনা ঔদাস্য হানি সন্তুষ্টির নির্বাত ভবনে,
মোর ত্রস্ত মানসেরে পরদেশে ও-ডাক ফিরায় ;
ও-ডাকের বক্ষপটে নক্ষত্রের বজ্রমালা ভাতে ;
শত জন্মান্তের স্মৃতি মিশে আছে ও-ডাকের সাথে ;
ও মোরে দিয়েছে প্রাণ, জানি মোর মৃত্যু ওরই হাতে ;—
ও-ডাকের প্রতিধ্বনি মোর কর্মে আমার ক্রীড়ায় ॥

নিত্য তীর্থযাত্রী তুমি ; রশ্মিদীপ্ত তব সঞ্চারণ
কী অধরা গাথা তার শূন্যে শূন্যে দেয় বিকীর্ণিয়া ।

তোমায় মেঘের অশ্ব, শতক্রতু, মানে না বারণ,
স্থবির মুমূর্ষুগণে বিনা ক্ষতে যায় বিদারিয়া।
মহেন্দ্র কুলিশ হানি, পারে নাই তোমারে জিনিতে ;
কুবের ভাণ্ডার দানি, পারে নাই তোমারে কিনিতে ;
অদিষ্ট রহস্য তার পারে নাই ধরা গোপনিতে।
প্রলয়সমুদ্র মথি, তুলিতেছ নবীনে সৃজিয়া॥

তবু তব নিমন্ত্রণ উপেক্ষিনু মূঢ়তার দাপে
মোর নষ্ট যৌবনের রোমাঞ্চিত স্বর্গীয় ফাগুনে,
হে প্রিয়া প্রতীচী, তাই আজি তব তীব্র অভিশাপে
অঙ্গার হতেছে হিয়া এ অকাল জরার আগুনে।
তাই কাটে মোর দিন অর্থহীন অশেষ খেলায়,
শঙ্কিত নির্জীবমনা ক্লীবেদের বাচাল মেলায়,
হীনের জঘন্য সখ্যে, মহতের দুঃসহ হেলায়,
সুচির অজ্ঞাতবাস আর কত বাকি গুণে গুণে॥

মেঘের মিনার হতে অকস্মাৎ ফুকারিয়া উঠি,
অমূর্ত মুজ্জীন তব অন্ধকারে হল নিরুদ্দেশ ;
অলক্ষিতে নিবে গেল দেহলীর নিষ্কম্প্র দেউটি ;
উত্তীর্ণ অমৃতলগ্ন, সমাপ্ত সে-পবিত্র আদেশ।
সরল বিশ্বাসীবৃন্দ সারে সারে ব্যাহত অঙ্গনে
দ্বিধাশূন্য ভক্তিভরে সমবেত সায়াহ্নবন্দনে ;
বাহিরে নিঃসঙ্গ রাতে আমি শুধু মূর্তিখর্ব মনে
নিরাকার নির্গুণের করিতেছি সন্দিগ্ধ অন্বেষ॥

দুর্মূল্য অশ্রুর আর করিব না বৃথা অপচয় :
থাকো সদা ব্যাপ্ত তুমি অবসন্ন আকাঙ্ক্ষাকলাপে ;
সুখস্বপ্নে ঘটেছিল তোমা-সনে আদি পরিচয়,
মিলন সম্পূর্ণ হবে, হয়তো বা, মৃত্যুর প্রলাপে।

তাই আজ ঊর্ধ্বমুখে অবলুপ্ত অস্তাচলপানে
তব নায়কের লাগি চেয়ে আছি উদ্দীপ্ত নয়ানে ;
কে জানে, হয়তো, তার শীতমুক্ত বিরল প্রয়াণে
আসিবে সে শুভ ক্ষতি বীণাচ্যুত শীতের গোলাপে ॥

১২ মে ১৯২৮

অন্তিম গীতিকা

মন্দির-অঙ্গনে তব আসিয়াছি আজি, মহারানী,
যতনে বহন করি আমার চরম অর্ঘ্যখানি,
আজন্মের বিফল সাধন।
রুদ্ধ তব দ্বারতলে,
হৃদিরক্তে অশ্রুজলে
আঁকিতে, এসেছি আজি ক্ষণিকের ব্যর্থ আলিম্পন।
আয়াসে এনেছি গেঁথে সর্বশেষ শেফালিমালিকা,
দিনের চিতায় জেলে নিবু-নিবু প্রদীপের শিখা,
অন্তিম গীতিকা॥

মনে পড়ে, বসন্তের আরক্তিম অস্পষ্ট উষায়
কৈশোরের উগ্র দর্পে, দিগ্বিজয়ী বীরের ভূষায়,
বলেছিনু গর্বিত আদেশে,
"যুগ যুগ যার তরে
রয়েছ অপেক্ষা ক'রে,
আমি-সে স্রষ্টার সুত, আসিলাম তব দ্বারদেশে।
উন্মুখ যৌবন মোর, অনাহত প্রয়াস মহান,
অম্লান অধরা রূপ। করো মোরে বরমালা দান।
আমি চির প্রাণ॥"

দলিত পলিত তব জীর্ণ দীর্ণ সভাসদগণে
দেখায়ে, বলিয়াছিনু, "ইহারা কি জিনিবে শমনে ?

এনে দিবে অমৃতসন্ধান ?
ইহারা কৈলাস ল'ঙ্ঘে,
যুঝে মহেশের সঙ্গে,
পারিবে, আনিতে কেড়ে হিংসাহন্তা পাশুপত বাণ ?
দাও মোরে তব বীণা, মোর হাতে হবে সে মুখরা।
বিষ্ণুর নয়নজলে উদ্ধারিব আমি বসুন্ধরা।
খোলো দ্বার ত্বরা।"

*

শুনে সে-প্রলাপ মোর, বিচলিতা হও নাই তুমি ;
অসীম বিষণ্ণ স্নেহে ধীরে মোর ঊর্ধ্ব শির চুমি,
দিয়েছিলে বীণাখানি হাতে।
দেখায়ে স্বর্গের পথ,
বলেছিলে, "মনোরথ
সফল হউক, বৎস ; ফিরে এসো পূর্ণতার সাথে।"
কে জানিত সেই দিন, হে দেবতা, জয়যাত্রা মোর
সাঙ্গ হবে যাত্রাস্থলে, ব্যর্থতায় উপেক্ষায় ঘোর
বিদ্রূপে কঠোর !

নাহি আর সে-সাহস, ভেঙে গেছে দুর্দম উদ্যম।
শ্রীহীন বিগতদম্ভ ব্যথাস্তব্ধ আজিকে অধম,
ফিরিয়াছে দুয়ারবাহিরে,
পথচ্যুত লক্ষ্যহারা
নিরাশ্রয় সৃষ্টিছাড়া,
গরলবিক্ষুব্ধ বক্ষে, নৈরাশ্যসংহত অশ্রুনীরে।
বিদীর্ণ বিশুষ্ক হিয়া — ভগ্ন পাত্র লুটায় ধূলিতে —
ফেনিল যৌবনসুরা ঝ'রে গেছে অকালে চকিতে,
কবে অলখিতে॥

তাই আসিয়াছি, দেবী, তব বীণা তোমার চরণে
ফিরে দিয়ে, চ'লে যেতে মরণের অধিক মরণে,

সংকোচের অখ্যাত আবাসে,
অব্যক্তির অন্ধকারে,
সংযমের বদ্ধদ্বারে,
স্থিতির বন্ধনশালে, যুগান্তের নিরুদ্ধ নিঃশ্বাসে,
জীবিকার অন্বেষণে, জীবনের নিঃশব্দ প্রপাতে,
উদাসীনতার বক্ষে, অনত্যয় আবর্ত-আঘাতে,
জ্যোতিহীন রাতে।

আসিলে ফাল্গুন ফের, রোমাঞ্চন সঞ্চারিয়া তৃণে,
জাগায়ে চন্দনগন্ধ চিরতিক্ত নিম্বের বিপিনে,
আমি আর নমিব না তারে।
মত্ত কালবৈশাখীর
নর্তনে রহিব স্থির।
হঠাৎ নিরর্থ খুশি খুঁজিব না শ্রাবণের ধারে।
উত্তরি রঙের সেতু, নবান্নের থালি ল'য়ে যবে
আসিবে শারদা, রব, পূর্ণতার সেই মহোৎসবে,
বিজনে নীরবে।

২৬ সেপ্টেম্বর ১৯২৫

প্রতিহিংসা

নগ্ন প্রতিহিংসাস্পৃহা, শীলতার শাসননাশন,
আজিকে তাণ্ডব নাচে হৃদয়ের ধূসর উষরে ;
কী স্মৃতির আগ্নেয়াদ্রি অকস্মাৎ প্রলয় উৎস'রে,
তমিস্র পাতালতলে, তিতিক্ষারে দিল নির্বাসন !
অলীক অনাম কোন্ বিধাতার অলখ আসন
সহসা কাঁপিয়া উঠে অনভিজ্ঞ যাচকের স্বরে !

ধর্ষিতা মানিনী মোর লুব্ধ যার হৃদিরক্ততরে,
কোথা সে-অচিন অরি, জয়মত্ত দুষ্ট দুঃশাসন ?

সম্বরো সম্বরো ক্রোধ, ক্ষান্ত হোক উগ্র আস্ফালন ;
শত্রুর সন্ধান শেষে সাঙ্গ হবে দুস্তর শরমে।
আজন্মের অরাতিরে করেছ যে আপনি লালন,
সে তোমারই প্রতিচ্ছবি, সুখসুপ্ত নির্বিঘ্ন মরমে ॥

অশ্রুতে হবে না ধৌত নির্বাপিত প্রদীপের মসি ।
সিদ্ধ হবে প্রতিহিংসা, নিজ বক্ষে হানো হিংস্র অসি ॥

৩ অগ্রহায়ণ ১৩৫৫

নিকষ

না-জানি আজিকে কোন্ অচিন সত্যের অভিযানে,
কোন্ গুপ্ত দুর্নিবার টানে,
পরিশ্রান্ত চিন্তা মোর, দুখে-অভিভূত হিয়া মম,
অভ্রংলিহশৃঙ্গচ্যুত শিলাখণ্ডসম,
নেমে যায়, ছুটে ছুটে চলে
নীচু হতে আরও নীচে, তল হতে ক্রমশ অতলে,
তমিস্র সমাপ্তিহীন নৈরাশ্যের পাতালবিবরে,
অনন্তের, অজ্ঞাতের, অস্থৈর্যের বিস্তৃত গহ্বরে।
নাই নাই নাই রে নির্ভর,
গতিবেগ রোধিবার নাই শক্তি, নাই অবসর।
সে-পিচ্ছিল অন্তহীন সুড়ঙ্গের গায়
শ্রান্তিহত পদযুগ রাখিবার নাই রে উপায় ॥

কুটিল সংহত আঁধা ব্যাপ্ত দিশে দিশে,
পলে পলে, তিলে তিলে, ধূলিবৎ করি, মোরে পিষে।

মুহূর্তের মধু মোহ, ক্ষণিকের অলীক বিশ্বাস
নাহি দেয় কোথাও আভাস।
আঁধার আঁধার ঘোর নিরন্ত আঁধার
নীরব নিবিড় স্থির নিখিল আঁধার!
পলকের দুরাশার অচির বিদ্যুৎশিখা,
জীবনে উল্লাস স্পৃহা, জীবিতের দৃপ্ত অহমিকা,
জ্বালে না পলের বাতি সনাতন তামসের বুকে।
থেলে সেথা নিষ্ঠুর কৌতুকে
মূর্তমূর্তি অসন্তোষ,
নিরালোক ব্যর্থ শোক, নিষ্ফল আক্রোশ,
অতীতের সুখস্মৃতি, কেবল-কঙ্কালসার লুব্ধ মরীচিকা,
অনুতাপ পরিতাপ প্রবঞ্চনা ক্রুর বিভীষিকা।

এই অন্ধ বন্ধ রন্ধ্রমাঝে
বন্দী আমি রব চিরদিন?
যে-স্তম্ভিত জড় ব্যথা বক্ষে মোর অহর্নিশ বাজে,
কভু কোনও দিন
হবে না কি স্পষ্ট অনুভূত, হবে না কি ক্ষীণ?
একতানা নিদ্রাতুর শিথিল বেসুরে,
মোর জীর্ণ হৃদয়ের দীর্ণ অন্তঃপুরে,
একই ধ্রুপদ, হায়, বাজিবে কি অনাদি অশেষ?
রুদ্রবীণা উগ্ররোষে মুহূর্তেক ভীম গর্জে উঠে,
ভৈরব ঝংকার তুলে, বিকীর্ণ আকাশে ছুটে ছুটে,
হবে না কি লুপ্ত নিরুদ্দেশ?
বাজিবে অনন্তকাল অবসন্ন সান্দ্র নির্বিশেষ?

যারা মোরে ফেলে দিল নৈরাশ্যের অতল গভীরে,
আপাতসুন্দর পথ দেখাইয়া পথিক হিয়ারে,
পাঠাইল তারে
চিরসন্ধ্যাচ্ছায়াচ্ছন্ন কোন্ রিক্ত অশ্রুনদীতীরে;

সম্ভোষিত মোরে যারা করাইল স্বপনপ্রয়াণ
সেই পথে নিরুৎসাহ মর্মদাহ যৌবনের দিবা-অবসান,
যেথা ভয় অপমান, নিরর্থ লাঞ্ছনা,
বিনা দোষে অভিযোগ, বৃথা দণ্ড, নিষ্ঠুর বঞ্চনা ;
দুরাশার বিলোল হিল্লোলে
আমারে স্থাপন ক'রে ক্রূর পরিহাসে,
এনে মোরে বারে বারে বাঞ্ছিতের আশ্লেষণকাশে,
মোহরজ্জু কেটে, শেষে ফেলে দিল কঠিন ভূতলে :
বিচ্ছেদবেদনাশুষ্ক হৃদয়-আধারে
মিলনের মঞ্জু মদ ঢেলে যারা নিদাঘের তাপে,
না সহি পানের ত্বরা, কেড়ে নিয়ে নির্মম প্রতাপে,
ভিক্ষুকের মতো মোরে পাঠাইল দুয়ারে দুয়ারে ;
রবে তারা স্বাচ্ছন্দ্যের দীপ্ত শৈলশিরে,
মোরে নেমে যেতে হবে পাতালের অতল গভীরে ?
ঝরিবে বিষাদবারি মোর আঁখিকোণে,
গগন বিদীর্ণ হবে তাহাদের হাসির নিঃস্বনে ?

কোন্ গুণে, কী সাহসে, রহে তারা কোথা ?
জাগে কি তাদের বুকে বসন্তের ক্ষিপ্ত চঞ্চলতা,
সিক্তধরাশ্রাবণসৌরভ ?
পারে কী বহিতে তারা ব্যথার গৌরব ?
তাদের জীবনবেণু প্রণয় কি তুলে নিয়ে হাতে,
শত ছিদ্র হতে সুর করিয়াছে সহজে বাহির ?
কভু কি পেরেছে তারা স্বার্থেরে মারিতে অপঘাতে
বিদ্রোহের মহোৎসবে, শুনে গাথা উদ্দাম মুক্তির ?
প্রলয়ের মহাভেরী ধ্বনিয়াছে তাদের শ্রবণে ?
সৃজনের অশ্রুজলে ভেসেছে কি তারা পদ্মাসনে
তারা কি, সীতার মতো, পার হয়ে গ্লানির অনল,
সত্যের মর্যাদা ল'য়ে, গ্লানিহীন সহজ সরল,

নেমে গেছে অস্তুর নির্বাণে
দেবতার জয়ধ্বনি গানে ?
অসার হৃৎপিণ্ড তারা সন্তুষ্টির চিনে তুষারিত,
শাসনসংহত জড় জীবনের বহ্নিকণাহৃত,
নিয়মের, অভ্যাসের, বিশ্বাসের দৃঢ় আকর্ষণে
লগ্ন রহে স্বাচ্ছন্দ্যের সনে,
অনুভূতিহারা স্তব্ধ নিষ্প্রাণ নিশ্চল।
আর আমি রবিকরবিচ্ছুরিত উতল উপল
শৈবালকর্দমহীন
স্বর্গ হতে মর্ত্যলোকে, মর্ত্য হতে স্নিগ্ধ রসাতলে
ছুটে চলি নিশিদিন,
অতৃপ্তির অন্তর্তেজে জ্ব'লে,
নিরুদ্দেশ পূর্ণের অন্বেষে।

যবে শেষে
তারাও দাঁড়াবে এসে আমার পশ্চাতে
কোনও এক তারাজ্বালা, জ্যোৎস্নাহারা, নীরব নিশাতে,
মরণের মহাতীর্থে, বিস্মৃতির বৈতরণীকূলে, —
যাহার কাজলজল ঊর্মিহীন বিভ্রমেতে দুলে,
সমান সোহাগে সবে নেয় কোলে তুলে ;
প্রাচীন নিয়মগিরি যার তটে এসে,
সত্তাশূন্য প্রতিবিম্বে মেশে ;
সাফল্য ব্যর্থতা সব এক হয় চোখের নিমেষে ; —
মাটি যারা তারা সেই জলে
অচিরে মিলায়ে যাবে, তিলে তিলে গ'লে ;
শব্দহীন নিস্তরঙ্গ কালের অতলে
ভয়মূঢ় তারা যাবে দুটি চক্ষু বুজে,
নাহি পাবে অখিলের সীমা ;
সে-দিন কি পাব আমি খুঁজে,
ভেদি সেই মরণনীলিমা,

যে-সত্যের অন্বেষণে জীবন যৌবন দিনু বলি ?
মোর রুদ্ধ চিত্তশতদলকলি
যে-অদৃষ্ট পরিপূর্ণ পরিণতি লাগি
রহিয়াছে যুগে যুগে অশ্রুহ্রদে জাগি,
মিলিবে কি তার বার্তা মরণের সাগরতলায়,
তারকার প্রতিচ্ছায়ে, প্রতিধ্বনিহারা সেই নিত্যমৌনিতায় ?

পারিব কি এঁকে যেতে মরণের মসৃণ কপালে
ক্ষণিক স্মৃতির বলি ? বাজিবে কি সে-দিন আমার
সম্পাদিত সংগীতের অস্পষ্ট ঝংকার
সমাপ্তির আড়ালে আড়ালে ?

২৭ মাঘ ১৩৩১

অপলাপ

আমি তব নাম ল'য়ে করেছিনু খেলা ;
ভেবেছিনু মরণের অভিনয় করা
পরম গৌরব বুঝি ; বলেছিনু, "জরা,
রাগহীন শক্তিহীন স্তিমিত একেলা,
নাহি যাচি ; সহিব না জীবনের হেলা,
প্রণয়বাসনারিক্ত দিন গ্লানিভরা,
যৌবনের ব্যর্থ চেষ্টা ; তার চেয়ে ত্বরা
আসুক অনস্তুভূতি মৃত্যু এই বেলা।"

হে করুণ, সত্য ভেবে মোর সে-মিনতি,
যেমনই আসিলে মোরে তুলে নিতে কোলে,
অমনই কাতরে বলি, ভেসে অশ্রুজলে,
"ধরা অভুক্তিতা প্রিয়া সর্ববিত্তবতী,

জীবন যৌবন কাম্য, প্রেম সুমধুর,
মরণ অজ্ঞাত অন্ধ অসুন্দর ক্রূর।"

১০ মে ১৯২৩

হিমালয়

কালের প্রারম্ভপূর্বে, সৃজনের আদিম নিশ্চল
নির্জন আঁধার রাত্রে কী ব্যথার সুনিষ্ঠুর পীড়া,
হে তপস্বী, তব জটা ক'রে দেছে পবিত্র ধবল।
কত স্তব্ধ শতাব্দীর হৃদিহীন ধৃষ্ট ক্রূর ক্রীড়া
তোমার উদার ভালে পদচিহ্ন এঁকেছে কৌতুকে।
কত লক্ষ কল্পসিন্ধু মন্থনের নিদারুণ বিষ
দহনের ঘন মসি লেপে দেছে তব রিক্ত বুকে।
দেবতার তীব্র রোষ হানিয়াছে উদ্দীপ্ত কুলিশ
তোমার অকম্প্র শিরে। আনিয়াছে আতপ্ত উদ্বেগ
বিভ্রম বিলাস রূপ বারে বারে তব প্রতিবেশে
অনন্তযৌবনা ঊষা। দক্ষিণের রাগরক্ত মেঘ
এনে দেছে যুগে যুগে তোমার অচল পদদেশে
বসন্তের নিমন্ত্রণ। মলয়ের বিহ্বল হিল্লোল
এসেছে আকাঙ্ক্ষা ল'য়ে। অভিষেকি কনকমুকুটে,
শ্যামা সন্ধ্যা অর্পিয়াছে চূতাঙ্কল কোমল নিটোল
তনুর বৈভবভার সুবিশাল তব অঙ্কপুটে।
চঞ্চলা নটীর মতো ছয় ঋতু চৌদিকে তোমার
অমূল্য নির্মাল্য ল'য়ে করিতেছে উদ্দাম নর্তন।
মানুষও এসেছে শেষে, নিয়ে তার বৈফল্যসম্ভার,
মুহূর্তের শুষ্ক হাসি, জন্মান্তের অক্ষয় রোদন,
পরমাণু-আয়তন, তুচ্ছ ক্রোধ, ক্ষুদ্র ভালোবাসা,
ক্ষণিকের মহোত্সব, অনন্ত অশান্ত অবসাদ,

জ্ঞানের সংকীর্ণ গণ্ডি, কুয়াশাতে গন্তব্য জিজ্ঞাসা,
স্বল্প বেগ, তুচ্ছ আশা, অল্প প্রাণ, প্রচণ্ড প্রমাদ।
মানুষও দিয়েছে দেখা, উল্লঙ্ঘিয়া নিজ মর্ত্যসীমা,
লঙ্ঘিতে তোমার শির; আস্ফালিয়া নগণ্য শলাকা,
বিদারিতে মহাকায়া, চূর্ণিতে ও-বিরাট্ মহিমা,
লিখিতে আপন নাম দেবতার অভিশাপ-আঁকা
হৃদয়ফলকে তব॥

তবু তুমি মেলিবে না আঁখি?
তবু ভাঙিবে না ধ্যান? তবু তব একাগ্র সাধন
হবে না পলেক ক্ষান্ত? যত সুপ্ত অনুচরে ডাকি
ভরিবে না একবার প্রলয়ের উদাত্ত নাদন
তবু কি শিড়ায় তব? রবে শুধু অন্ধের সন্ধানে?
রবে সদা আত্মহারা জড় স্তব্ধ নির্বাক্ বধির?
অর্চনা লাঞ্ছনা দ্বেষ কিছু কি পশে না তব প্রাণে?
বহে না শিরায় তব অধৈর্যের রক্তিম মদির?
মেলো আঁখি মেলো আঁখি, কথা কও, অনাদি বিরাট্;
সঞ্চালি আস্বর্গ শির, ইঙ্গিতিয়া করো বরাভয়,
ক্ষুদ্রের আসঙ্গ হতে নিস্তারের প্রসর্পিত বাট
খুলে দাও, হে উদার। আর নাহি সহে লোকালয়।
স্কন্ধ-অংশ-ভগ্ন-ভাগ, নিষেধের কষায় নয়ন
বলিষ্ঠের লুব্ধ খড়্গ, ক্ষুণ্ণ মান, ঈর্ষার গরম,
মরণের অহংকার, হাস্যাস্পদ অক্ষম জীবন,
দণ্ডে দণ্ডে তিলে তিলে কালিমায় ভরিছে মরম
আমারও, তোমারই মতো। করো করো করো পরিত্রাণ।
আমারে ডাকিয়া লও ওই উচ্চ শান্ত শুভ্র কূটে,
যেখানে মানুষ আজও পায় নাই দাঁড়াবার স্থান,
যে-শৃঙ্গ সায়াহ্নকালে লজ্জায় লোহিত হয়ে উঠে,
নরের খর্বতা দেখি, পরানের ব্যর্থতা নেহারি॥

এখনও নিমীল আঁখি, জড় মৌনী স্থাণু অচেতন
নীরব নিষ্প্রাণ তুমি? নৈরাশ্যের তীক্ষ্ণ তরবারি
কল্পনার যবনিকা করিয়াছে শতধা ছেদন।
বুঝেছি তুমিও মিথ্যা; তুমি শুধু প্রকাণ্ড পর্বত,
স্থবির তুহিনস্তব্ধ কালচক্রদলনলাঞ্ছিত;
মনীষীর লীলাভূমি, অমরার পান্থহীন পথ
নহ নহ নহ তুমি; নহ তুমি বিরহিবাঞ্ছিত।
পৃথিবীর মানদণ্ড? সে কেবল কবির স্বপন।
ধরার কঙ্কালস্তূপ, বয়সের চাপে সুসংহত।
শ্বেত শুভ্র দেবতাত্মা? সে তো শুধু পীত পুরাতন
পুরাণের আখ্যায়িকা, চিরাভ্যস্ত অপলাপ শত॥

কি শিখিব তোমা হতে? ওই তব বিনা বাক্যে নেওয়া
অধমের অপমান? নিয়তির দৃপ্ত পরিহাসে,
ভৈরবের অত্যাচারে বিনা দ্রোহে মাথা পেতে দেওয়া?
সুন্দরের আত্মদানে ওই তব নিরুদ্ধ নিঃশ্বাসে
কুহেলীসমাপ্তিচিন্তা? ওই তব ত্রস্ত প্রত্যাখ্যান,
অন্তিমবিতৃষ্ণাভয়ে, রভসের ফেনিল আসব?
ও-পরিচ্ছিন্নতা তব? ওই তব নির্বীর্য পরান?
কঠিন সন্তুষ্টিখানি? ওই রিক্ত ত্যাগের গৌরব?
আমি যে মানুষ ক্ষুদ্র, সাজে মোর ধরার আচার:
লুটে নেওয়া রূপ রস জীবনের বদ্ধ মুষ্টি হতে,
অল্পায়ু উল্লাস আর অনুতাপ সুচির দুর্বার,
সংকীর্ণ আঁধার ঘরে শ্বাস নিয়ে বাঁচা কোনও মতে,
তিতিক্ষার ক্ষুদ্র সীমা, বিদ্রোহের উন্মত্ত প্রেরণা,
মরণের মহামুক্তি, বিদায়ের বিষণ্ণ পূরবী।
ভ্রূকুটিকুটিল শৈল নহি আমি নিষ্প্রাণ অহনা
কুয়াশাগুণ্ঠনাবৃত মহত্ত্বের শূন্য প্রতিচ্ছবি।
আমা হতে ক্ষুদ্র তুমি, আমা হতে আরও নিরুপায়;
নরের চরণতলে আসন্ন তোমার পরিণাম।

চাহি না তোমার স্বর্গ, ফিরে যাব জীবন্ত ধরায় ;
গাব না তোমার স্তুতি, করিব না তোমারে প্রণাম ॥

১৪ নভেম্বর ১৯২৬

চ্যুতকুসুম

তোমরা বলো, "আয়াস-সিদ্ধ শাখে
অমূল্য ওই কুসুম আছে ফুটে,
অনাদরে ঝরল যে-ফুল পাঁকে
কেন, ক্ষেপা, কুড়াস করপুটে ?
বনের ফুলই হয় যদি তোর প্রিয়,
বনস্পতির উচ্চ ডালের 'পরে
যে-গুচ্ছ ওই অনির্বচনীয়,
তাতেই না-হয় নে তোর সাজি ভ'রে।
পঙ্ককলুষ চ্যুতকলির মালা
অর্ঘ্য দিবি কোন্ দেবতার পায়ে ?
সার হল তোর তীক্ষ্ণকাঁটার জ্বালা,
মিছিমিছি মাখলি কাদা গায়ে !"
দেবতারা সব সপ্তস্বর্গবাসী :
তাদের চোখে সদাই দীপ্যমান
ঊর্ধ্ব তরুর শুদ্ধ গর্বরাশি,
পরদেশীর রঙীন অভিমান।
আগাছখসা যে-সব অনামিকা
আগন্তুকের বিরল চরণ সেবে,
বামনেও উগ্র অহমিকা
হানলে তাদের, শাস্তি কে তার দেবে ?
লক্ষ্মীছাড়া তারা ভাগ্যহত
লাঞ্ছিত যে, মোর সনে নেই ভেদ,
তুলতে তাদের হস্ত হল ক্ষত,
তথাপি মোর নাইকো কোনও খেদ ;

কুড়িয়ে নিতে লাগল বটে কাদা,
কিন্তু তা রয় গরবটিকা হয়ে :
ধুলায় ভয়ে পিছিয়ে যাবে হ'টে
মাটির ছেলে মায়ের পরিচয়ে ?
দেবতা তোদের হরণ করেন মধু
ফোটাফুলের গোপন বক্ষ হতে,
মাথায় মুকুট পরেন আমার বঁধু
গোটাফুলে, বনের পথে পথে।
যাহার তরে এই মালাটি গাঁথি,
সে যে আমার নিজের প্রতিচ্ছবি,
অচিন সে-জন, বেঠিক পথের সাথী,
অধমতার, নীরবতার কবি।
দেবতা লউন নিজের অর্ঘ্য বেছে,
তাঁরে আমার কিসের প্রয়োজন ?
যে লবে এই প্রেমের মালা যেচে,
তার তরে মোর ধন্য আয়োজন !

২০ জুলাই ১৯২৫

উত্তমর্ণ

এখনও সুদূরে শুনি ক্বচিৎ তর্জন,
ভবিতব্যপ্রপীড়িত স্তব্ধ রাজধানী ;
মুগ্ধ চৈত্র রজনীর মাধুরিমা হানি,
জিঘাংসা শোণিতপায়ী করিছে গর্জন।
কারুণ্য-ঔদার্য-মৈত্রী-শিষ্টতা-সর্জন
অহিংসার উপদেশ, তিতিক্ষার বাণী
ভুলে গেছে পাশবিক অনাদি পরানী,
সভ্যতার ছদ্মবেশ করেছে বর্জন।

আমার ব্যথিত হিয়া চাহে চ'লে যেতে,
ক্ষুদ্রাত্মা নরের সঙ্গ করি পরিহার,
যেখানে মলয় আজও আম্রগন্ধে মেতে,
খেলে, নারী, ঘনশ্যাম কুন্তলে তোমার।

কবির মুখর গান তোমার নামেতে
খুঁজে পেল, অনামিকা, উত্তমর্ণ তার।

৪ এপ্রিল ১৯২৬

মানবী

দেবী ভেবেছিনু আমি যে তোমারে,
না-ও যদি তুমি দেবতা হও,
মানবী হয়েই থাকো চিরকাল,
প্রণয়িনী হয়ে হৃদয়ে রও।
আজি যদি দেখি তব পদমূলে
ভক্তি-অশ্রু-নিষিক্ত ফুলে
পূজিতে না পারি, তবুও তুমি তো
আমার হেলার যোগ্য নও।
বেদি ছেড়ে আজ নেমে এসো বুকে,
পূজা ছেড়ে আজ প্রণয় লও।

চলিতে চলিতে জীবনের পথে,
হয়ে থাকে যদি স্খলন ত্রুটি ;
প্রলোভনে যদি না পেরে জিনিতে,
প'ড়ে থাকো তার চরণে লুটি ;
অবসাদভরা মুহূর্তে শ্লথ
পেয়ে থাকো যদি সংযমগত

আত্মদানের চরম রভস,
কেন তাহে তিতে নয়ন দুটি ?
বলো উর্বশি, "ছিঁড়ে রশারশি,
পাইনু বারেক ক্ষণের ছুটি।"

পুণ্য ও পাপ মিছে পরিতাপ,
ব্যর্থ ধর্ম কর্ম নীতি ;
সময়-অনলে সব যায় জ্ব'লে
কুলকলঙ্ক দোষের স্মৃতি।
দেশ কাল তব ছিল প্রতিকূল,
হয়তো বা তাই ঘটেছিল ভুল ;
সুযোগ আসেনি, চরণ খসেনি,
তাই আমি সাধু, তাই তো কৃতী।
প্রলোভনে তুমি পরাজিত হয়ে,
শিখে নিলে তার জয়ের রীতি॥

কি বা তব দোষ ? কেন আফসোস ?
বিচার কে তার করিবে আজি ?
কোন্ চালনায় কোথা নিয়ে যায়,
ঠিকানা তাহার জানে না কাজী।
উদার অমল চন্দ্রমাসম
হৃদয়ে তোমার যদি অণুতম
রেখা থাকে, হায়, কি বা আসে যায় ?
ম্লান নাহি হবে কিরণরাজি।
চালানো তোমায় কাজ নহে মোর,
আমি কি জীবনতরীর মাঝি ?

দেবী ব'লে যবে ভাবিনু তোমারে,
ছিনু তোমা হতে সুদূরে অতি।

ভালো ক'রে আজ চিনেছি তোমায়,
মানবী হইতে কিসের ক্ষতি ?
আজি আসিয়াছ অহমিকাহারা,
নয়নের কোণে অনুতাপধারা ;
দেবী নহ আর, প্রেমভিখারিনী
সম্ভ্রমহীনা বিগতজ্যোতি ;
সমতার টানে টেনেছ আমারে,
আজি আমি সখা, নহি তো পতি ॥

২৩ অক্টোবর ১৯২৪

কৈফিয়ৎ

সুদূর শতাব্দীশেষে, জানি আমি, কোনও সপ্তদশী
আমার পুঁথির পানে নতমুখে বাতায়নে বসি,
লবে না উদ্দীপ্ত করি ম্রিয়মাণ দিনান্তের কালি,
সমব্যথাপরিপ্লুত দীর্ঘ নেত্রে প্রেমদীপ জ্বালি।
মিলিবে পণ্ডিত যবে সারগর্ভ জ্ঞানবিনিময়ে
চমৎকৃত সভাগৃহে, করিবে বিতর্ক অর্থ ল'য়ে,
তখন এ-যুক্তিহীন অকারণ বেদনাব্যঞ্জনা
শুনাবে প্রলাপসম, ক্ষিপ্ততার প্রত্যক্ষ দ্যোতনা।
দাসের স্বাতন্ত্র্যস্বপ্ন জানি হবে উপহাস্য, সখী,
ফাল্গুনবিপ্লবস্পর্শে জনারণ্য যখন পুলকি,
উঠিবে সহসা জ্ব'লে আকপিশ হরিৎ আগুনে।
হয়তো তখন লোকে মোর হীন জয়গাথা শুনে,
আমারে দুর্বল ভেবে, অনুদারস্বপ্নাবিষ্ট ব'লে,
মমতা করিবে কেহ, যাবে কেহ ঘৃণাভরে চ'লে।
আমার সুষমাহারা আত্মমুগ্ধ অকিঞ্চন গান
বিশ্বের সমক্ষে দিবে স্বল্পায়ুর অটল প্রমাণ।

একলব্যসম মোর দূর হতে সত্যের অর্চনা,
কর্মের অন্বেষণাকে নৈষ্কর্ম্যের শুধু আবর্জনা,
ক্ষোভের উচ্ছ্বাস গাঢ়, ব্যর্থতার চির নিদর্শন
নারিবে করিতে কভু জগতের হৃদয়স্পর্শন।
তবু কেন রচি গান?…যবে জরা জীবনের সাঁঝে
কম্পিত তোমার কর বিদ্রোহ করিবে গৃহকাজে;
যখন মলয়ানীত স্মরণের অস্পষ্ট সুরভি
উদাস হৃদয়ে তব জাগাইবে কল্পনীর ছবি,
যৌবনসখার মুখ আচম্বিতে মনে প'ড়ে গিয়ে,
সংগোপনে ত্রস্তহাতে শ্লথিত অঞ্চলপ্রান্ত দিয়ে
স্বর্ণাস্তবিম্বিত অশ্রু মুছে লবে আনত নয়নে;
তখন বসিয়া তুমি দক্ষিণের খোলা বাতায়নে,
শিথিল অঙ্গুলি দিয়ে পালটিয়া জীর্ণ পীত পাতা
বিস্মৃত পুঁথির মোর, সঙ্কালি পলিত রুক্ষ মাথা,
অকস্মাৎ নিরখিবে দীপ্তিদগ্ধ দৃষ্টিহীন চোখে
আমার অগাধ প্রাণ ক্ষুদ্র এক বৈদ্যুতিক শ্লোকে।
জানি আমি, আর, প্রিয়ে, জেনো তুমি সে-শুভ বাসরে
এ-স্তুতির ঠাঁই* নাই ধরিত্রীর কীর্তিত আসরে॥

২২ মার্চ ১৯২৬

অবিনশ্বর

বরষা পুন এসেছে ঘন গৌরবে:
কুহরি কেকী নাচিছে মেলি পুচ্ছটি,
মুক্ত মন সিক্তক্ষিতিসৌরভে,
দিকের সীমা মুছিয়া গেছে কুজ্ঝটি।

যুগান্তরে কদম পুলকাঞ্চিত
আবার যবে খুঁজিয়া পাবে ধন্যতা,

আমারই ভাগে সময়নেমীলাঞ্ছিত
পথের রজে ঘটিবে শুধু অন্যথা?

জলদযানে বৈতরণী উত্তরে'
যক্ষ যথা বিহরে আজও অনঙ্গে,
তেমনই আমি ভ্রমিব, সখী, সন্তরে'
নবোত্থিত মানসরসতরঙ্গে;
আমারও বাণী বাজিবে তব অন্তরে
বায়ুর গানে, মেঘের মৃদু মৃদঙ্গে॥

২৮ জুলাই ১৯২৩

স্মরণ

আমি যবে চ'লে যাব, তব দেহখানি
ঢাকিবে কি বৈরাগ্যের পাণ্ডুর অম্বরে?
সংকীর্ণ ত্যাগের ব্রত সর্বশ্রেষ্ঠ মানি,
উদ্দাম যৌবন তব রাখিবে সম্বরে'?
রাগদীপ্ত চুম্বনের বদলে প্রণতি
দিবে মোরে? পূজিবে কি মূর্তি প্রাণহীন?
প্রেম হবে কৃত্য ধর্ম? সেই অবনতি
নাহি মাগি। কোরো মোরে বিস্মৃতিবিলীন।

তবে যদি কোনও নব উৎসববাসরে
পলকের অবকাশ পাও, প্রিয়তমা,
অধমের অপূর্ণতা ত্রুটি করি ক্ষমা,
তাপহীন অশ্রু দিও, মোর নাম স্ম'রে॥

দহনের, সহনের বাকী কাল গুণে,
থেকো না মরণমুগ্ধ সজীব ফাগুনে।

৯ মে ১৯২৫

অভিসার

আমার স্মরণপূত সময়ের ধূলি
যত্নে কি রাখিবে, প্রিয়ে, করি সঞ্চয়ন,
নিশ্চল নিঃশব্দ রাতে ত্যজিয়া শয়ন,
ধরিবে ব্যাকুল বক্ষে, সম্পুটিকা খুলি ?
মনে ক'রে আধোভোলা মোর কথাগুলি,
অতীত ব্যথার তন্তু করিবে বয়ন ?
সহসা কিসের-স্মৃতি-বিহ্বল-নয়ন,
বসন চাপিবে মুখে অশ্রুতে আকুলি ?

বৈদেহী চেতনা সে কি রবে বস্তুমাঝে,
বদ্ধ হয়ে শোকস্তব্ধ তমিস্র ভবনে ?
মোরে যদি চাও, যেও হেমন্তের সাঁঝে
প্রথমদরশপুণ্য সে-কুঞ্জে সলাজে ;
হয়তো সন্ধ্যার রাগে, গুঞ্জিত পবনে
আমার বারতা পুন শুনিবে শ্রবণে ॥

১০ মে ১৯২৯

অভিব্যাপ্তি

তখনও দুস্তর মোহে ভেবেছিনু, নিগূঢ় মরমে
গুমরিছে নিরন্তর পূর্ণতার যে-দুঃস্থ অভাব,
তা, বুঝি, ভরিয়া দিবে সময়ের অজস্র প্রভাব।
অবিশ্রান্ত আঁখিজলে, ভেবেছিনু, ধুয়ে যাবে ক্রমে
মরণম্লানিমামাখা স্মিত তব ছবি, প্রিয়তমে ;
বসন্ত শরৎ বর্ষা, পত্রে পুষ্পে বিচিত্র স্বভাব,
পুঁথির অথবা দেশ, কল গান, কম্পিত রবাব,
ঢালিবে বিশীর্ণ পাত্রে বিস্মৃতির আসব চরমে ॥

দেখেছি দেখেছি, সখী, শয্যা ত্যজি বিনিদ্র নিশীথে
ভাদ্রের অপূর্ব চাঁদ অস্ত যায় নারিকেলচ্ছায়ে ;
হয়েছি আপনহারা কবিদের ব্যথিত সংগীতে ;
অশরীরী কল্পলোকে ভ্রমিয়াছি দ্বিধাগ্রস্ত পায়ে।

তবুও তোমারে, প্রিয়ে, ভুলি নাই ভুলি নাই আজও ;
ধরারে বাসালে ভালো, তাই তুমি সর্বত্র বিরাজো॥

২০ অগস্ট ১৯২৬

চিরন্তনী

কার লাগি আচম্বিতে অকারণ বেদনাবিধুর
মোর হিয়াখানি ?
সন্ধ্যার গগনে কোন্ সাবিত্রীর সিঁথির সিঁদুর
নিরখি, না-জানি !
গভীর অন্তরতলে বেজে ওঠে কার স্তবগান
অমনই অমনই ?
অচেনা অথচ জানা, প্রিয়তমা, প্রাণাধিক প্রাণ,
কে তুমি, রমণী ?

আমার তরঙ্গায়িত কল্পসিন্ধু করিলে মথন
দেবাসুরে মিলে,
প্রথম ফাল্গুনপ্রাতে অনুপম মুক্তার মতন
তুমি উঠেছিলে।
বিরহের অশ্রুধৌত তব দিব্য তনুর তনিমা
বৃথা বাসহীন,
পীযূষপেয়ালাসম উরসের উন্নত মহিমা
পূর্ণ নিশিদিন,

নিশাক্লান্তপাণ্ডুচোখে সুহৃদের দীপশিখা স্থির
নয়ন তোমার,
স্বর্ণাভবিম্বিত রক্তে বাঁধাহত পিপাসার নীর
ওষ্ঠ সুকুমার,
বিতর্কবিচারঘাতক সূক্ষ্ম তত্ত্ববুদ্ধির সংহার
ভুরু কুঞ্চনাতে,
অনাস্বাদ্য মুহূর্তের নির্বাণের ধ্রুব অঙ্গীকার
উরুতে বিরাজে ।

তুমি এসেছিলে, প্রিয়ে, করপদ্মে করিয়া বহন,
সুধা আর বিষ ;
একাধারে নিমন্ত্রণ, বিরহের অক্ষয় দহন,
শাপ ও আশিস ;
মিলনের প্রতিশ্রুতি, জীবনের ফেনিল মত্ততা
এক আঁখিকোণে,
প্রণয়ের অসমাপ্তি, মরণের নিঃসঙ্গ ব্যর্থতা
অপর নয়নে ।

আমার নিদ্রিত বক্ষে, হিমরিক্ত মেরুর প্রান্তরে
তব স্পর্শ লেগে,
রোমাঞ্চি উঠিল তৃণ, প্রাণস্পন্দ দূরে দূরান্তরে
ধেয়ে গেল বেগে ।
আত্মসংকোচের বাধা অকস্মাৎ গেল টুটে, লুটে
তোমার চরণে ;
অনঙ্গ মূরতি পেল ; অব্যক্ত আপনি বেজে উঠে
তোমার বরণে ।

ছুটে গেনু তোমাপাশে—কোথা তুমি ? এ শুধু শূন্যতা !
এ কেবলই মায়া !

আয়নার প্রতিবিম্বে চমকিয়া জাগে নীরবতা ;
কেঁপে ওঠে ছায়া।
সংহত অশ্রুর মতো কণাবাষ্প আতপ্ত ঘনিমা
ছুঁয়ে হেরি ওই !
অমৃতে বঞ্চিত হয়ে, কণ্ঠে শেষ বিষাক্ত নীলিমা।
কই প্রিয়া কই ?

তার পরে হল শুরু দেশে দেশে তোমার অন্বেষ,
যুগ যুগ ধরি,
গুণ্ঠনের তলে তলে, ভেদ করি কত ছদ্মবেশ,
উদ্বেগে শিহরি,
কত গূঢ় অন্তঃপুরে, রহস্যের অসীম অকূল
দুস্তর পাথারে,
মৌনের অজ্ঞাত কেন্দ্রে, বিভীষিকাবিপদসংকুল
আদিম কান্তারে।
অনন্ত নৈরাশ্যরন্ধ্রে নেমে গেছি তোমার সন্ধানে
অশ্রুর প্রপাতে,
সংজ্ঞার সূর্যাস্তদেশে, স্বিপ্নতার উৎপাদনস্থানে,
কণ্টকিত রাতে।
মহান্ মরণসনে মুখামুখি করেছি আলাপ,
জীবন্ত মৃত্যুরে
চেয়েছি অর্পিতে মাল্য, ত্যাগধিক্ক দ্রোহের প্রলাপ
হেঁকেছি বেসুরে॥

টুটে গেছে একাগ্রতা ; মাঝে মাঝে ভুলে গেছি ব্রত ;
বসন্তে নবীন
থেমে গেছি মধ্যপথে, পলাতক বালকের মতো
পাঠে উদাসীন ;
বিমুগ্ধ উন্মদ হাস্তে, কভু যোগ দিয়েছি উৎসবে ;
কিন্তু তা ক্ষণের ;

সহসা ভেঙেছে স্বপ্ন, অন্তমনে নিভৃতে নীরবে
ছুটিয়াছি ফের॥

করিয়াছি অন্বেষণ অমূর্ত তোমারে বারংবার
মাটির বিগ্রহে;
চঞ্চল চরণ তব গতিচ্ছন্দে অবগুণ্ঠিতার
হেরিয়াছি মোহে।
স্বর্গচ্যুতা বালিকারে এক দিন একাকিনী দেখে
হেমন্তের সাঁঝে,
তোমার স্বদেশী ভেবে, ল'য়ে গেছি সমাদরে ডেকে
শূন্য গৃহমাঝে।
নিবিড় নিশ্চল রাতে কৃশাঙ্গীর রসাল অধরে
সঞ্জীবনী পিয়ে,
অশান্ত তন্দ্রার ঘোরে ভাবিয়াছি, এতকাল পরে
ফিরে এলে, প্রিয়ে।
প্রদোষ এসেছে যেই, অপসারি মলিন আঙুলে
তমোযবনিকা,
অমনই হৃদয় ফেটে, বুঝিয়াছি শ্রান্ত আঁখি খুলে
সবই মরীচিকা॥

হয়তো বা ভুলে গেছ আজন্মের পরিব্রাজকতা
দুদণ্ডের তরে;
হয়তো তোমার লাগি সুচির ব্যথিত ব্যাকুলতা
থামিল অন্তরে:
হয়তো হিয়ার মোর স্তব্ধ মূক অবরুদ্ধ দান
দেওয়ার আমোদে
আত্মারে নির্মুক্ত ক'রে, ভার হ'রে, হল অবসান
অযোগ্যের পদে;
তাই কি উদ্ধত রোষে আজি মোরে ডাকো বারংবার,
ঈর্ষাপরায়ণা,

চঞ্চল চৈত্রের রাতে পাঠায়ে অবেক্ত সমাচার
করিছ উন্মনা ?
তোমার ভ্রূকুটি তাই শতমুখী চাবুকের মতো
গগনে আভাসে,
তোমার আকাশবাণী রুদ্র রবে সম্প্রতি জাগ্রত
কুলিশে প্রকাশে,
তোমার উড্ডীন কেশ, ধৃতফণা নাগিনীর প্রায়
ব্যাপ্ত নভে নভে,
তোমার সন্তপ্ত শ্বাস বেণুবনে আতঙ্ক জাগায়
বিপুল আরবে ॥

আজিকে এসেছ তুমি, উন্মাদিনী কালবৈশাখীর
মত্ত হাহাকারে
উপাড়ি আশ্রয়তরু, উড়াইয়া ল'য়ে গেছ নীড়
অশ্রুপারাবারে।
ফাল্গুনের বিস্মরণ, প্রগল্‌ভিত পলাশের রাগ,
পলের গরিমা,
আরামশয্যায় জড় বর্ষান্তের শিথিল নীরাগ
সান্দ্র মাধুরিমা,
চূর্ণ করি অকস্মাৎ, শব্দহীন রুক্ষ মরুস্থানে
প্রোজ্জ্বল বৈশাখে
নিয়ে যাবে ভ্রান্ত মোরে একাগ্র ধ্যানের অবধানে,
চিত্তহারা ডাকে ?

থেমেছে আহ্বান তব।   ভেসে আসে নিষিক্ত মলয়
থাকিয়া থাকিয়া
অরালকুন্তলশ্লথ কবরীর যে-ঘ্রাণ হৃদয়ে
গিয়েছ রাখিয়া।
তোমার নূপুরধ্বনি বাজে ওই ঝিল্লির নিঃস্বনে
দূর হতে দূরে।

তোমার নিখিল শান্তি নিশীথের বীর বরিষণে
সারা বিশ্ব জুড়ে॥

আবার তেমনই ক'রে মিশে গেলে অথও তিমিরে
আজিও, প্রেয়সী!
তোমার প্রমোদকুঞ্জ রচিত কি বৈতরণীতীরে,
হে মোর ক্রন্দসী?
তব নিমন্ত্রণ সে কি লক্ষ্যহীন পথের আহ্বান?
তোমার মিলন,
সে কি শুধু আমরণ অরূপের অন্তহীন ধ্যান,
চিরানুশীলন?

অমোঘ আদেশ তব বহি শিরে, চলিলাম ছুটে,
ঘুচায়ে অর্গল,
অজানার অভিসারে, বার্তাহারা ভবিষ্যসম্পুটে,
রিক্ত নিঃসম্বল।
অবীক্ষিত আবির্ভাবে সরণীর নিষ্পাপ শূন্যতা
রেখো, প্রিয়ে, ভ'রে;
হেনো মত্ত নটরাগ ভেদিয়া উদ্‌ভ্রান্ত নীরবতা
বীণাবৎ মোরে।
তার পরে শুভ লগ্নে নিভৃতে ধরিও মোরে বুকে,
যাত্রাসহচরী,
আত্মনিবেদনব্রতে, পরিপূর্ণ সংগমের সুখে,
আবেগে শিহরি॥

মৃত্যুর আড়ালে যেথা ক'রে পড়ে নিত্যসুধাধারা
দুরাশাসঙ্কিতা,
নীরবে মোদের দেখা হবে না কি পরিচয় সারা,
হে অপরিচিতা?

৩০ মার্চ ১৯২৬

পরিশিষ্ট

সুধীন্দ্রনাথের কোনো গ্রন্থের অন্তর্ভূক্ত হয়নি এমন কয়েকটি রচনা এখানে সংযোজিত হ'ল। এর মধ্যে 'অর্কেস্ট্রা'-পর্যায়ের "পুরস্কার" কবিতাটি এবং তাঁর সর্বশেষ সমাপ্ত অনুবাদ-কবিতা, হান্স্ এগন্ হোল্ৎহ্বজেন্-এর "মৃত্যুর সময়" ও টি. এস. এলিয়ট-এর "বার্ন্ট্ নর্টন"-এর প্রথম অনুচ্ছেদের দুটি অনুবাদ বুদ্ধদেব বসু-সম্পাদিত 'কবিতা' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল, আর "অমৃত" কবিতাটি ছাপা হয় অধুনালুপ্ত 'চিত্রাণী' পত্রিকায়।

পুরস্কার

সেদিন জানি না কেন চিত্ত তব উঠেছিল জেগে
জাতিস্মর প্রণয়ের প্রথম আবেগে,
অয়ি মোর স্বমিতা প্রেয়সী!
নিশি নিশি রুদ্ধ ঘরে ধূমাঙ্কিত প্রদীপের মসী
লাগিল কি সহসা দুঃসহ?
হঠাৎ স্মরণে এল অধরার অনন্ত বিরহ
বসন্তের অন্তিম হিল্লোলে?
কিংবা শুধু উৎসবের উগ্র উতরোলে
মদিরার পরিমাপে ঘটিল প্রমাদ?
বিধিবদ্ধ নিবৃত্তির বাঁধ
অকস্মাৎ চূর্ণ করি, তোমার চোখের তরলতা
ঘোষিল শিরায় মোর সৃজনের আদিম বারতা
নিশীথের কবোষ্ণ আঁধারে।
বারে বারে
নিবিড় চুম্বন বর্ষি মুখে বুকে স্তম্ভিত শরীরে,
বাসনা-পাত্তুর করি মোরে,
জাগাইলে প্রজ্বলিত হৃদয়গহ্বরে
আমার অন্তরতম গুহাবাসী উলঙ্গ প্রাণীরে।

তবু দিনু যেতে
তবু দিনু চ'লে যেতে সমাপ্তির সমীপ লগনে:

হৃদ মনে,
ও-বিশাল নয়ন-কুণ্ডেতে
যে-বিশুদ্ধ যজ্ঞানল নিরুদ্দেশ দেবতার খোঁজে
উঠেছিল নীরবে গরজে
অকারণে
প্রাথমিক উল্লাস তাহার
হয়েছে অঙ্গার।
স্থিতবুদ্ধি অভ্যস্ত বন্ধনে
তুহিন পঙ্গুতা আনে তোমার উন্মন আলিঙ্গনে ;
বিরস চুম্বনে
বিধুর বিরক্তি-তিক্ত নিরুপায় আত্মবলিদান ॥

উৎকণ্ঠিত প্রাণ
আবরিয়া দুঃস্থ যত্নে নিরন্তর নিরানন্দে হাসে,
বলেছিলে উন্মত্ত হতাশে,
"সমৃদ্ধ কুমারীতনু দিলেম তোমার অধিকারে ;
ধ্বংস ভ্রংশ করি তারে,
সন্তপ্ত সাম্রাজ্য তব হোক সেথা প্রতিষ্ঠিত ত্বরা।
দুরাশার মদগর্বে ভরা
ভুবনবিজয়ী মোর দিব্য ভবিষ্যৎ
দেয় যদি ছেড়ে দিক পথ
শান্তি-সুখ-কীর্তি-দ্বেষী ভবিতব্যতারে।
মোর পূর্ণ যৌবনভাণ্ডারে
দিক রুদ্র অনুতাপ আজি হতে সতর্ক পাহারা।"
পাগলিনীপারা
বস্ত্রহীন ত্রস্ত বক্ষে তুলে নিয়ে নত শির মম,
বলেছিলে রুদ্ধ কণ্ঠে, "ক্ষমো, সখা, ক্ষমো।
একেলা তোমারে বাসি ভালো।
জ্বালো জ্বালো
নিষ্প্রভ নয়নে তব পুন সেই অকম্পিত শিখা,

যার পানে
ছুটিবে পতঙ্গসম মৃত্যুর সন্ধানে
আমার নগণ্য ভয় তুচ্ছ লজ্জা ক্ষুদ্র অহমিকা।"

তাই দিনু যেতে ;
বিক্ষিপ্ত বসনখানি তাই তুলে অসাড় করেতে,
ঘিরিলাম নিরুপম নগ্নতা তোমার ;
শূন্যতার শোকাবহ ভার
উদ্‌ভ্রান্ত উরসে চাপি করিলাম তাই নিষ্পেষণ
বাসনার কর্কশ গর্জন।
জানি জানি,
জগতে কখনও যদি সে-নিশার বেদনা ব্যথানি,
লোকে ক'বে উপহাস করি,
নিপুণা নাগরী
করিল নির্দয় খেলা মোর মূঢ় পৌরুষের সনে ;
তবু হয় মনে,
সে-বন্ধ্যা বসন্তনিশা ব্যর্থ কভু নয় ;
প্রত্যেক নিমেষে তার খোদা আছে প্রেমের বিজয়।
আসক্তির শেষে
অকিঞ্চন উদাসীর বেশে
পশি যে-চতুর চোর হৃদয়ের উন্মুক্ত তোরণে,
আত্মহারা উৎসবের ক্ষণে
অলখিতে আজন্মের সম্পদ হরিয়া,
রেখে যায় ভাণ্ডার ভরিয়া
সমাপ্ত স্বপ্নের স্মৃতি, মরণের অধিক মরণ,
তাহার আসন্ন আগমন
তোমার অন্তর পথে আমি রোধ করেছিনু, প্রিয়ে,
সামান্য ত্যাগের বাধা দিয়ে।
পুরস্কার মম
পাণ্ডুর অধরপ্রান্তে অনিশ্চিত অচুম্বিতসম

কৃতজ্ঞ হাসির নম্র দ্যুতি,
সজল চোখের কোণে অমর স্মৃতির প্রতিশ্রুতি।

ক্যাভেন্‌ডাইস্‌ পার্লামেন্ট্‌স্ট্রীট্‌
ভিলনাভেন, ১৬ সেপ্টেম্বর ১৯২৯

অমৃত

হায় রে কবি, হায় রে উদাস কবি,
নিরুদ্দিষ্ট নামহারাদের কষ্টগোচর ছবি
বন্ধদ্বারের অন্ধকারে খুঁজবি কেবল মেলে জাগর আঁখি ?
পলাতকার প্রস্তরিত চরণচিহ্নটিরে
কৃপণ প্রাণের বিরল পূজা দিবি কি আজ শুষ্ক অশ্রুনীরে ?

দেখবি না কি
দেখবি না কি চারপাশে তোর আবহমান প্রাণ
পরিচিত লীলায় দীপ্যমান ?
সম্মুখে তোর স্তব্ধ মেঘের অগ্নিগিরি হতে
সরকারী ওই শ্রীহীন ইমারতে
স্বয়ং সূর্য আসছে নেমে সোনায় মোড়া হাজার ঘোড়ার রথে
রূপের আপদ দূরে রেখে কেরানীদের ক্লান্ত গড্ডলিকা
ওই ছুটেছে আগলঘেরা গোঠের অভিমুখে,
সংকরিকা
দলনপাণ্ডু ওষ্ঠাধরে আঁকছে সকৌতুকে
সান্ধ্য অভিযানের গুনাগুন শশব্যস্ত পথের শান্ত ধারে
লগননিষ্ঠ সে কার অভিসারে।

চলেছে ট্রাম, দৌড়েছে বাস, হচ্ছে উধাও মোটরগুলো হেঁকে,
পদচারীর ত্রস্ত শরীর ধূসর ধূলায় ঢেকে।
তুচ্ছ ক'রে নগরখানার তীব্র কোলাহল
সবার নাগাল ছাড়িয়ে উঠে অটল অচঞ্চল,

রাজবাগিচায় রিক্ত শিমুলচূড়ে
কোন্ অতনুর বসনপ্রান্ত আটকে হাওয়ায় উড়ে ?
ওরে উদাস কবি,
কেমনে আর নীরব হয়ে র'বি ?
যায় যদি যাক বন্ধুরা তোর একে একে চ'লে ;
দেয় যদি দিক পরানপ্রিয়া বরণমালা অন্য কা'রও গলে ;
আশা কুহকিনী
ভাঙা বুকের টুকরো নিয়ে খেলে যদি খেলুক ছিনিমিনি,
তবু কি তোর গান
চিরন্তন ওই শোণিমার করবে অপমান ?
আজকে সাঁঝের কান্নাহাসি থামবে যখন আর ফাগুনের সাঁঝে,
ওই যুবতীর প্রগল্‌ভ রূপ পঞ্চভূতের মাঝে
লুপ্ত হবে যেদিন একেবারে,
সেদিনও ফের নবীন কবির দ্বারে
আসবে শিমুল ফাগুনবেলার আগুন বহন ক'রে,
ওরে কবি, এই অমৃতে নে তোর প্রাণের স্থিতির অভাব ভ'রে ।

১০ মার্চ ১৯৩১

মৃত্যুর সময়

(হান্‌স্ এগন্ হোল্‌ট্‌হুজেন্-এর জার্মান অবলম্বনে)

আজও তবু পৃথিবীই আমাদের চোখ জুড়ে আছে ।
আরও আছে হেমন্ত – সন্তান উৎসৃষ্ট ও অনাগত
কালের শোণিতে, এবং প্রচুর পত্রে পীতাম্বর
প্রাঙ্গণপাদপ । অতএব একবাক্যে সকলেই
বলি, কী সুন্দর উদ্ভ্রান্ত বিহার ! এবং যে-শিশু
উপনীত বর্ষচতুষ্টয়ে, বর্তমান মুহূর্তে সে
পায় যে-আস্বাদ, তা সদা লোভাবে, কিন্তু ধরা দিয়ে
খেদ মেটাবে না : হেমন্ত ও অবস্থিতি, এ-নিবাস

যায় অবকাশ ধরিত্রীর ধূলি, তৃণস্তরে ঢেকে
জীবনযাপন, তথা নিসর্গের সচিত্র জাতক—
পার্বত্য প্রদেশ, মালভূমি, উপত্যকা বালুকায়
আমরা, অথবা রসিবিন্দু উজ্জ্বল সৈকতে, আসে
শিলা, ভূর্জ, জুনিপার, রিক্ত পথ প্রান্তরে তির্যক্,
পশমের কালো মোজা দাসীর দু পায়ে, বহির্বাসে
ছাগের উৎকট ঘ্রাণ ···বয়সের এই তো শৈশব॥

আশর্বরী ধারাপাত সমাপ্ত ক্রমশ নিরঞ্জন
সুপ্রভাতে, সর্বঘটে ক্ষয়ের মাধুরী, দিঙ্‌মণ্ডলে
প্রভাস্বর কার্তিক আসীন, আরিয়াদ্‌নি-পীসিয়ুস,
মোৎসার্তের সুবর্ণসংগীত—আবর্ত কোমল স্বরে,
সমে সমে সোনা; এবং এ-হেন দিনে স্থানান্তরে
সে-যুবতী, যার চিঠি পেয়ে উত্তর দাওনি তুমি,
নিজেকে নিক্ষেপ করে রাস্তার প্রস্তরে, আলিসার
নিষেধ না মেনে। কেউ কি সন্ধান রাখে আকাশের
রং সে-সময়ে চ'টে গিয়েছিল, কাচের আড়ালে
একে একে হাড়হিম জানেলার সারি ঢেকেছিল
হতভম্ব মুখ? কেউ জানে কেন বিশেষত আজ
রবিবারে প্রহৃত হিরণ্যগর্ভে মৃত্যুর মাদল?

৩১ ডিসেম্বর ১৯৫৯

টি. এস. এলিয়ট-এর 'বার্ন্‌ট্‌ নর্টন'

প্রথম অনুচ্ছেদের অনুবাদ

প্রথম লেখন

বর্তমান কাল আর ভূত কাল, উভয়ে বুঝি বা
বর্তমান ভাবী কালে, এবং আশ্রিত
ভাবী কাল ভূত কালে। যদি হয় নিত্য বর্তমান
সর্ব কাল, তবে সর্ব কালের উদ্ধার

অগত্যা অকরণীয়। ঘটনায় পর্যায়ে না উঠে
যা সতত ঘটনীয় থেকে গেল, তার
স্থিতি চির কল্পলোকে, সে কেবল বিমূর্ত ভাবনা।
যা ছিল সম্ভবপর একদা, এবং
যা আজ সম্পন্ন, [দুই] নিয়মিত নিত্য বর্তমানে।
স্মরণের যে-দালানে দৃক্‌পাত করিনি
এ-পর্যন্ত যে-কবাট খুলে
গোলাপবাগানে যেতে পারিনি, সেখানে
পদপাত তোলে প্রতিধ্বনি,
তেমনই আমার বাক্য প্রতিধ্বনি তোমার মানসে।
কিন্তু কার উদ্দেশ্যে জানি না, জানি না
কেন বিচলিত ধূলি পাত্রপূর্ণ গোলাপের দলে।

দ্বিতীয় লেখন

বর্তমান কাল আর ভূত কাল, উভয়ে বুঝি বা
বর্তমান ভাবী কালে, এবং আশ্রিত ভাবী কাল
ভূত কালে। যদি হয় নিত্য বর্তমান সব কাল,
তবে সর্ব কালের উদ্ধার অসাধ্য। যা ঘটমান
নয়, ঘটেনি রয়েছে শুধু সদাঘটনীয়, সে যে
চির কল্পলোকে ভাবনার বিমূর্ত বিকার। ছিল
যা সম্ভবপর একদা, এবং নিষ্পন্ন যা আজ,
দুই সন্নিবিষ্ট নিত্য বর্তমানে। কার পদপাতে
প্রতিধ্বনিপ্রহৃত স্মৃতির সে-দালান, যা কখনও
আমাদের আকৃষ্ট করেনি, সে-কবাট, যা পেরিয়ে
গোলাপ বাগান। তেমনই আমার বাক্য প্রতিধ্বনি
তোমার অন্তরে।

জীবনীপঞ্জি

জন্ম : ৩০ অক্টোবর ১৯০১ ; কলকাতা। পিতা : হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ; মাতা : ইন্দুমতী বসু মল্লিক (প্রবোধচন্দ্র বসু মল্লিকের কন্যা ও রাজা সুবোধচন্দ্র বসু মল্লিকের ভগিনী) ; খুল্লতাত : অমরেন্দ্রনাথ দত্ত।

শিক্ষা : আনি বেসান্ত-প্রতিষ্ঠিত থিয়জ্‌ফিকাল হাই স্কুল, বানারস, ১৯১৪-১৯১৭ ; ওরিয়েন্টাল সেমিনারি, কলকাতা, ১৯১৭-১৯১৮ (ম্যাট্রিকুলেশন, প্রথম বিভাগ, ১৯১৮) ; স্কটিশ চার্চ কলেজ, কলকাতা, ১৯১৮-১৯২২ (ডিস্টিংশন-সমেত বি. এ., ১৯২২) ; কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ল কলেজ, ১৯২২-১৯২৪ ; কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ইংরেজি বিভাগে এম. এ., ১৯২২-১৯২৩ ; পিতার কাছে অ্যাটর্নিশিপ-এ শিক্ষানবিশি, ১৯২২-১৯২৭। (এম. এ., বি. এল. অথবা অ্যাটর্নিশিপ-এর কোনোটিতেই পরীক্ষা দেননি।)

প্রথম বিবাহ : ছবি বসু, ২২ জুলাই ১৯২৪। (১৯২৫, মে মাসে একটি পুত্রসন্তানের জন্ম হয়, জন্মমুহূর্তেই শিশুটির মৃত্যু ঘটে।)

প্রথমবার বিদেশযাত্রা : ফেব্রুয়ারি-ডিসেম্বর ১৯২৯। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে জাপান ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ; একাকী য়োরোপের বিভিন্ন দেশ ; জর্মানিতে রোগ-ভোগ ও আরোগ্যলাভ।

'পরিচয়' প্রকাশ : শ্রাবণ ১৩৩৮। ১৯৩১। ত্রৈমাসিক অবস্থায় পাঁচ বৎসর ও মাসিক অবস্থায় সাত বৎসর সম্পাদনা করেন। দ্বিতীয় পর্যায়ে কিছুকাল (১৩৪৯-১৩৫০) হিরণকুমার সান্যাল যুগ্ম-সম্পাদক। ১৩৫০ আষাঢ়ের পর সম্পর্ক ত্যাগ।

অন্যান্য কর্ম : 'ফরওঅর্ড' দৈনিকপত্রের সম্পাদকীয় বিভাগে অবৈতনিক কর্ম : ১৯২৮-১৯২৯ (একই সময়ে কলকাতায় অনুষ্ঠিত ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের অধিবেশনের প্রচারবিভাগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ; 'সবুজপত্রে'র নবপর্যায়ের সঙ্গে সংস্রব : আশ্বিন ১৩৩২ থেকে পত্রিকার বিলুপ্তি পর্যন্ত। লাইট অব এশিয়া ইনশিওরেন্স কোম্পানি : ১৯৩০-১৯৩৩ ; এ. আর. পি : ১৯৪২-১৯৪৫ ; 'স্টেটস্‌ম্যান'-এর সহকারী সম্পাদক : ১৯৪৫-১৯৪৯ ; দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশনের প্রচার-সচিব : ১৯৪৯-১৯৫৪ ; ইনস্টিট্যুট অব পাব্লিক ওপিনিয়ন-এর কলকাতা শাখার পরিচালক : ১৯৫৪-১৯৫৬ ;

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে তুলনামূলক সাহিত্যবিভাগে অধ্যাপক : ১৯৫৬-১৯৫৭ ও ১৯৫৯-১৯৬০ (মধ্যবর্তী দুই বৎসর প্রবাসে)।

দ্বিতীয় বিবাহ : রাজেশ্বরী বাসুদেব ; ২৯ মে ১৯৪৩।

দ্বিতীয়বার বিদেশযাত্রা : এপ্রিল-সেপ্টেম্বর ১৯৫২ ; য়োরোপের বিভিন্ন দেশ।

তৃতীয়বার বিদেশযাত্রা : ১৯৫৫-১৯৫৬ ; য়োরোপের বিভিন্ন দেশ।

চতুর্থবার বিদেশযাত্রা : ১৯৫৭-১৯৫৯ : জাপান, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, য়োরোপের বিভিন্ন দেশ। (শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের সংলগ্ন হ'য়ে প্রায় সাত মাস অবস্থান করেন।)

মৃত্যু : ২৫ জুন ১৯৬০।

গ্রন্থপঞ্জি

কবিতা :

১. তন্বী : প্রথম সংস্করণ ১৩৩৭। প্রকাশক : সুধীরচন্দ্র সরকার, এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স, ১৫ কলেজ স্কোয়ার, কলকাতা।

২. অর্কেস্ট্রা : প্রথম সংস্করণ সেপ্টেম্বর ১৯৩৫। প্রকাশক : কুন্দভূষণ ভাদুড়ী, ভারতী ভবন, ৯ রুস্তমজী স্ট্রীট, কলকাতা। দ্বিতীয় সংস্করণ (পরিবর্তিত) মার্চ ১৯৫৪ : বৈশাখ ১৩৬১। প্রকাশক : দিলীপকুমার গুপ্ত, সিগনেট প্রেস, ১০।২ এলগিন রোড, কলকাতা।

৩. ক্রন্দসী : প্রথম সংস্করণ ১৩৪৪। প্রকাশক . কুন্দভূষণ ভাদুড়ী, ভারতী ভবন, ১১ কলেজ স্কোয়ার, কলকাতা।

৪. উত্তরফাল্গুনী : প্রথম সংস্করণ ১৩৪৭। প্রকাশক : কুন্দভূষণ ভাদুড়ী, পরিচয় প্রেস, ৮বি দীনবন্ধু লেন, কলকাতা।

৫. সংবর্ত : প্রথম সংস্করণ জৈষ্ঠ ১৩৬০, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৩৬২। প্রকাশক : দিলীপকুমার গুপ্ত, সিগনেট প্রেস, ১০।২ এলগিন রোড, কলকাতা। নিখিলবঙ্গ রবীন্দ্র-সাহিত্য-সম্মেলনের নির্বাচনে ১৩৬০ সালের শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থরূপে সম্মানিত।

৬. প্রতিধ্বনি : প্রথম সংস্করণ ফাল্গুন ১৩৬১। প্রকাশক : দিলীপকুমার গুপ্ত, সিগনেট প্রেস, ১০।২ এলগিন রোড, কলকাতা।

৭. দশমী : প্রথম সংস্করণ বৈশাখ ১৩৬৩। প্রকাশক : দিলীপকুমার গুপ্ত, সিগনেট প্রেস, ১০।২ এলগিন রোড, কলকাতা। পিছনের মলাটে প্রকাশকের নিবেদন : "সুধীন্দ্রনাথের পরবর্তী কাব্যগ্রন্থে এই কবিতাগুলি সংযোজিত হবে। এই কারণে 'দশমী'র পুনর্মুদ্রণ সম্ভব হবে না।"

প্রবন্ধ :

১. স্বগত : প্রথম সংস্করণ ১৩৪৫। প্রকাশক : কুন্দভূষণ ভাদুড়ী, ভারতী ভবন, ১১ কলেজ স্কোয়ার, কলকাতা। উৎসর্গ : 'ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের করকমলে'। "সূচনা" ব্যতীত পাঁচটি অংশে বিভক্ত, প্রবন্ধের সংখ্যা ১৯। প্রবন্ধের নাম : কাব্যের মুক্তি, ধ্রুপদ-খেয়াল, ছন্দোমুক্তি ও রবীন্দ্রনাথ, ডি-এইচ্ লরেন্স্ ও ভর্জিনিয়া উল্‌ফ্, ফরাসীর

হার্দা পরিবর্তন, উইলিয়ম্ ফকনর, উপন্যাসে তত্ত্ব ও তথ্য, মাক্সিম গর্কি, দোটানা, বর্নার্ড্ শ, লিটন্ স্ট্রেচি, উইণ্ডাম্ ল্যুইস্ ও এজ্রা পাউণ্ড্, ঐতিহ্য ও টি-এস্ এলিয়ট্, ডব্লু-বি য়েট্‌স্ ও কলাকৈবল্য, জেরার্ড্ ম্যান্লি হপ্‌কিন্স্, 'বাংলা ছন্দের মূল সূত্র', 'অন্তঃশীলা', 'চোরাবালি', ঘূর্ণাবর্ত।

২. স্বগত: দ্বিতীয় (পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত) সংস্করণ আষাঢ় ১৩৬৪। প্রকাশক: দিলীপকুমার গুপ্ত, সিগনেট প্রেস, ১০।২ এলগিন রোড, কলকাতা। "সূচনা" ও "পুনশ্চ" ছাড়া পনেরোটি প্রবন্ধ; প্রাসঙ্গিক মন্তব্য: '"স্বগত"-এর প্রথম সংস্করণে রবীন্দ্রনাথ-সম্বন্ধে দুটো প্রবন্ধ এবং তিনখানা বাংলা বইয়ের সমালোচনা সন্নিবিষ্ট হয়েছিল। তার পর গ্রন্থকার কবিগুরু তথা বঙ্গসাহিত্যের সম্পর্কে আরও কয়েক বার লিখেছেন; এবং সেগুলো "স্বগত"-এর অন্তর্গত রচনাবলীরই সগোত্র। কিন্তু "স্বগত" বর্তমানেও এমন অতিকায় যে আবার তার কলেবরবৃদ্ধি বাঞ্ছনীয় নয়; এবং সেই জন্যে নূতন সংস্করণ থেকে প্রাগুক্ত পাঁচটা লেখা বাদ পড়ল। তৎপরিবর্তে অল্‌ডাস্ হাক্সলি ও ওমানির প্রসঙ্গে একটি নিবন্ধ এখানে স্থান পেলে; এবং সেটার বিষয় যেহেতু বিদেশী সাহিত্য, তাই উপস্থিত সংগ্রহে তার প্রবেশ অনধিকার নয়। 'পুনশ্চ'-ও আগন্তুক: তবে তার আবির্ভাব উপলক্ষঘটিত ব'লে, সে কৈফিয়তের অপেক্ষা রাখে না।' সূচি: সূচনা, কাব্যের মুক্তি ধ্রুপদ-খেয়াল, ডি. এইচ. লরেন্স্ ও ভর্জিনিয়া উল্‌ফ্, ফরাসীর হার্দা পরিবর্তন, উইলিয়ম্ ফকনর, উপন্যাসে তত্ত্ব ও তথ্য, মাক্সিম্ গর্কি, দোটানা, শুকচগাল, বর্নার্ড্ শ, লিটন্ স্ট্রেচি, উইণ্ডাম্ ল্যুইস ও এজ্রা পাউণ্ড্, ঐতিহ্য ও টি. এস্. এলিয়ট্, ডব্লু. বি. য়েট্‌স্ ও কলাকৈবল্য, জেরার্ড্ ম্যানলি হপ্‌কিন্স্, পুনশ্চ।

৩. কুলায় ও কালপুরুষ: প্রথম সংস্করণ আষাঢ় ১৩৬৪। প্রকাশক: দিলীপ-কুমার গুপ্ত, সিগনেট প্রেস, ১০।২ এলগিন রোড, কলকাতা। উৎসর্গ: 'আমার প্রথম শ্রোতাদের মধ্যে যিনি সত্ত্বগুণে ও অনুকম্পায় অদ্বিতীয় সেই ধীরেন্দ্রনাথ মিত্রের শ্রীকরকমলে'। সূচি: মুখবন্ধ, রবীন্দ্রপ্রতিভার উপক্রমণিকা, রবিশস্য, ছন্দোমুক্তি ও রবীন্দ্রনাথ, ঘূর্ণাবর্ত, দিনান্ত, উক্তি ও উপলব্ধি, 'অন্তঃশীলা', 'চোরাবালি', 'বাংলা ছন্দের মূল সূত্র', শিল্প ও স্বাধীনতা, মনুষ্যধর্ম, অদ্বৈতের অত্যাচার, বিজ্ঞানের আদর্শ, উদ্‌ভ্রান্ত, আঠারো শতকের আবহ, ভিক্টোরীয় ইংলণ্ড, অনার্য সভ্যতা, পিতা-পুত্র, প্রগতি ও পরিবর্তন।

সং যো জ ন

'সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কাব্যসংগ্রহ' প্রথম প্রকাশিত হয় বুদ্ধদেব বসুর তত্ত্বাবধানে নাভানা প্রকাশনসংস্থা থেকে ১৩৬৯ বৈশাখে। সে-বইতে বুদ্ধদেবের নাম সম্পাদক হিসেবে বিজ্ঞাপিত না-হ'লেও পাঠ ও সমতার নীতি নির্ধারিত হয়েছিলো তাঁরই নির্দেশে। প্রথম প্রকাশের চার বৎসর পরে ১৩৭৩ আশ্বিনে ভারবি প্রকাশভবন থেকে যে-মুদ্রণ প্রকাশিত হয়, তা নাভানা সংস্করণের অবিকল প্রতিরূপ। বর্তমান সংগ্রহটিও রাজেশ্বরী দত্তের ইচ্ছানুসারে বুদ্ধদেব বসু-প্রবর্তিত সংস্করণের আদর্শে মুদ্রিত হয়েছে।

সুধীন্দ্রনাথের জীবৎকালে কেবলমাত্র 'অর্কেস্ট্রা' ও 'সংবর্ত'-এরই দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। 'অর্কেস্ট্রা' ও 'ক্রন্দসী'র প্রস্তূয়মান পরবর্তী সংস্করণের জন্য কৃত সংশোধন ও পরিমার্জন এবং কবির ব্যক্তিগত সংগ্রহভুক্ত দ্বিতীয় সংস্করণ 'সংবর্ত'-এ কৃত একটি পরিমার্জন প্রথম থেকেই 'কাব্যসংগ্রহ'-এর মূলপাঠে গৃহীত হয়েছে। পূর্ববর্তী সংস্করণে একটি অসম্পূর্ণ পাঠান্তর সংকলিত হয়েছিলো; সেটিকে বর্জন ক'রে বর্তমান সংস্করণে পূর্ণতর পাঠভেদ নির্দেশিত হ'লো। একমাত্র "আদিনাগ" কবিতাটি ছাড়া যে-সব কবিতার রচনাকাল এতোদিন অজ্ঞাত ছিলো, সেগুলি নির্দেশ করা হয়েছে এ সংস্করণে। রচনাপঞ্জিতেও সঙ্গতির প্রয়োজনে কয়েকটি পরিমার্জন করতে হ'লো।

এই গ্রন্থের পাঠে বুদ্ধদেব বানান-সমতার যে-নীতি গ্রহণ করেছিলেন। দ্র ভূমিকার শেষ বাক্য, পৃ ৫০৯। সুধীন্দ্রনাথের পাণ্ডুলিপি পরীক্ষা ক'রে তার সমর্থন পাইনি। অহংকার শব্দটি ছাড়া অনুস্বার ও ব্যঞ্জনবর্ণ তিনি প্রায় কখনও বিশ্লিষ্ট বিন্যাস করেননি, ঙ-যোগে যুক্তবর্ণের ব্যবহারেই তিনি শেষ পর্যন্ত অভ্যস্ত ছিলেন। বরং তৎসম শব্দে হস্ চিহ্ন ও বিসর্গের ব্যবহার যে আবার ফিরিয়ে আনছিলেন, তারও প্রমাণ আছে শেষদিকের সংশোধনে। অবশ্য, সচেতনতা সত্ত্বেও তিনি—এবং 'কাব্যসংগ্রহ'-এর সংকলক—যে সর্বদা সমতা রক্ষা করতে পেরেছেন, তা বলা যায় না।

পাঠান্তর নির্দেশের ক্ষেত্রে শব্দগত পরিবর্তনই প্রধানত দেখানো হয়েছে। অন্যান্য যে-সব পরিমার্জন তিনি করেছিলেন, অথচ পাঠান্তরে নির্দেশিত হয়নি, সেগুলি সূত্রাকারে সাজিয়ে দিলাম:

১. সংশোধনকালে প্রায় প্রতিটি পংক্তিতেই সুধীন্দ্রনাথ বিরামচিহ্নের পরিবর্তন করেছিলেন, তাই পাঠান্তরে সেগুলি নির্দেশিত হয়নি।

২. যে-সব ক্রিয়াপদের উচ্চারণে শেষে ও-স্বর যুক্ত হয়, সুধীন্দ্রনাথ প্রথম দিকে সেগুলি ও-কার দিয়ে লিখতেন। ক্রমে কেবলমাত্র মধ্যমপুরুষ সামান্যার্থে ক্রিয়ার নিত্য বর্তমান রূপ ছাড়া অন্য সর্বত্র ও-কার বর্জন করেন।

৩. বানানে দ্বিত্বও তাঁর পরবর্তীকালের রচনায় বর্জিত হয়েছে।

৪. কয়েকটি ক্রিয়াপদের চলিত রূপ থেকে তিনি আবার স'রে এসেছিলেন সাধুরূপে। যেমন, ফুরোয়>ফুরায়, লুকোয়>লুকায় ইত্যাদি।

৫. সর্বনাম ক্রিয়াবিশেষণে গুরুত্ব নির্দেশ করতে সুধীন্দ্রনাথ যেখানে স্বর-চিহ্ন ব্যবহার করতেন, পরবর্তীকালে সেখানে পৃথকভাবে পূর্ণাঙ্গ স্বরবর্ণ ব্যবহার করেছেন। যেমন, আজো>আজও; এখনো>এখনও ইত্যাদি।

৬. বিদেশী শব্দের অক্ষরান্তরণে পুরনো রীতি যে তিনি বর্জন করছিলেন, 'অর্কেষ্ট্রা' থেকে 'অর্কেস্ট্রা' পরিবর্তনই তার যথেষ্ট প্রমাণ।

পংক্তিসংখ্যা কবিতার শিরোনাম ও রচনাকাল বাদ দিয়ে গণনা করা হয়েছে। 'অর্কেস্ট্রা'র ভূমিকা দ্বিতীয় সংস্করণেই প্রথম গ্রথিত হয়েছিলো। সেটি বাদে অন্য সর্বত্র দ্বিতীয় সংস্করণে করা পাঠভেদ ১ সংখ্যা দিয়ে চিহ্নিত হ'লো।

অর্কেস্ট্রা

পৃষ্ঠা/পংক্তি	প্রাক্তন পাঠ
৩/১৫	উক্ত প্রক্রিয়া গবেষকের বোধগম্য হলেও, বুভুক্ষার
২১	স্পষ্টতই প্রাতিস্বিক। তবে এখানে
৪/২০-২১	যে ওই ভাবে, অত আস্তে আস্তে, লিখতে চাইলে, আমার
২৪	এবং বই বেরোলে, তাঁর
২৫	পাণ্ডুলিপি পড়ার পরে 'অর্কেস্ট্রা'-র
৫/১২	সহজ হয় না, উক্ত সঙ্গমের দিকে এগোতে চাইলে, নিজের
১৩-১৪	প্রতীক-রূপে দেখা দরকার; এবং
৬/১২-১৩	অন্তত তাই হর্বর্ট্ রীড্-এর সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত; এবং তিনি দেখিয়েছেন
৭/ ৩	বোঝার চেষ্টাও দেখি না,

১১/ ৩ অস্তগত সবিতার মেঘমুক্ত মাঙ্গলিক দ্যুতি

১০-১১ তাহারা আজিকে যেন লভিয়াছে অপূর্ব্ব মহিমা।
আমার সঙ্কীর্ণ আত্মা অতিক্রমি দর্শনের সীমা

১৪-১৫ পরাণের ছিদ্রে ছিদ্রে পরিপূর্ণ অনবদ্য সুর ;
জানি, মোহ মুহূর্ত্তের শেষ হবে নৈরাশে নিঠুর,

২১ ফুটিবে শাখায় মোর দুঃখ হাসি, সুখের ক্রন্দন,

১২/১৩ বিগত জীবন সাঙ্গ হলো কি

২৩ বিরহ বিরাজে দলিত বাসকে,

১৩/১০ এসেছো বিনিদ গহন রাতে।

২০ তোমারি নয়ন লক্ষ্যহারা।

২৫ ডাক দাও মোরে উদ্ধত প্রেমে,

২৬ লগ্ন অতীত দেখি পথে নেমে ;

১৪/ ২ চলে যাও তুমি অগম দূরে।

৪ আসনে আজি কি, ছলনাময়ী,

১০ রচনা করাবে শূন্য পীঠে ?

১৪ ফেনিল-মদির-রক্ত জনতার উদ্বেল উল্লাস,

১৫/ ১ সে-স্তব্ধ চৈতন্যখানি বৃথা ডেকে আজি দিশাহারা,

৩ ভ্রাম্যমাণ আলেয়ারে ভেবেছিলো বুঝি শুকতারা,

১৫/ ৮-১২ নিগূঢ় অন্তরতলে যে-বুভুক্ষ রাবণের চিতা
দানব-আত্মারে মোর অহরহ করিছে দহন,
তাহার ইন্ধন,
ভাবো, জোগাইলে তুমি যুগে যুগে জনমে জনমে ?
প্রিয়তমে,
ভাবো কি তোমারি লাগি
থাকি জাগি

১২ ২ : ভাবো জাগি

১৪ ভাবো কি, রমণী,

১৬ উদ্বেল মরমে মম ত'রে দেয় স্বর্গবিজিগীষা ?

১৮ মরণের নিরিক্ততা কেঁদে ওঠে প্রাণের গহনে ?

২২ বিকারে বিক্ষোভে
মনে রবে,
১৬/ ৪ একদা যে এঁকেছিলে অকুণ্ঠিত করে
সনাতন মুহূর্তের তরে
নিষ্কলুষ চুম্বনের অস্থাবর টীকা,
৬ মনে রবে সেই কথা, প্রেমার্ত ক্ষণিকা।
৯ বিপুল অম্বর মোর পরিপূর্ণ হয় নাই কভু ;
১০ মোর হিংস্র অতল অভাবে
১২ সীমাভুক্ত শূন্যতার রেখে গেছে প্রত্যক্ষ প্রমাণ।
১৪-২১ নীরব-আকাঙ্ক্ষা-ভরে এসেছিলে তুমি, শুচিস্মিতে,
বধূবেশে বাসরশয্যায় ;
কম্প্র অলক্তায়
অনুপম কৌমার্য্য তোমার
অযাচিতে মোর পদে চেয়েছিলে দিতে উপহার।
সংস্কারের প্রাক্তন তিমিরে
মদমত্ত হয়ে ফিরে
অসভ্য অরণ্যবাসী আসুরিক যে-তীব্র যৌবন,
তাহার অনন্ত অন্বেষণ
তাই নহে তোমা লাগি, হে দাক্ষিণ্যময়ী।
১৬/২৩ প্রবল আহ্বানে যার প্রতিধ্বনি তোলে অবিরত,
২৫-২৭ নম্র নেত্রে রক্ত মুখে, বাজাইয়া কুণ্ঠিত কিঙ্কিণী।
সে যে নিঃশঙ্কিনী,
জনাকীর্ণ পথ মধ্যি চলে,
১৭/ ৮ উচ্ছিষ্ট প্রেমের কণা আহরিতে অনাম ক্ষুধায়।
১০ বেণুবৃক্ষ ফণীসম অজানার গুপ্ত অভিসারে।
১৪ উৎসুক প্রত্যাশা মোর শূন্য দিগন্তরে
১৮ সৃজনপ্রলয়ময়ী সে-অলখ আগ্নেয়াদ্রিশিখা
২৩-২৪ হায়, প্রিয়ে, হায়,
সে-অমর্ত্য উন্মাদনা অচিরাৎ পলালো কোথায় ?

২৮ তেমনি সে-বর্বর যাতন
এলো না চরম লগ্নে, আসি আসি করি।
১৮/ ১-৮ তপ্ত গণ্ডে পাণ্ডুরতা ভরি
হলো তব আননে প্রকাশ
স্বার্থপঙ্গু সংসারীর অহেতু ত্রাস,
ক্লীবের নিষ্পুণা প্রত্যাখ্যান
তাই মোর প্রজ্বলিত যৌবনের যজ্ঞাগ্নি মহান
রিক্তাকাশে
প্রসারে কম্পিত বাহু অনামিক দেবতার আশে।
সে-চির অচেনা,
জানি জানি, কোনোদিন আমার হবে না;
১০-১১ আমার উদ্যত অর্ঘ্য, প্রেয়সী, তোমার লাগি নয়॥
লজ্জার নিঃসার ছল, আচারের ব্যর্থ ব্যবধান
১৪-১৫ কখনো আর [illegible], প্রিয়ে, মিলিবে না তাহার সন্ধান।
সেই যে চরম চাওয়া বিস্ফারিয়া পাটল নয়ান,
১৮ শাশ্বত স্মরণে তব তাহাদের নাই নাই স্থান॥
১৯/ ৫-৮ গাঢ় স্বরে পুলকিয়া পাইনের বন
আমি নাতি করো —
"মহেন্দ্রের দীপ্ত সিংহাসন
চাহি না, চাহি না যদি অন্তরের অন্তঃপুরে তব
পরিত্যক্ত স্থানটুক দাও, প্রিয়ে, মোরে"।
১০ ক্ষণে ক্ষণে
ছড়ায়ে শিথিল হস্তে পুষ্পিত প্রান্তরে
১৯/১২ নির্লাজে ভাবানু অশ্রু মুছি অবিরল
১৬-১৮ আজি হতে আমার আকাশ
হতবুদ্ধি পিপাসার আবশ্যিক আত্মপ্রবঞ্চনে
স্বপনবপনে
দুষ্প্রবেশ মরুকুঞ্জ রেখে দিবে চিত্রার্পিত ক'রে
পলাতক শূন্য দিগন্তরে"।

২১ কভু ব্যর্থ কথার মাতনে
সে-অভিরঞ্জনে
২২ ফুটায়েছি তপ্ত রাগ অবলুপ্ত প্রেয়সীর কানে
২০/ ১-৩ সে-নাট্যের মোহন পরশে
আজি আর জাগাবো না ও-নীলিম-ধূসর দরশে
প্রেমাশ্রুর মুগ্ধ মরীচিকা ॥
৪ আজি কবো,
নির্মোহ বিদায়লগ্নে নিঃসংকোচে আজি আমি কবো—
৬ অরূপ স্মরণ তব চাহিবো না করিতে শাশ্বত।
১১ হে সখী, প্রবৃত্তি হ'লে আমারে ভুলিও,
১৪ ২ : আর যদি পারো শুধু মনে রেখো এইটুকু কথা—
১৬ নিঃস্রোত জীবনপঙ্কে হয়েছিলো উন্মার্গ অচল,
১৮ এনেছিলে উজাড়িয়া আজন্মের সামান্য সম্বল
২০ স্মিত হেসে নিষ্কাম সংকেতে
২৬-২৭ একদা আমার বক্ষে অলক্ষিত নূপুরের ধ্বনি
জাগাইয়াছিলো আচম্বিতে ;
২১/ ১ যাহার আহ্বানলিপি প্রতিভাসি বাসরপ্রাকার
এনেছে আশ্লেষে মোর দুর্জ্ঞেয় ব্যবধি :
২ বারম্বার
যে-নির্ব্বাক অমৃত দরদী
৬-৭ আয়ত আঁখির তব নীলাম্বু সায়রে
আপনার প্রতিবিম্ব ফেলিয়াছে চপল খেলায়।
১৭ এ-মিলন অনবদ্য, এ-বিরহ অনির্ব্বচনীয়
২০ ব্যবধি বর্দ্ধিষ্ণু জেনে অঙ্গীকার নির্ব্বোধ বিদ্রূপ ॥
২২/ ১ তোমারি অকাম প্রেম জীবনের নিশীথ বিরলে
২ মূল্যহীন ক'রে দিবে আজন্মের সঞ্চিত সুকৃতি ॥
৬-৭ শুনিলাম বারে বারে,
শুনিলাম বিপাশার প্রণব আহ্বান।
৮ অনাম আদিম ত্রাসে উৎকণ্ঠিত নিরাশ্রয় প্রাণ,

১২-১৩ মুখে তার রটে
উচাটন নিগম গর্জন।
১৪ তরুণ মাতনে ভরা বিঘূর্ণিত নীলিম নয়ন
১৭-২৩ লক্ষ হয় উর্মিল কুন্তলে।
পদতলে
প্রশান্ত সুন্দর শিব নিয়ত নিদ্রিত।
খরশান খড়্গে মুকুরিত
সৃজনের প্রথম ভাস্কর।
বর্বর দেবতা কোন্ তাহার অভীষ্ট অধীশ্বর,
যার ক্ষুধা মিটাবার তরে
যুগে যুগান্তরে
সে ফিরে সন্ধান করি তপ্তরক্ত বলি॥
২৩/ ২-১৩ যেন বন্ধ হয়ে এলো বুকে।
প্রতি রোমকূপে
মৃত্যুর তুহিন ঝড় জাগাইয়া প্রচণ্ড হুঙ্কার,
আসিলো করিতে অধিকার
কম্পমান হৃদয়ের নিঃসঙ্গ শূন্যতা।
চারিদিকে মৌন নীরবতা
আরম্ভিলো কানাকানি নিবিড় ভাষায়
উপশায়ী বিভীষিকাসনে।
মনে হলো, অসীম গগনে
ভয়ার্ত নক্ষত্রদল ছুটিয়া পলায়,
দূর হতে দূরান্তরে মুমূর্ষুর সংক্রমণ ছাড়ি।
উন্মন আলসে
অনন্তের সীমান্তরে ব'সে,
সুপক্ক দ্রাক্ষার মতো পরিণত আয়ুরে নিঙাড়ি,
মনে হলো, খেলা করে ত্রিকালের স্বামী
শুনি যেন আমি,
দেখি যেন মুদ্রিত নয়নে,
ক্ষণে ক্ষণে

২৩/১৫ হয়ে যায় নিরুদ্দেশ

১৯ আচম্বিতে তুমি এসে প্রবেশিলে প্রেতপূর্ণ গৃহে।

২৫ থেকে করিলে যে-দিব্য অঙ্গীকার,

২৪/ ৩ বুঝো নাই, অনভিজ্ঞা, হয়তো বা তাৎপর্য্য তাহার ;

হয়তো বা দেখো নাই ভাবি

অনন্ত-অভাব-পূর্ণ সর্ব্বগ্রাস্ত যৌবনের দাবি,

মিটিবে না ক্ষণিকের আত্মবলিদানে।

তবু তব বিশাল নয়ানে

উচ্ছৃঙ্খল

বিপাশার জল

হারাইয়া তটের পীড়ন,

সম্বরিলো রুদ্র মূর্ত্তি সত্তাভানাশন,

ভুলিলো প্রাক্তন হিংসা, হ'য়ে গেলো শান্ত সুনির্ম্মল।

১৩-১৫ সেদিন আমার পাশে তুমি এসে একেলা দাঁড়ালে,

সাবিত্রীর মতো নিঃশঙ্কিনী,

বিদেশে, বিপন্ন ক্ষণে, অকারণে, অয়ি সুহাসিনী।

১৭ ধ্রুবতারা প্রতিজ্ঞায় করিবো না লঘু তার মান।

২০ করিবে বীভৎস নৃত্য আজন্মের নিষ্ফলতা যত,

২১ তুয়ার বাহিরে

২৬ মৃত্যুর বিজয় হতে উল্লসিত আত্মপরমাদ।

২৫/ ১ সীমাহীন শূন্যতার মাঝে

৫ শীর্ণ তরুবীথিকারে ভূমিসাৎ করে অন্ধকার,

১২ তুমিও সে-পথযাত্রী, শত পাছ গেছে বিস্মরণে

১৫ ১৬ জ্বালি ধূমাঙ্কিত দীপ এক রাত্রি তাহাদেরি মতো।

তুমিও উধাও হবে সাথে লয়ে অন্তিম সান্ত্বনা—

২৬/১৯ কন্দর্প কুসুমাস্ত্রসম অধরের অঙ্কিত কার্ম্মুকে

২৭/ ৮ সহে না আশার ভার, করে, হায়, বিদ্রূপে বিব্রত।

১০ সে-সত্য জানার আগে মিলনের লগন ফুরালো,

১২ হে মোর স্বপনসাথী,

২৮/ ২-৪ বন্ধু শিরে দাঁড়াইয়া উঠি
রেখেছিনু স্পর্শমণি ছড়ায় বিধাতা মুঠি মুঠি
পরিকীর্ণ গগনে গগনে ;
৮ উপলব্ধি করেছিলো আঁধারের অলক্ষিত পটে
১৬-১৭ প্রতিশ্রুত নন্দনের পরে
মরুভূর মরীচিকা পরিহাস করে।
২১ তবু তুমি এসেছিলে প্রথম অশ্রুর মতো
২৫-২৬ ফিরায়ে এনেছে আজি সেই মোর জন্মজন্মকার
নির্বিকল্প প্রলয়ের সর্বনাশ করি ;
২৮-২৯ হারায়েছে ব্রহ্মাণ্ডের প্রকাণ্ড ছবিতে
আপাত-শৃঙ্খলা শূন্য স্বৈরবৃত্ত রেখার সঙ্গতি ॥
২৯, ১-৮ জানি না তোমারে কেন বেসেছিনু ভালো।
শুধু জানি, পার্থিব প্রেমের আলো
ভুলায়ে অমৃততৃষা মত্ত রাখে আমাদের শিখালো
আনন্দের গূঢ় অভিপ্রায়
বুঝিলাম অনাদৃত প্রমোদের কথায় কথায়
কে জন্মান্ধ রচে যেন সে-অমৃত আভূষণখানি
হে মোর ক্ষণিক প্রিয়া, জানি আরো জানি,
নিত্য বসুন্ধরা
তোমারি উপমা ব'লে মোর চক্ষে আজিকে সুন্দরা ॥
৯ ভেবেছিনু উদ্‌ভ্রান্ত স্পন্দ
১১-১২ ভেবেছিনু বিরহের অমিত অভাব
আত্মসাৎ করি লবে স্পন্দনের ভাবী আবির্ভাব ॥
১৭-১৮ ধরিত্রী অর্পিলো তার নিরুদ্দিষ্ট কুসুম-অঞ্জলি
ধৈর্যহীন অপব্যয়ে আপন চরণে .
২০ বেঁধে দিলো শ্রুতিগম্য ছন্দের বন্ধনে
৩০/ ১ কে যেন পরায়ে দিলো রজনীর কনকবলয়ে
৩-৪ সেদিনের মিলনপার্বণে,
সার্বভৌম দক্ষযজ্ঞে পড়ে নাই তাই মোর ডাক ॥
৫ আজিকে তো এসেছে বৈশাখ ;

৮ কেন আজি তবে
৩০/ ৯-১৩ বিশীর্ণ মাধবীকুঞ্জে বিবোধন রবে
কালের রাখাল ওই বাজাইছে নিমন্ত্রণবেণু ?
যেন কত যূথভ্রষ্ট ধেনু,
ঊর্ধ্বশ্বাসে
ধরার সীমান্ত হতে আসে, ধেয়ে আসে
অণু অণুতম
বিস্মৃত মুহূর্তগুলি মম।
১৫ উৎকণ্ঠিয়া বিদেশিনী নদীর পুলিন
১৮-১৯ দিলো চিরসুন্দরের দূতী,
ভ'রে ওঠে পরিব্যাপ্ত নৈঃসঙ্গের শ্রুতি
৩১/ ৩-৭ আবার ভুবন ভ'রে তুমি আসিলে কি,
হে মোর অনিত্য প্রিয়তমা ?
১৫ মুখর নদীর তটে, মর্মরিত পলাশকাননে,
১৭-২৩ শুষ্ক তৃণে
সদ্যস্নাত তনুখানি ছড়াইয়া শ্লথ অবসাদে,
নত শিরে, অশ্রুনীরে, অমিত বিষাদে
বলেছিলে, হে লীলাসঙ্গিনী,
অকপট শান্ত স্বরে আপনার অতীত কাহিনী।
সন্তপ্ত চুম্বনে মোর হানিয়া বিরতি,
শুরু করি প্রগল্‌ভ মিনতি,
ঈর্ষার দিনতা ভরি মজ্জায় মজ্জায়,
বলেছিলে শুষ্ক অলজ্জায়,
ওই বরতনু
পুষ্পধনু
কতবার করেছে বিক্ষত
সন্ধানি নিয়ত
অলক্ষ্য শায়কপুঞ্জ অন্তরীক্ষ হতে।
বলেছিলে, সে-নদীসৈকতে
মোর পূর্বে কোন্ ভাগ্যবান
তব যৌবনের কাছে লভিয়াছে কী মহার্ঘ দান।

৩২/ ২-৩ চেয়েছিলে মোর মুখপানে ;
অকস্মাৎ কানে
বেজেছিলো অধরার আকুতির মতো
৫ 'প্রিয়তম', 'প্রিয়তম' গাঢ় সম্বোধন ।
৭-১১ ভুলেনি অন্তরা, হায়, পারে নাই করিবারে ক্ষমা ।
তাই, প্রিয়তমা,
ভ্রূকুঞ্চিত আঁখি মোর দেখেছিলো ভবিষ্যতে চাহি
নাহি নাহি
স্মৃতির দাক্ষিণ্য সেথা, নাহি সেথা কোনো আকাঙ্ক্ষা ।
অয়ি সত্যব্রতা,
ভেবেছিনু নিতান্ত নিঃসার
ক্ষণিক খেলনা তুমি নিদারুণ মোর দস্যুতার ।
ভেবেছিনু তুমি
১৬-১৭ মোর রিক্ত যৌবনের পরিপুষ্ট করিয়া প্রণামে
ঘরে ফিরে অপচয় করিবে সে-ধন ॥
১৮-২৫ ভাবিনি তখন
আত্মপরবাদহীন সেদিনের তুচ্ছ ইতিহাস
ঘটাইবে মহাসর্বনাশ
ঋদ্ধিতে সিদ্ধিতে মোর, অনাগত ভবিষ্য আমার ।
মোর অহঙ্কার
সেদিন তোমার চোখে অতীতের ছায়া অবলোকি,
তাই বলেছিলে, সখী,
অন্তদাহ অভিমানে, কথঞ্চিৎ যাতনে,
"কেন তুমি রবে মোর মনে ?
আমি তো ক্ষণের সখা, শুধু এক চাপল্যের সাথী,
২৭-২৮ কোন নিরুদ্দেশে
ফুরালো স্বপনাবিষ্ট রাতি,
ফুটিলো প্রেমের কলি প্রত্যুষের অমৃত স্নানে
যে-রবির উদ্দীপ্ত কিরণে,

৩৩/ ১-৬ উজ্জ্বল জ্যোৎস্নায় লয়ে গেলো চলি,
রবে তুমি তাদের স্মরণে।
আমি শুধু মলয়ের তুচ্ছ অনুচর,
পথভ্রষ্ট লাঞ্ছিত ভ্রমর,
মধুরিক্ত কমলেরে করিলাম বৃথা প্রদক্ষিণ।
চিরদিন
কেমনে রহিবে মনে এ-সামান্য কথা?
নারীর প্রথম দানে স্মৃতি মোর নহে স্থায়ী-ভারানতা;
তাই তো সে ঈষদ বাতাসে
অসীম শূন্যের মাঝে লুপ্ত হয়ে যাবে অনায়াসে
বৃন্তহীন পল্লবের প্রায়"॥
৭-১৩ হায়, প্রিয়ে, হায়,
কোথা সে-দারুণ দম্ভ, সে-রূঢ়তা গিয়েছে কোথায়?
আজি মোর উদ্‌ভ্রান্ত স্মরণ
হেমন্তলুণ্ঠিত কুঞ্জে করিছে তোমার অন্বেষণ।
আজিকে জেনেছি, প্রিয়ে, জীবনের পরম সঞ্চয়,
নিক্রোধ নয়নে তব সেদিনের ব্যথিত বিস্ময়॥
১৫ এ-দিব্য বেদনাখানি
১৯ যে-মহান মৌন শোক করেছিলো স্পর্দ্ধায় ব্যাহত
২২-২৩ উপাড়ি মৃন্ময় মূল আনিলো আমারে
অতিক্রান্ত নৈরাশ্যের নিস্তব্ধ কিনারে,
৩৪/ ৯ কাজ নাই, হে বিধাতা, তোমার অমর বরে
তবে কাজ নাই।
১১-১৫ নিস্তাপ, নিষ্কম্প, নিত্য চিত্রার্পিত দীপের সমান
নির্ব্বিকার অনন্তের রিক্ত পটপরে।
প্রণয়ের প্রহসনে মুখ্যপাত্র যে-আত্মা দুর্ব্বল,
তাহার মঙ্গল
যদি অসম্ভব হয় আজিকার প্রলাপের মাঝে,
নির্ব্বাপিত সাঁঝে
এ-জ্বালারে ব্যঙ্গ করা যদি হয় অনন্ত উপায়
কৈবল্যপ্রাপ্তির, তবে লোভ নাই তায়।

১৭-২০ ফিরায়ে দিলাম আজি প্রতিশ্রুত নন্দনের চাবি।
মহেন্দ্রের বজ্রবহ্নি সংক্ষিপ্ত সংহারে
জাগাক অসহ্য জ্বালা পুন মোর বিক্ষুব্ধ আধারে ;
হে বিধাতা, করো প্রত্যর্পণ
২২ দাও দান
২৫-২৭ সুচির মুহূর্ততরে ধ্বংস ক'রে বিতর্ক বিচার,
করো মোরে মুখামুখি নির্বাক নিশাতে
৩৫/ ১ অনন্ত প্রতির মধ্যে রবে না সঞ্চিত।
১২ শুধু যেন, হে সুন্দরী, রহে অন্তঃশীলা
১৬ নিত্যনব ঝঙ্কারে আহ্বানি।
১৯ তুমি ভ্রান্তি যৌবনের, নহো নিত্য সৃষ্টির সুষমা ॥
২১ থেকে রুদ্র রোষে ধরেছিলো ধ্বংসের পিনাক ,
৩৬/ ৯ দেখেছিনু সারা দিনমান
অজস্র অলক্ষ্য বাণ
নিরাশ্রয় গগনেরে কাঁপাইছে দুর্দান্ত সংহারে ,
অতীন্দ্রিয় সে-তীক্ষ্ণ টঙ্কারে
অনাত্মীয়া নগরীর ধৃষ্টতা মুখরা
অবলুপ্ত হয়েছিলো ত্বরা।
তার পরে,
কখন না-জানি,
বাষ্পাকারে মিশেছিলো শূন্য দিগন্তরে
তাপতপ্ত কম্প্র দিনখানি ,
আচম্বিতে
অনির্ভর শ্রান্ত রবি লুটেছিলো পাংশুল ধূলিতে
কালীর চরণপ্রার্থী বৃন্তচ্যুত শীর্ণ জবাসম।
প্রাণ মম
ভরেছিলো দুঃস্থ সংবেদনে ;
হয়েছিলো মনে
মরুগ্রস্ত পুরী যেন ভাষাহীন প্রেতের ক্রন্দনে

১৬-২৩ অকস্মাৎ প্রলয়ের পথে
দৈবাৎ সাক্ষাৎ হলো তোমার আমার।
অকস্মাৎ তব নেত্র হতে
ঝরিলো অমৃত অশ্রু, ধেয়ে এলো উর্বর উচ্ছ্বাস
শ্মশানের ভস্মস্তূপে তীব্র বন্যাবেগে।
মৃত্যুর দুঃস্বপ্ন থেকে অকস্মাৎ উঠেছিলো জেগে
আবিষ্ট নাগরী যেন চমকিত কান্তার সমান
২৫ অকস্মাৎ চারণ সমীর
উপহার দিলো আনি মৃত্যুঞ্জয় মন্দারের ঘ্রাণ।
৩৬/২৭ অভিব্যাপ্ত দেবতার উদ্দীপ্ত কৌতুকে,
মনে হলো, শতচ্ছিদ্র আকাশের কালো আবরণ।
অকস্মাৎ কী অনুকম্পন
পরালো সুরের সূত্র সমাজের প্রভেদে প্রভেদে,
বাঁধিলো গানের রাখী ব্রহ্মাণ্ডের বিচ্ছেদে বিচ্ছেদে।
২৯ সহসা শুনালো মোরে অমৃতের পরম বারতা।
৩৭/ ৪-১০ ঊর্ধ্বলোকে
আবার নিবেছে ধ্রুবতারা,
অগোচর কারা
আবার দলিতে আসে সঙ্কুচিত আত্মারে আমার।
তাই আজ বারম্বার
আতুর নয়ন মম করে অন্বেষণ
কুটিল আমার বক্ষে তব বক্র কেশের মতন
১২ তাই নিরালম্ব স্মৃতি খুঁজে মরে মরুর বাতাসে
১৪-১৬ সে-তনুর পরিচিত মৃদু পরিমল।
তাই পুন অকূল নৈরাশে
মুছি অশ্রুজল,
প্রত্যক্ষ করিতে চাই সিত শান্ত ললাটে তোমার
সেদিনের ত্রিবলি দরদ।

১৭/১৯ নিষ্ফল প্রয়াসমাত্র সার।
অবলম্বন নাহি দিলে, উচ্চারিয়া প্রলুব্ধ হুঙ্কার
নৈঃসঙ্গ্য গ্রাসিতে আসে দুঃসহ দুর্মদ।
বৈনাশিক বুদ্ধি চাহে অশ্রদ্ধায় করিতে প্রমাণ
২১ থেকে নাই তাহে কোনো অর্থ, দিগন্ত নির্দেশ।
৩৮/ ৩ সে-দিবা আবেশ
হয়নি কি বিরচিত অমর্ত্যের নিত্য উপাদানে?
কয় জানে
আশার অলকানন্দা আসেনি কি সেদিনে উছসি?
শুধু নিবৃত্তির বাঁধ গিয়েছিলো খসি,
করেছিনু কেবল শ্রবণ
স্ফীত ধমনীর মাঝে আপনার কামের গর্জন?
নিঙাড়িয়া সব কুচকলি
মধুমাত্র পিয়েছিনু স্বর্গের রুচির সুধা বলি?
কেটেছে ক্ষণিক নেশা, তাই
প্রাগ্রসর প্রলয়ে কি কোনোখানে স্থিতি আজ নাই?
৩৮/ ৫ সে কি আর কিছু নয়, শুধু গতে গ্রীষ্মের উত্তাপ
৮-৯ শরতের স্মৃতির মাঝে ফিরিছে কি অসংলগ্ন গান
পরদেশে লক্ষ্যহারা, অন্তর্মুখী পাখির সমান?
২৩ মোর পরে করেনি আশ্রয়।
৩৯/ ৫ আমারে নিক্ষিপ্ত করি দিলে যারে নিরঙ্কুশ নাস্তিতে।
১০ হয়েছিলো সংজ্ঞা উজ্জ্বল।
১১-১৪ জানি, সেই বনপথে করেছিনু আপনারে ছল,
চিরাভ্যস্ত প্রেমনিবেদনে
পশিনি তোমার মর্মে, আপনার চিত্তের গহনে
শুধু পুঞ্জ করেছিনু মিথ্যার জঞ্জাল।
১৯-২২ ক্ষণিক পুষ্পের লোভে; জানি, প্রথামতো
তাহাদের পদরেখা মুছে গেছে রৌদ্রে জলে ঝড়ে;
জানি, যুগান্তরে
তোমারো দুর্মর স্মৃতি লুপ্ত হবে পথের ধুলায়।

৪০/১১ দুটি অচেনার চক্ষে বুলাইলো পরম চেতন,
১৪ গ্রীবার বঙ্কিম ভঙ্গীতে, উরোজের অনবগুণ্ঠনে ?
১৭ করেছিলে যেই অঙ্গীকার,
২০ হায় প্রিয়া, তায় মোর অতিক্রান্ত বসন্তের প্রিয়া ?
৪১/ ৫-১০ দুটি বাহু ক্ষীণ
মৃত্যুসম কার্পণ্যে কঠিন
দুশ্চেদ্য আশ্লেষে যেন পেয়েছিলো বাঁধিতে প্রয়াণ
ঊর্ধ্বশ্বাস
রাত্রির প্রগতি ,
নীরব নিবিড় চক্ষে দুঃসহ মিনতি
চপল চরম নিমেষেরে
উদ্বিগ্ন দ্বিধার ভারে করেছিলো একান্ত মন্থর ;
বুদ্ধিশীল বিচ্ছেদেরে
উল্লঙ্ঘি দারুণ দম্ভে, তোমার মুমূর্ষু কণ্ঠস্বর
উন্মুক্ত শূন্যের মাঝে করেছিলো দুর্দ্ধর্ষ ঘোষণা –
ভুলিবো না, কভু ভুলিবো না ।
১৪-১৫ বিকশিত বিশ্ববাসনার
অধীর মদির ঘ্রাণ প্রস্ফুটিত লাইলাকবাসে
১৮-১৯ দক্ষিণ সমীরে
নবতন্ত্র ক'রে থাকে যদ্যপি প্রেরণ
২২-২৬ নিরুদ্দিষ্ট প্রণয়ের ভারে
তোমার অক্ষম হিয়া হয়ে থাকে যদি বা লুণ্ঠিত
প্রথম দস্যুর পদে উচ্ছৃঙ্খল আত্মনিবেদনে,
তাই তবে সিদ্ধ হোক, অর্থহীন গতানুশোচনে
স্বসমুখ দান তব কভু যেন না-হয় কুণ্ঠিত ।
২৭-২৮ করিনু স্বেচ্ছায় পরিহার
সমস্ত কল্পিত দাবি, সকল নিঃস্বত্ব অধিকার ।
৪২/ ২ অশক্ত অসূয়া মোর, ব্যর্থ অভিশাপ

৪-৯ ভুলে যেও, সখি যেও ভুলে,
চিত্তের গহন হতে কেশে দিও তুলে
প্রাণহীন প্রতিজ্ঞার অন্তভৌম দুঃস্থ মূলখানি।
সমাপিত দুঃস্বপ্নের গ্লানি
জাগর হৃদয় থেকে অনায়াসে যেন খ'সে যায়

১৩-২৪ অনামা-তটিনী-তটে উপনীত হবে পথ ভুলে,
বিছায়ে অলস তনু ছায়াঙ্কিত শ্যাম উপকূলে,
বঙ্কিম বাহুতে রাখি সুখশ্রান্ত শির,
অকারণ নীর
মুছি মুগ্ধ আঁখি হতে
আবার দেখিবে চাহি উর্দ্ধলোকে অমরার পথে
রাত্রি দেয় জ্বালি
দিনের স্ফুলিঙ্গযোগে তারকার অসংখ্য দীপালী,
তখন বারেক থেমে অস্থাবর নিমেষের তরে
স্মরণ করিও, সখী, বিগত বৎসরে
এই স্থানে এমনি প্রদোষে
অখ্যাত পথিক এক পদপ্রান্তে ব'সে,
দেখেছিলো অকস্মাৎ চমৎকৃত নয়ন বিস্ফারি
চিরন্তন নারী
উঠে জেগে
অনাহত দেহে তব আদিম আবেগে ॥
কিন্তু যদি অভিশাপ্ত অধুনার মাঝে
তোমারে বিনত করে লাজে
অবলুপ্ত অতীতের অনাহূত সেই ধূলিকণা,
তবে ভুলো একেবারে, করিবো না, খেদ করিবো না ॥

৪৩/১০-১১ মোর অন্ধ দুরাশারে তুমি কভু করেছো বঞ্চনা ;
অহৈতুক অনুতাপ জানায়ো না আর অকারণে।

১৬-১৮ ভুলি নাই একবারো মিলনের তন্ময় প্রসাদে
দুর্নিবার বিকারের কথা ;
ভাবিনি ভঙ্গুর ভবে নিতান্ত সুলভ অমরতা।

১৯-২১ নিরুপায় বুদ্ধি মোর শুনেছে যে তিক্ত গঞ্জনী
আপন অন্তর পথে বিপদের নিত্য পদধ্বনি :
জানে সে স্বকীয় দৈন্য, আত্ম-অসারতা
লজ্জিত মূকতা
তাই ঢাকে দুঃসহ ধিক্কারে
২৪ আজিকে পায় না স্থান আত্মম্ভরি অহংকার দ্বারে ;
২৬ স্মৃতিশূন্য অন্ধকারে করে শুধু বিলুপ্তি সন্ধান ।
৪৪/ ১ ধিক্কারেতে [ভুল] ভ'রে ওঠে মন
৩-৫ নিরুদ্দিষ্ট চঙ্ক্রমণে ফিরে যায় আবার সে-রাতে
যবে তব প্রসারিত হাতে
ধরেছিলো মোর হিয়া শ্রেষ্ঠ ভিক্ষা আনি
৯-১৪ বুঝিলে না তুমি অর্থ তার ।
অর্বাচীন যৌবন তোমার
লুব্ধ ভাব প্রলোভনে, ভোগের প্রমাদে
সে-অর্ঘ নিজের ভেবে তুলে নিলো আত্মপরমাদে ।
তোমার মানুষী প্রগল্‌ভতা
দেখিলো না ঊর্দ্ধে চাহি, প্রবঞ্চিত মৈত্রীর দেবতা
বিষণ্ণ [ভুল] অন্তরে
শূন্য ঝুলি স্কন্ধে ক'রে চ'লে গেলো দূরে লোকান্তরে
১৯-২০ আনিলো আমার লাগি যে-বিচিত্র বরণের ডালি,
অমৃতলোকের দ্বারে যে দিব্য দীপালী
৪৫/ ১-২ সেদিন প্রত্যূষে তাই হিয়া মোর উঠেছিলো জাগি
সম্ভোগের সুপ্তি হতে, তোমার ভিক্ষার গান শুনে
৪-৫ অশরীরী সুন্দরের অনাস্থা উদ্দেশে
দেহের দেউলে তব বিতরিল সর্বস্ব অক্লেশে ।
১০-১১ এলো যবে যথার্থ লগন,
অচিরে প্রমাণ হলো আমি অকিঞ্চন .
৪৬/ ১ বলেছিনু – "বুঝি, সবি বুঝি ।
৭-৮ অনন্তের পথরোধে করিবে না মিছে অপচয়
স্মরণের অক্ষয় সঞ্চয়" ।

৯ বলেছিনু—"জানি
অনিত্য ও-তনুখানি

১১-১৪ তাই তব হৃদি
বহিতে পারে না, প্রিয়ে, জগদ্দল বৈর্যের পাষাণ।
ত্যাগের প্রোজ্জল মরু, বৈধব্যের প্রেতাত্ত শ্মশান
হানে তব ক্ষুদ্র সাহসেরে।

১৬ তোমার শঙ্কিত হিয়া বাটে বাটে ফেরে
অন্বেষিয়া যাত্রাসহচর।

২২-২৪ অন্তিম চুম্বন মম অর্পিয়া তব অশ্রুনীরে,
মনে পড়ে, বলেছিনু ধ্রুব তার মুগ্ধ মায়া হানি,—
"ইন্দ্রত্বের ধ্বংসশেষে তুমি মাত্র শাশ্বত ইন্দ্রাণী,
দিবে আনি, অনায়াসে দিবে তুমি আনি

৪৭/ ৩ সত্যের নিষ্ঠুর রশ্মি চাহি না তো করিতে বারণ।

১০-১২ তুমি নিত্য হলে, সখী, দীপ্ত তব নয়নের বাণী
মদালস স্বপ্ন-কুঞ্জে জাতিস্মর অন্ধকার নাশি
বিদ্যুদ্বিলাস সম ফুটিতো না, সহসা উদ্ভাস

১৪-১৮ তুমি যদি হতে নির্বিকার,
জানি, তব কটিভ্রষ্ট শিথিল বসন
করিতো না নিবেদন
উপেক্ষার অপমান মোনের শ্রবণে।
ক্ষণে ক্ষণে
ফিরিতো না রোমাঞ্চন হয়ে
অলক্ষ্য সৌন্দর্য তব মদির মলয়ে।

২২-২৫ বুঝিনা যে কেন
যদি তুমি পরাধে আমীন,
সৃজনের বীণা
এখনো কেমনে বাজে সুরে।

৪৮/ ৩ সব সত্তা চ'লে গেছে অন্য কোনখানে

১০ জানি, জানি, প্রিয়তমে, অনাদ্যন্ত কালের মাঝারে,

১২-১৪ বিন্দু হতে তুচ্ছতর, অণু হতে আরো অব্যক্তের।
তবু আজ তব অসংস্থিতি।
ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্র হতে নিয়েছে হরণ ক'রে স্থিতি।
১৬-১৮ বিপ্লব পেয়েছে ছাড়া, স্বয়ং শাশ্বত বিধাতার
ন্যায়নিষ্ঠ সিংহাসনখানি
ডুবেছে নাস্তির গর্ভে, জানি, প্রিয়ে, সে-কথাও জানি।
২১ আমি তো তোমার পরে কোনোদিন করিনি নির্ধার্য
৪৯/ ২ নিষ্ঠার মৃন্ময় মূর্তি অমানুষ স্থবির নিষ্প্রাণ;
৮ আমি ভালোবেসেছিনু তোমার উড্ডীন কেশপাশ
১৩ স্বচ্ছ নেত্রে উৎসরিয়া অন্তর্ভৌম যৌবনফোয়ারা
১৮ চাহে কি উদ্দাম যাত্রী হিমস্তব্ধ শিলার মার্জনা?
২৩ সহজ প্রগতি তব ক্ষণে ক্ষণে বাধা পায় তাই,
৫০/ ২ অগ্নি মোর ক্ষমাভিখারিণী।
৩-১০ শ্যামলী বরষা সাঁঝের আঙিনাপরে
এলায়ে দিয়েছে শ্রান্ত শিথিল কায়া;
ছাড়া পেয়ে আজ লুকাচুরি খেলা করে
গগনে গগনে পলাতক আলো ছায়া।
অপথ শরৎ দাঁড়ালো সমীপে এসে,
শুনি সমীরণে তারি মৃদঙ্গ-ধ্বনি,
প্রতীক্ষণের অচল নিরুদ্দেশে
উতলা হয়েছে অকারণ আগমনী।
১৬-১৭ নবান্ন ভোজে তাহারো আসন পাতা;
পাছে চাহে শুধু আমারি উদাস আঁখি,
২১ সে আসি সহসা হাত রেখেছিলো হাতে,
৫১/ ৬ ভর করেছিলো সাতটি অমরাবতী;
২: বাসা বেঁধেছিল সাতটি অমরাবতী;
১০ ২: প্রলয়ের পথ দিল অবারিত ক'রে।
১১ আজি সে-রজনী ফিরেছে সগৌরবে
১৪ অনামা কুসুম আঁধারে উঠেছে মেতে।
১৫-১৮ ২: [সংযোজিত।]

১৮ ২ : দিব্য শিশিরে তারই যেন অভিষেকে।

১৯-২১ আজিকে আকাশ নীল তারি আঁখিসম ;

সে-রোমরাজির কোমলতা নব ঘাসে ;

তাহার রসনা পুন বলে— 'প্রিয়তম' ;

২২ ২ : আজি সে কেবল আর কারে ভালোবাসে।

২৩-২৪ স্মৃতিপিপীলিকা তাই এ-মাধুরী হ'রে

আমার রক্তে পুঞ্জিত করে কণা ;

৪২/ ৩ যা ছিলো দিয়েছি সবি উজাড়িয়া নিলথ চরণে।

১১ বর্ণে গন্ধে রূপে রসে রচিয়াছে প্রেম-উপহার,

১৫ নির্জীব স্মৃতিরে বহি, ফিরিয়াছি দুর্দান্ত তাণ্ডবে

২০ বলেছি— পিশাচস্কন্ধে হয় আজ অক্ষম বিধাতা॥

৪৩/ ৬ জাগর স্বপনে শুধু ভুঞ্জিয়াছি সংসর্গ তোমার

১৭-১৮ আবেশ কেটেছে যেই, জেগে,

রুদ্ধশ্বাস গৃহ হতে বাহিরিয়া বেগে

২০ ভগ্ন মনোরথে

চেয়ে আছে আশাপথ কার,

২২-২৫ আবার নিমেষে

ডেকেছে মোহের বান ; গেছে ভেসে

শিক্ষা দীক্ষা, যুক্তি তর্ক, ভূগোল বিজ্ঞান ;

উদ্‌ভ্রান্ত পরাণ

এই ব'লে আপনারে দিয়েছে প্রবোধ—

তোমার সৌন্দর্য্যবোধ

করিয়াছে তোমারেও শয়নবিরাগী ;

২৬-২৭ সুখশ্রান্ত নগরের রজত শিখরে

ঊর্দ্ধমুখ আকাঙ্ক্ষায় দাঁড়াইয়া তুমিও, অভাগী,

৫৪/ ১-৬ কি বা আর চাও?
ছেড়ে দাও,
স'রে যাও, ক্লান্ত আমি আজ,
নিরুৎসুক নিঃসঙ্গ নির্লাজ।
অস্তমিত প্রায়
দুর্লভ যৌবন মোর অকাল জরায়।
আলেয়ার অনুসারে নিরুদ্দেশে ঘুরে
মানুষের ভাষা বুঝি হয়তো বা গেছি এবে ভুলে।
৭ লুপ্ত আজি বিনষ্ট স্বর্গের ধ্বংসস্তূপে।
১০ আশা নাই, ইচ্ছা নাই, কেবল নিরর্থ হাহাকার
১৪ ফিরিয়ো না আর পিছে পিছে।
১৮ ২: স্তব্ধ হলো প্রেক্ষাগৃহে। অপনীত প্রচ্ছদের তলে,
২০ থেকে নম্র কণ্ঠে মরমী আহ্বান, অচিরাৎ রুদ্র স্বরে
৫৫/ ৪ কম্পিত বেহালা তারে দিলো প্রত্যুত্তর। মোর পাশে
সমাবিষ্ট নাগর-নাগরী দ্বিধা হলো মুহূর্তেকে
ছিন্নগুণ ধনুকের মতো; গাঢ়-হাস্য-মুখরিত
প্রণয়ের উৎসুক প্রলাপ থেমে গেলো আচম্বিতে।
৫ চিত্রস্থ প্রতিবেশিনীর পিঙ্গল কুন্তল হতে
৫-৮ ২: সচেতন প্রতিবেশিনীর পিঙ্গল কুন্তল থেকে
নামহীন রতিপরিমল, পরদেশী সঙ্গীতের
মুগ্ধ সমর্থনে, মোর চিত্তে সহসা জাগায়ে দিল
অতিক্রান্ত উৎসবের নিরাধার সম্মোহ আবার॥
৫৬/ ৮-৯ বেদনা, শুধুই বেদনা সুচির সাথী।
চিন্তাও আর আগুয়ান হতে নারে;
১৩-১৪ ফুকারিলো রণতূর্য; সমস্বরে গম্ভীর দুন্দুভি
উঠিলো বাঙ্ময় হয়ে; চমৎকৃত সুষিরে সুষিরে
১৯ সঙ্কারিলো শিহরণ বিচঞ্চল করতাল হতে॥
২০, ২৪ বেগবক্ত রবি আগত সহসা উদয়শৈলশিখরাগ্রে,
৫৮/১১ স্ফুরিত তরুলতা কে জানে কারে যাচে!

১৩ যমুনা জাহ্নবী বটে,
কবরী উড়ে পাছে।
২০ বনবীথি ছায়া ঢাকা,
৫৯/ ১-৪ সে-বিজন ছায়াপথে
ছুটি বিহ্বল প্রাণে ;
বুঝিনা যে কোনোমতে
লুকায়েছো কোন্‌খানে।
৫ কাছে শুনি তব হাসি
৮ বাখানে কী রূপকথা !
১০ বায়ু আজ হিমজয়ী !
১৩ থেকে ক্ষণপরে দাও ধরা।
৬০/৪ তুলি লাইলাক্‌রাশি
ব্যঙ্গে উন্মুখরা
দাঁড়াও যে পাশে আসি।
অবশেষে ছল ভুলি
মুখে চাও অকারণে।
ফেলে এসো ফুলগুলি
কবে কোথা অযতনে ?
সহসা না-জানি কেন
ধৈরজ ভেঙে পড়ে,
গাঢ় চুম্বনে যেন
মাতোয়ারা করো মোরে !
তার পরে শুধু শেষে
লাজ সংকোচ টুটে,
দিশাহারা কী আবেশে
মোরে নিয়ে চলো ছুটে !
৮ এক হবে দুটি কায়া ?
১২-১১ পরিপূর্ণ সাগরসঙ্গীতে পিয়ানোর স্নিগ্ধ কণ্ঠ
অচিরাৎ হয়ে গেল লীন। ত্রিভুবন পরিপ্লুত

৬১/১০-১২ হঠাৎ হলো পথের অবসান।

তৃণাসনে ক্ষুদ্র তরুর মূলে

শুনছি মোরা স্রোতস্বিনীর গান।

১৪ রোদ্রে অসার মরীচিকার প্রায়;

১৭ সপ্ত সাগর পেরিয়ে চারণ-বায়ু

২১ থামলো প্রলাপ হঠাৎ নদীর মুখে,

২৩-২৪ শুনতে পেলেম সেই নীরবের বুকে

প্রাণদেবতার অজর হোমানল।

৬২/ ৫ শূন্যে হঠাৎ লুপ্ত হলো ধরা,

১২ খেলে গেলো অসঙ্গত সুরের ঝলক; তীব্র বাঁশী

২২ যায় হারায়ে অকালে বাদলে;

৬৩/১২ লিখে আকাশে আকাশে সংহার;

১৮ তার পায়ে তাণ্ডব জেগেছে,

২০ নভে পক্ষ প্রসারি ভেগেছে;

২১ আজ উদ্‌ঘাট দ্বার নরকের;

২৪-২৬ সারা বিশ্বে ঘর্ণি লেগেছে।

ওই ছারখার হলো ত্রিভুবন,

ওকি প্রমথেশ আজ জেগেছে॥

৬৪/ ৩-১১ এলো হতাশ হঠাৎ তোমার চক্ষে নেমে;

পাণ্ডু হলো প্রণয়রক্ত মুখ,

কাঁপলো তোমার মলিন অধর থর থর

কথা বলার পরম প্রচেষ্টাতে,

আর বছরের শুকনো গোলাপ যেমনতর

শিউরে ওঠে এই ফাগুনের বাতে,

লাজে হঠাৎ ঝলসে গেলো তম্বলতা।

নগ্ন বক্ষে জড়িয়ে ব্যাকুল বাহু,

সঙ্কালি শির, জানিয়ে দিলে দুর্ব্বলতা।

৪ নাস্তিতে খিল রইলোনাকো আর;

৬৫/ ৪ ফিরে দিলো উৎসুক কম্পন যুবতীর স্তব্ধ দেহে॥

৬৬/১৫ অযোগ্যের মুক্তিস্নানে হয় না ম্লান লাঞ্ছিত;

২০ সহসা উজ্জ্বল হলো বেহালার আগম অন্তরে ;

২২-২৪ চরাচরে থাকিলো মুক্তির স্বর্গ প্লাবনপ্লাবনে ।

সে-বিপুল সঙ্গীতের আড়ে প্রণয়ীর বাহুপাশ

ঘেরিলো তন্বীর তনু স্নেহ-আবেষ্টনে ; চাবি চোখে

৬৮/ ৫ নিবিড় আবেগে নিমীলিয়া আসে চোখের পাতা ।

৭-৮ অকস্মাৎ স্বপ্ন গেলো টুটে । দেখিনু সভয়ে চাহি

জনশূন্য রঙ্গালয়ে নিবে গেছে সমস্ত দেউটি,

১২ কেবল অন্তর মোর দীর্ণ হয় রুদ্ধ হাহাকারে ।

ক্রন্দসী

৭৫/ ১ আপনারে অহর্নিশি খুঁজি ।

৩ আমার অভীষ্ট সে তো নয় ।

৪ সে কেবল বাচাল হৃদয়

১০-১২ যার স্বপ্নসেনা

অলীক স্বর্গের দ্বারে হানা দিতে ছুটে বারে বারে

জ্যোতিষ্মান ব্রহ্মাণ্ডের শূন্যময় পরিখার পারে

১৫ অনাদি নীরবে ব'সে আপনার মনে

১৯ থেকে তাহার শরীর বুদ্ধি, মনীষা মনন

৭৬/১২ শিল্প-উপাদান-সম অখণ্ডতা করে বিরচন ;

অবিকল, সিদ্ধ, স্বয়ম্ভূশ,

নিঃশঙ্ক সে অপমানে, অন্বেষণ করেনা সে যশ ;

সে কেবল নির্লিপ্ত অযনে

পূর্ণ করে ভগ্ন বৃত্ত ; নিরাসক্ত বিভাবিকীরণে

জানায় দিকের বার্তা অমাগ্রস্ত নিঃসঙ্গ তরীরে ;

রূপসীরে

নিষ্কাম উদ্দীপ্তি তার করে পূজারতি ;

কুরূপার কুৎসিত বসতি

মায়াপুরী হয়ে ওঠে নৈর্ব্যক্তিক তার অনুরাগে ;

ডরেনা সে ব্যাধি, মৃত্যু, জরা ;

১৬ নিত্য বিকশিত হয় আত্মঘাত নির্বিশেষ কলে,

১৭ সে-অনাম চিরসত্তা খুঁজি আমি আপন অতলে।

২১ আমার আরতিদীপ শূন্যতায় সাজায় শর্বরী।

২২ সম্মুখে নিখিল নাস্তি, পাছে মোর মৌন নীরবতা;

৭৭/ ১ তবে কি বিরাট শূন্য শূন্য নয়, সগরের প্রেত;

৪ উন্মুখ নিক্ষোভ তার পরিণত অমূর্ত ঈথারে?

৬ শঙ্খের মিসরী শবে উগ্র বন্ধ্য ভবিষ্যের ক্ষেত?

৭ নির্লিপ্ত আলোর দীপ নয় ওই দিব্য নীহারিকা,

১২ পতঙ্গের স্থূল সত্তা, মূর্তিমান গূঢ় বিভীষিকা?

১৫ কৃত্রিম কল্পনা ত্যাগ; নিরাসক্তি অসাধ্যসাধন:

২০ আবার ঝরিছে শিরে নীলাকণ সন্ধ্যার মাধুরী

৭৮/ ১ পুনরায় পরিপ্লুত রোমকূপ চুঁয়ে

৭৮/ ১৫ অন্তরের গহন কন্দরে

আবার কি মগ্ন হবে অনিকাম ঘুমে

শত জন্ম-জন্মান্তের নির্বিকার অভাব সহসা?

৯ ভুলাবে কি পুনর্বার আত্মহারা পুরাণপুরুষে?

১৫ বশীকরণের মদে উচ্ছল সে-নীলার পেয়ালা

২২ আমাকে ও-পার থেকে আরাত্রিকে সঙ্কেত পাঠায়;

২৯ থেকে বীর্যের অনন্তশয্যা পাতিবোনা সে-কৃষ্ণ মশানে;

৭৯/ ১ ভুলিবোনা, এ-মৌন পিপাসা

মিটিবেনা কোনোদিন

হৃষ্টপুষ্ট সন্তুষ্টির উষ্ণ রক্ত বিনা।

১২-১৪ প্রণয়ের মর্মবন্ধন,

পতঙ্গের সাম্যবাদ, কৃপাজীবী ক্লীবের ক্রন্দন,

হে ভৈরব, জীবনেরে করেছে দুঃসহ।

২০ সেই প্রাক্‌পুরাণিক বিষ;

৮০/ ১-৯ উপবাসী কবি এক অপরাধী উনিশ শতকে
মুদ্রিত পুঁথির পাতে করেছিলো নাটকী ঘোষণা —
"রুদ্ধ রাজ-অন্তঃপুরে আমি ব্যর্থ ফোয়ারা হবোনা ;
হেরিবেনা মুখচ্ছবি পুরনারী এ চিত্রফলকে ।
"আমি অব্যাহত নদ, চিরজীব প্রবাহে আমার
তৃষ্ণা ও পত্তন হবে সকলের সাথে আবিলতা,
দিনান্তে কর্মের ক্লেদ প্রক্ষালিবে গ্রাম্য শুচিব্রতা,
গৃহার্থী চাষীর ভিড়ে পূর্ণ হবে খেয়ার ও পার" ।
সে-নির্গুণ দৈন্যবাদে হেসেছিনু সেদিন বিদ্রূপে ।
১১ আকাশকুসুমগুলি প'ড়ে গেছে শুষ্ক অশ্রুরূপে,
১২ উন্মূল উৎকর্ষ মোর এ-নির্জনে হয়নি চিরায়ু ।
১৪ নিঃস্ব রোমন্থক কাল আপনারে পরিপাক করে ।
১৫ পঞ্চ বর্ষ গত হলো । আলোড়িয়া মরুপথধূলি
১৬ সহসা অদৃশ্য হলো জীবনের শ্রেষ্ঠ বর্ষগুলি
১৯ থেকে স্মৃতির গন্তব্য হবে অসংহত রিক্ত মস্তিষ্কে ।
৮১/ ৭ একদা যে-পঞ্চবর্ষ অমিতির নিশ্চিন্ত আয়নে
বৃংহক শরীরের ঘনঘোর ছায়াপাত করি
দীপ্র ভবিতব্যতারে রেখেছিলো সম্পূর্ণ আবরি
আমার নয়ন হতে, স্বর্গ, মর্ত্য, রসাতল লোপে
যে-মন্থর পঞ্চবর্ষ জগদ্দল প্রতি পদক্ষেপে
সুপ্রতিষ্ঠ শতাব্দীরে ক'রে যেতো হেলায় নিঃশেষ ;
সীমাশূন্য শূন্যতায় তারাও কি হলো নিরুদ্দেশ ?
১০৩/ ২ প্রাকৃত তিমিরে মগন চমনতরি ।
৩ ছন্দ-সায়রে কাহার তরণী বাওয়া
৯ অঙ্গ তুহিন, তপ্ত মোর মাথা,
১৪ মনে হয় যেন, হয়েছে কে অনুগামী .

সংবর্ত

১৭৪/১৬ ছায়া-প্রচ্ছদে যাতায়াত করে কারা ?

১৮৫/ ১-৩ ২ : তোমার-আমার মাঝে বিরহের বাহিনী বহে না .

কবিতাপ্রভব ক্রৌঞ্চ আমাদের উপমান নয় ;

সম্প্রতি সঙ্গমে আর ভুবনেরও বাবধি রহে না :

২১০/ ৯ জাম্বুল্ সাথে কত গম্বুজ, মিনার থেকে ;

২১৫/১২ ধ্যানে আজকাল মানসীরে প্রায় হেরি :

২২৭/শেষ নির্বাসিত , অবাঞ্ছক অন্তরীক্ষ ধ্বনিত ব্যোমে।

'অর্কেষ্ট্রা' ও 'ক্রন্দসী'র প্রথম সংস্করণের জ্যাকেটে ছাপা বিজ্ঞাপনও যে সুধীন্দ্রনাথের লেখা, সংরক্ষিত পাণ্ডুলিপির মধ্যে তার খসড়া দেখে সে-বিষয়ে নিঃসংশয় হয়েছি। দুষ্প্রাপ্য বিবেচনায় সে দুটি বিজ্ঞাপন সংকলন ক'রে দিলাম :

অর্কেষ্ট্রা

গ্রন্থকার তাঁর প্রথম কাব্য-সংগ্রহ 'তন্বী'র মুখবন্ধে নিজেকে পূর্বগামীদের ছায়ানুবর্তী ব'লে ঘোষণা করেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ সেই কবিতাগুলির মধ্যে অসামান্য স্বকীয়তার সন্ধান পান। 'অর্কেষ্ট্রা' আরো মৌলিক ; রূপে, রসে, ছন্দে, অলঙ্কারে পুস্তকখানি এতই বিচিত্র যে সকলেই বিশেষজ্ঞের সঙ্গে সমস্বরে বলবেন, সুধীন্দ্রনাথ সত্যই বর্তমান বাংলা-সাহিত্যের অন্যতম অগ্রণী। কারণ 'অর্কেষ্ট্রা'য় সনাতন ভাবাবেশের অভাব নেই বটে, কিন্তু তা সর্বত্রই সংযত, অধুনাতন মননশীলতাও বিদ্যমান, কিন্তু পরিমিত আকারে ; এবং এই উভয় গুণের নিবিড় সংমিশ্রণে কবির পরিণত জীবনের সমগ্র অভিজ্ঞতা যে অভিব্যক্তি খুঁজে নিয়েছে, তা যেমন উপযোগী, তেমনি উপভোগ্য। কিন্তু 'অর্কেষ্ট্রা' সজাগ পাঠকের মুখাপেক্ষী। যাঁরা রচনারীতির সূক্ষ্ম ইঙ্গিত বোঝেন, যাঁরা বিষয়বস্তুতে অবাস্তব কল্পনার প্রশ্রয় দেন না, চিরপ্রথার খাতিরে মানুষের গভীরতম অনুভূতিকে এড়িয়ে

চনা যাঁদের অভ্যাস নয়—তাঁদের জন্ত এবং বিশেষ ভাবে শিল্পে যাঁরা প্রতিভার পক্ষপাতী তাঁদের জন্ত 'অর্কেস্ট্রা' বিরচিত। গ্রন্থের নাম-কবিতাটি অবিস্মরণীয় সৃষ্টি, এর সমকক্ষ, শুধু বঙ্গ-সাহিত্যে নয়, পশ্চিমী কাব্যেও দুর্লভ।

ক্রন্দসী

সুধীন্দ্রনাথ দত্তের পাঠকসংখ্যা কত, তা বলা শক্ত। তবে তাঁর স্থান যে বাঙালী কবিদের প্রথম শ্রেণীতে, তাতে সম্ভবত মতদ্বৈত নেই। কারণ তাঁর ভাবের বৈশিষ্ট্য ও ভাষার বৈচিত্র্য প্রতিকূল সমালোচকেরাও নিঃসঙ্কোচে মেনে নিয়েছেন এবং অনুরাগীরা তাঁর পূর্বপ্রকাশিত কাব্যসঙ্কলন 'অর্কেস্ট্রা'-সম্বন্ধে এমন কি অশোভন অতিশয়োক্তি করতে ছাড়েননি। আমাদের মতে বর্তমান পুস্তকে লেখকের গুণাবলী আরো পরিস্ফুট। সমগ্র গ্রন্থে বিষয় ও সুরের ঐক্য বজায় রাখতে গিয়ে সুধীন্দ্রনাথের বহুমুখী চিত্তবৃত্তির যে-সকল দিক 'অর্কেস্ট্রা' থেকে বাদ পড়েছিল, সেগুলির অভিব্যক্তিতে 'ক্রন্দসী' সমৃদ্ধ। এখানকার কবিতাগুলিতে প্রকৃতি বা প্রেয়সীর আবির্ভাব হয়তো বিরল; কিন্তু এতে যে-সব প্রসঙ্গ প্রাধান্য পেয়েছে, সেগুলির হৃদয়সংবেদ্য প্রকাশ অন্তত বাংলা কাব্যসাহিত্যে সুলভ নয়। অতএব অন্য ঐশ্বর্যের কথা না তুললেও, শুধু এইটুকুর জোরেই 'ক্রন্দসী'র সমাদর হওয়া উচিত।

'কাব্যসংগ্রহ'-এর প্রথম সংস্করণে প্রকাশকের নিবেদন থেকে একটি অনুচ্ছেদ দ্বিতীয় সংস্করণে বর্জিত হয়েছিলো। শিষ্টাচারের অনুরোধে সেটি পুনরুদ্ধৃত হ'লো:

বইয়ের প্রেস-কপি তৈরি ক'রে দিয়েছেন শ্রীমতী শ্রী মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রী অমিয় দেব; শ্রী অমিয় দেব প্রুফসংশোধনের আংশিক দায়িত্বও নিয়েছিলেন, এবং পাঠান্তরসমূহের নির্দেশ তিনি রচনা ক'রে না দিলে বইখানি অসম্পূর্ণ থেকে যেতো। এঁদের দু-জনকেও আমাদের কৃতজ্ঞতা জানাই।

বর্তমান সংস্করণের মুদ্রণ কিছুটা অগ্রসর হবার পর পাণ্ডুলিপি তুলনার সুযোগ ঘটে। ৫১ পৃষ্ঠা ১০ পংক্তিতে সংশোধন পাঠটিই 'প্রলয়েরে', 'প্রলয়ের' নয়। এই অংশটি তখন ছাপা হ'য়ে যাওয়ায় মূলপাঠে অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব হয়নি। ৭৫ পৃষ্ঠা ২১ পংক্তিতে 'নিষ্ফল'-এর স্থানে 'নিষ্কল' পাঠ গৃহীত হয়েছে পাণ্ডুলিপির সাক্ষ্যে।

২৩ পৃষ্ঠা ৭ পংক্তিতে 'উপশয়ী' এবং ১৫১ পৃষ্ঠা ১৪ পংক্তিতে 'উন্মুদ্র' ভুল ছাপা হয়েছে। ১২৪ পৃষ্ঠায় "পরাবর্ত" কবিতাটি রচনার তারিখ ৯ জ্যৈষ্ঠ। ৪০৭ পৃষ্ঠায় শেষ থেকে দ্বিতীয় পংক্তিতে 'লগনে' ছাপার ভুলে অর্থহীন হ'য়ে পড়েছে। সহৃদয় পাঠককে সংশোধন ক'রে নিতে অনুরোধ করি।

সুধীন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থগুলির প্রতিটি সংস্করণ ব্যবহার করতে দিয়েছেন অধ্যাপক আবু সয়ীদ আইয়ুব। পাণ্ডুলিপি ও সংশোধন-সমন্বিত বই দেখতে দিয়ে বাধিত করেছেন শ্রী মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রী শৌরীন্দ্রনাথ দত্ত ও শ্রী হরীন্দ্রনাথ দত্ত। আর সব ব্যাপারেই সহায় ছিলেন শ্রী জগন্নাথ ভট্টাচার্য। সবাইকে আমার কৃতজ্ঞ নমস্কার জানাই।

স্বপন মজুমদার

কবিতার নামসূচি

১৯৪৫ ১৯৭

প্রথম পংক্তির সূচি